প্রথম প্রকাশ * মে দিবস ১৯২৯

প্রকাশক : নিতাই মজুমদার, শঙ্কর প্রকাশন, ১৫।১এ যুগলকিশোর দাস
লেন, কলি-৬ * মুদ্রক : নেপাল ঘোষ, বঙ্গবাণী প্রিণ্টার্স, ৫৭।এ,
কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলি-৬ * গ্রন্থন : শঙ্কর বাইণ্ডিং ওয়ার্কস,
১৫।১এ যুগলকিশোর দাস লেন, কলি-৬ * প্রচ্ছদ : ইন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মূল্য : আট টাকা

ভূমিকা

২৬শে মার্চ ১৯২৯ তারিখটি ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ঐদিন শেখ মুজিবর রহমান সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর পক্ষ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই স্বাধীনতা ঘোষণার আগেই ২৫শে মার্চ রাত্রিবেলা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সরকারী পাক সৈন্য বাহিনীকে ক্ষুধার্ত্ত নেকড়ের মত নিরস্ত্র ও নির্দোষ জনগণের ওপর লেলাইয়া দেন। তারপর থেকে বাংলাদেশে শুরু হইয়াছে পাকিস্তানী জল্লাদদের নির্বিচার হত্যাকাণ্ড। শিশু, স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ, যুবক, ছাত্র, শিক্ষক, ডাক্তার, উকিল, রাজনৈতিকনেতা, কর্মী, লেখক, শিল্পী, কবি অর্থাৎ সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে পাকিস্তানী বর্বরের দল পাইকারী ভাবে খুন করিতেছে। ট্যাঙ্ক, কামান, বোমারু বিমান, মেসিনগান, রাইফেল ইত্যাদি আধুনিক মারণাস্ত্র দিয়া বাংলাদেশের হাজার হাজার মানুষকে নিধন করা হইতেছে। ঘরবাড়ী, শিক্ষায়তন, মন্দির ও মস্‌জিদ ধ্বংস করা হইতেছে এবং যুবতী ও নারীদিগকে (স্কুল-কলেজের ছাত্রীসহ) ধরিয়া নিয়া গিয়া ধর্ষণ করা হইতেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কামানের গোলা দিয়া ধ্বংস করা হইয়াছে। ঢাকা শহর মৃতের নগরীতে পরিণত এবং চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোহর, রাজসাহী, শ্রীহট্ট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ইত্যাদি শহরগুলি আজ শ্মশানের মত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিট্‌লারী নাৎসী বাহিনীর বর্বরতা যেমন মানবেতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিয়াছে তার চেয়েও ভয়ঙ্কর নৃশংসতার ইতিহাস রচনা করিয়াছে পাকিস্তানী ফ্যাসিস্ত বাহিনী। সারা পৃথিবীর—ইওরোপ, বৃটেন, আমেরিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, জাপান, অস্ট্রেলিয়া এবং আফ্রিকার সংবাদপত্র সমূহে এই নৃশংস ঘটনাবলীর কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং একথা মনে করিবার কোন কারণ নাই যে এগুলি একমাত্র ভারতীয় সংবাদপত্র ও রেডিও-র প্রচার কারসাজি মাত্র।

কিন্তু এই বীভৎস হত্যাকাণ্ড এবং অবর্ণনীয় অত্যাচার ও পাশবিকতা সত্ত্বেও বাংলাদেশে গড়িয়া উঠিয়াছে ঐতিহাসিক প্রতিরোধ। মুক্তি ফৌজ শহরে, বন্দরে, গ্রামে, নদীতীরে অর্থাৎ যেখানে যেখানে সম্ভব গেরিলা রণকৌশলের দ্বারা পাকিস্তানের হানাদারবাহিনীকে পর্যুদস্ত করিতেছে। মনে রাখা দরকার পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী—স্থলসৈন্য, বিমানসৈন্য ও নৌসৈন্য একটা নিয়মিত সামরিক সংগঠনের অন্তর্গত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হাজার কোটি টাকা মূল্যের আধুনিক মারণাস্ত্র 'উপহার' দিয়া (যে মার্কিনী অস্ত্র লইয়া পাকিস্তান দুইবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল) এই-বাহিনীকে অত্যন্ত বলশালী করিয়া তুলিয়াছে। সোভিয়েত রাশিয়ার কাছ থেকে পাকিস্তান দুইশত ট্যাঙ্ক কিনিয়াছে এবং চীনের কাছ থেকেও অজস্র অস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছে। এই আধুনিক ও বিজ্ঞান-সম্মত সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মুক্তিফৌজ নামে মাত্র কিছু বন্দুক ও হালকা অস্ত্র লইয়া গত এক মাস (এই প্রবন্ধ লেখার সময় পর্য্যন্ত) যাবৎ প্রচণ্ড দুঃসাহসের সঙ্গে প্রতিরোধ যুদ্ধ চালাইয়া আসিতেছে। গোড়ার দিকে এইযুদ্ধ স্বভাবতই ছিল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। কেন্দ্রীয় কমাণ্ড এবং স্বাধীন বাংলাদেশের কোন কেন্দ্রীয় সরকার ছিল না। ইতিমধ্যে রক্ত অশ্রু এবং ধ্বংস ও হত্যাকাণ্ডকে অস্বীকার করিয়া সেই কমাণ্ড ও সেই সরকার গঠিত হইয়াছে।

গত ১৭ই এপ্রিল শনিবার কুষ্টিয়ার মুজিবনগরে স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিসভার সদস্যগণ শপথ গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ যথারীতি একটি নূতন স্বাধীন রাষ্ট্র দক্ষিণ এশিয়ায় জন্মলাভ করিয়াছে এবং তার জন্মবার্ত্তা পৃথিবীর চারিদিকে ঘোষিত হইয়াছে। এই নূতন রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কলকাতায় পাকিস্তানের প্রাক্তন ডেপুটি হাই কমিশনার তাঁর বাঙ্গালী সহকর্মীদের সঙ্গে একত্রে বাংলাদেশের কূটনৈতিক দপ্তরের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন এবং তার আগে তাঁর দপ্তর থেকে পাকিস্তানী

পতাকা নামাইয়া দিয়াছেন ও পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন।

নাটকের দ্রুত পট পরিবর্তনের মত পর পর এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাগুলি ঘটিয়া গিয়াছে এবং সারা দুনিয়ার রাজনৈতিক মহলে—দেশ দেশান্তরে এই ঘটনাপ্রবাহ নূতন তরঙ্গ তুলিয়াছে। ভারতবর্ষ ও পশ্চিমবঙ্গের জনজীবনে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ লইয়া প্রচণ্ড আলোড়ন শুরু হইয়াছে। ভারত সরকার এবং পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে বার বার আবেদন উপস্থিত হইতেছে বাংলাদেশের সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি ও সামরিক সাহায্য দানের জন্য। কারণ এটা সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের কথা যে, একটা নিরস্ত্র জাতি আধুনিক অস্ত্র সজ্জিত একটা শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীকে অনির্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত ঠেকাইয়া রাখিয়া যুদ্ধে চরম জয়লাভ করিতে পারে না। সুতরাং বাংলাদেশের মুক্তিফৌজের হাতে যেভাবেই হোক আধুনিক অস্ত্র তুলিয়া দিতে হইবে।

অবশ্য ইতিমধ্যে বাঙলাদেশের অজস্র নরনারী প্রাণ দিয়াছেন এবং আরও অগনিত নরনারীর প্রাণ যাইবে। ব্যাপক ধ্বংসলীলা বিস্তীর্ণ হইবে। তথাপি ইয়াহিয়া খানের ফ্যাসিস্ত সৈন্যরা চূড়ান্ত জয়লাভ করিতে পারিবে না। যেমন ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ ইন্দোচীনের মুক্তিযুদ্ধে হো চি মিনের নিকট পরাজিত হইয়াছিল, শেষ পর্য্যন্ত পাকিস্তানী ফ্যাসিস্তদিগকেও অনুরূপ পরাজয় মানিতে হইবে বাঙলাদেশের নিকট। কেননা, এটা সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার যুদ্ধ, স্বদেশ প্রেমের যুদ্ধ। এবং সমগ্র বাঙালীর মুক্তিযুদ্ধ। এই বাঙালীকে গত চব্বিশ বছর ধরিয়া মিলিটারী ইণ্ডাস্ট্রিয়েল পাঞ্জাবী শাসকচক্র সম্পূর্ণরূপে পদানত করিয়া রাখিয়াছিল। আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন রাজ্য দখল করিয়া পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীরা যেভাবে আফ্রিকানদের জীবন, সম্পত্তি, কাঁচামাল ও ভূমির উপর সর্বাত্মক প্রভুত্ব কায়েম করিয়া তাদের "পুরুষদের দাস এবং নারীদের

গণিকায়" পরিনত করিতেছিল, সেই জঘন্য শোষণ ও লাঞ্ছনার কাহিনীও পূর্ববঙ্গের ইতিহাসকে ভারী করিয়া তুলিতেছিল। প্রথম এই আক্রমণের শুরু ভাষা ও সংস্কৃতির উপর। ১৯৪৮ সালেই এর সূত্রপাত এবং তারপর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে পর্যায়ক্রমে প্রতিরোধ আন্দোলন দেখা দিতে লাগিল। এই আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণরূপেই বৈধ ও নিয়মতান্ত্রিক এবং শান্তিপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে গান্ধীজীর অসহযোগ এবং সত্যাগ্রহ ছিল এই আন্দোলনের প্রাণ। বহু বাধা, দলাদলি, বিপদ ও অত্যাচার অতিক্রম করিয়া ১৯৪৭-৪৮ সালের এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে আসিয়া দাঁড়াইল পূর্ব্ববঙ্গ। আওয়ামী লীগ ও পূর্ববাঙলার অবিসম্বাদী জননেতা শেখ মুজিবর রহমান "জয় বাংলা" ধ্বনি দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর কণ্ঠে তার প্রতিধ্বনি জাগিল, যার সঙ্গে বাঙলাদেশে যৌবন জল-তরঙ্গ উদ্বেল হইয়া উঠিল।

কিন্তু কেন এই জাগরণ?—কেন হাতে হাত ও কাঁধে কাঁধ দিয়া কোটি কোটি মানুষের এই অপূর্ব লড়াই? কি মন্ত্রে, ব্যক্তিত্বের কি নিবিড় আর্কষণে অগণিত জনতা মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত মুজিবর রহমানের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিল? মুজিবর কমিউনিষ্ট নন, মার্কসসিষ্ট নন, মাওইষ্টতো ননই—তিনি ন্যাশন্যালিষ্ট বা জাতীয়তাবাদী, কিন্তু কট্টর পন্থী নন, উদারতাবাদী বামপন্থী ন্যাশন্যালিষ্ট। আমাদের দেশের বহু জাতীয়তাবাদী ও দক্ষিণপন্থীদের মত তিনি সোভিয়েটের বিরুদ্ধবাদী নন, সমাজতন্ত্রের বিরোধী নন, বামপন্থী আদর্শের নামে তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠেন না। সর্বোপরি তিনি গণতন্ত্রের একান্ত পূজারী, সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে, হিন্দু-মুস্লিম বিরোধের উর্ধ্বে উদার মানবতায় তিনি বিশ্বাসী। তিনি বলেন, বাংলাদেশে যিনি বাস করেন তিনিই বাঙালী। এই বাঙালীর জাতীয় সত্তার তিনি উদ্বোধক। ১৯৪৭ সালে পার্টিশানের নিষ্ঠুর খড়্গাঘাতের দ্বারা বাঙালীর জাতীয় সত্তাকে খণ্ডিত এবং বিপন্ন করিয়া তোলা হইয়াছে। বর্ত্তমান, বাঙালীর দুর্গতি ও অধঃপতনের অন্যতম মূল কারণ যে

পার্টিশান, একথা বহুবার বহুভাবে আমি দেশবাসীর সামনে তুলিয়া ধরার চেষ্টা করিয়াছি। পশ্চিমবঙ্গের যুবকেরা যে আজ গভীর হতাশায় এবং জীবনেরও প্রাচীন মূল্যবোধের প্রতি প্রচণ্ড বিতৃষ্ণায় নিজের মাথা কাটিয়া রক্তপানের বীভৎসতায় উদ্যত হইয়াছে, এরও মূল কারণ বঙ্গ বিচ্ছেদ বা পার্টিশান। লক্ষ লক্ষ মানুষকে ভিটেমাটি ছাড়া করিয়া পথের ভিখারী করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এর বদলে কোন সুস্থ সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্বাসন ঘটে নাই। অর্থনৈতিক অধিকার এমন কি 'গৃহের অধিকার' (অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বাস্তুহারার দল) বঞ্চিত এইসব অভিশাপগ্রস্ত পরিবারের সন্তানেরা আজ সমাজদ্রোহী এবং মনুষ্যত্বের বিরোধী হইয়া উঠিতেছে। কারণ? কারণ, মূলতঃ পার্টিশানের রক্তক্ষরণ। অর্থাৎ বাঙালী জাতির স্বাভাবিক আত্মপ্রকাশের পথ রুদ্ধকরণ। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে বাঙালী গভীর প্রতিক্রিয়ায় ও অবসাদে আক্রান্ত—জনগণ বিভ্রান্ত এবং অসহায়।

আর পূর্ব পাকিস্তানে? পার্টিশানের আঘাতে অখণ্ড বাংলদেশের বৃহত্তম বা দুই-তৃতীয়াংশ ভাঙ্গিয়া গিয়া পূর্বপাকিস্তানে পরিণত হইল এবং কার্যতঃ হাজার মাইল দূরবর্তী পশ্চিম পাকিস্তানের সে অবাধ মৃগয়া বা শোষণের ক্ষেত্রে পরিণত হইল। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের কবলে পড়িয়া আফ্রিকা ও এশিয়ার কলোনীগুলির যেমন হাড়মাংস জ্বলিয়া গিয়াছে, গত ২৩ বছর ধরিয়া রাওয়ালপিণ্ডির একচ্ছত্র পীড়ন ও শাসনে তেমনি পূর্ব পাকিস্তানের রক্ত ক্ষরিত হইয়াছে। অর্থাৎ পার্টিশানের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালী তার জাতিসত্তা হারাইতে বসিয়াছিল। তার ভাষা ও সংস্কৃতি, তার গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক অধিকার, তার অর্থনীতি ও সমাজজীবন এবং তার মনুষ্যত্ব ও জীবিকা পর্যন্ত বিপর্যস্ত ও ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইতেছিল। এককথায় তার 'বাঙালী' নামটা পর্যন্ত মুছিয়া গিয়া একমাত্র পাকিস্তানী খোলসটা তাকে উপহাস করিতেছিল। একটা জাতির স্বাধীন সত্তা লইয়া যখন টান পড়ে,

তখন তাকে এমন এক কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়াইয়া লড়াই করিতে হয় যেখান থেকে তার আর পিছু হটা সম্ভব নয়। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালী ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারী মাতৃভাষার দুর্গে দাঁড়াইয়া প্রথম এই আত্মরক্ষার সংগ্রাম সুরু করিল। এই সংগ্রামই ছড়াইয়া পড়িল জাতীয় জীবনের নানা শাখা-প্রশাখায়—উদ্বেলিত জোয়ার আসিয়া সমাজের সমস্ত নদীনালা খাল-বিল যেন পূর্ণ করিয়া ফেলিল। ১৯৫৮ সালের আয়ুবশাহী থেকে আরম্ভ করিয়া ১৯৫৯ সালের ইয়াহিয়া খানের জঙ্গী শাসনের পীড়নকাল পর্যন্ত প্রতিরোধ সংগ্রামের যে অপূর্ব ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে, তার মূলকথা বাঙ্গালীর জাতীয় সত্তার সংগ্রাম। এই সংগ্রাম স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার লড়াই—বাঙ্গালীর বাঁচার লড়াই এবং আক্ষরিক অর্থেই এই সংগ্রাম 'বাঁচার লড়াই'। পাঞ্জাবীদের বুটের তলায় পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালী মুসলমানকে, (সেই সঙ্গে সমস্ত মাইনরিটিকে) প্রায় দাস জাতিতে পরিণত করার এক ভয়ঙ্কর চক্রান্তজাল বিস্তার করা হইয়াছিল। পূর্ববাঙলার সমস্ত সম্পদ লুণ্ঠন ও শোষণ করিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের অ-বাঙালী ২২টি পরিবার পার্টিশানের পর কেবল ধনকুবেরে পরিণত হয় নাই, প্রকৃতপক্ষে এরাই সমগ্র পাকিস্তানের দণ্ডমুণ্ডের কর্তায় পরিণত হইয়াছে এবং তাদের সহায়ক ও সহযাত্রীরূপে দাঁড়াইয়া আছে সঙ্গীনপাণি পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী যে বাহিনীর শতকরা ৯০ জন অবাঙালী কিংবা পাঞ্জাবী, পাঠান ইত্যাদি। এরাই ইসলামের সবচেয়ে বড় তল্পিবাহক এবং পাকিস্তান ও পার্টিশানের গোঁড়া সমর্থক। ভারতবিদ্বেষে ও জাতিবিদ্বেষে এরা অন্ধ এবং পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালীরা এদের চোখে নিতান্তই জিম্মি শ্রেণীর কিম্বা 'ছোটলোক'! প্রাক্তন পররাষ্ট্র মন্ত্রী জুলফিকর আলী ভুট্টো, যিনি রাষ্ট্রসংঘের অধিবেশনে ভারতীয়দিগকে কুকুর বলিয়া গালি দিয়াছিলেন, সেই লোকটি হাল আমলে এই গোষ্ঠীর মুখপাত্রে পরিণত হইয়াছেন এবং এই লোকটিই মুজিবর রহমানের ছয় দফা কর্মসূচীর ও পূর্ববঙ্গের স্বাতন্ত্র্যের

তীব্র বিরোধিতা করিতেছেন। এই লোকটিই পাকিস্তানের সৈন্য-বাহিনীর তরুণ অফিসারদের প্রিয়পাত্র এবং এঁরাই আবার পশ্চিম পাকিস্তানের ধনপতি ও শিল্পপতিদের ছদ্মবেশী সমর্থক। পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির নেতারূপে জুলফিকর আলি ভুট্টো মুখে সমাজ-তন্ত্রের যে বুলিই কপচান না কেন, এরা আসলে জঙ্গীবাদী জাতীয়তার অতি উগ্র সমর্থক এবং একধরণের আধাফ্যাসিষ্ট—জাতিবিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতা এদের মূল উপজীব্য এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে এরা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরণের সুযোগসন্ধানী সুতরাং এদের চৈনিক প্রেমটা হইতেছে আসলে ভারতের বিরুদ্ধে শত্রুতা উদ্ধারের কৌশল মাত্র। ভুট্টো আজ পশ্চিন পাকিস্তানের নেতৃত্ব পদে আসীন হইয়াছেন বটে এবং তাঁর পিপলস্ পার্টি কেন্দ্রীয় জাতীয় পরিষদে দ্বিতীয় স্থান ও পশ্চিমের প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে (সিন্ধুতে ও পাঞ্জাবে) নিরঙ্কুশ মেজরিটি পাইয়াছেন বটে কিন্তু ভারতের নিকট এরা আয়ুব খানের চেয়ে বেশী বিপজ্জনক——পূর্ব বাংলার আত্মনিয়ন্ত্রণের ও স্বাতন্ত্র্যের এরা শত্রু। প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া খান এদের সঙ্গে জোট বাধিয়েছেন কিম্বা এরাই আর্মির সহযোগিতায় ইয়াহিয়া খানকে বগলদাবা করিয়াছেন। সুতরাং এরা একত্রে মুজিবর রহমানের ক্ষমতালাভের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু কেন?—যেহেতু পূর্ববাংলা সমগ্র পাকিস্তানের জনসংখ্যার বিবেচনায় মেজরিটি (মোট ১২ কোটি ৩০ লক্ষ জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ পূর্ব বঙ্গের এবং বাকী মাত্র ৪৪ শতাংশ পশ্চিম পাকিস্তানের) এবং এই পূর্ববাংলার আওয়ামী লীগ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে সাম্প্রতিক নির্বাচনে ঐতিহাসিক জয় অর্জন করিয়াছে, সেইহেতু পশ্চিম পাকিস্তান আতঙ্কিত। কারণ তাদের ২২ বছরের জোর-জুলুম মিলিটারি শাসন ও শোষণের রাজত্বের অবসান হইতে চলিয়াছে মুজিবর রহমান ও পূর্ব বাংলার জয়যাত্রার জন্য। ১৩ বছর সামরিক শাসনের স্বৈরচারের পর গত ডিসেম্বর মাসে নির্বাচনের মাধ্যমে

জনগণের হাতে ক্ষমতা তুলিয়া দেওয়ার প্রস্তাব হইয়াছিল বটে, কিন্তু যে মুহূর্তে সেই ক্ষমতার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অংশীদার হইয়া দাঁড়াইয়াছেন পূর্ব বাংলার জনগণ ও জননেতা সেই মুহূর্তে ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা হস্তান্তরের ভণ্ডামী একেবারে হাতেকলমে ধরা পড়িয়া গেল। হয় পশ্চিম পাকিস্তানের মিলিটারি ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল পাঞ্জাবী চক্রের 'ডোমিনেশন' বা প্রভুত্ব সারা পাকিস্তানের উপর বজায় থাকিবে। নতুবা মিলিটারী শাসনের দৌরাত্মই চলিতে থাকিবে—এটাই হইতেছে ভুট্টো-আব্দুল-কায়ুম-ইয়াহিয়া গোষ্ঠির জোটবদ্ধ চক্রান্তের ফল। সুতরাং গণপরিষদের অধিবেশন এবং নূতন সংবিধান রচনা ও গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত জন-প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্বেও শেষ পর্যন্ত ইয়াহিয়া খান পূর্ব্ব বাঙ্‌লার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন এবং সাম্প্রতিক ইতিহাসে এই বিশ্বাসঘাতকতার কোনো তুলনা নাই। হঠাৎ আলোচনা (১০।১১ দিন ধরিয়া যেটা চলিতেছিল) ভাঙ্গিয়া দিয়া এবং আলোচনার আড়ালে নূতন নূতন সৈন্যদল আমদানি করিয়া ভুট্টো-ইয়াহিয়া সামরিক চক্র বাঙালীর ঘাড় মটকাইয়া রক্ত পানের জন্য ভয়ঙ্কর আক্রমণ ও হত্যাকাণ্ড সুরু করিয়া দিল। গত ২৫শে মার্চ্চ রাত্রি থেকে দুষমণদের শয়তানী আক্রমণ সুরু এবং সেই আক্রমণের বিরুদ্ধে চলিয়াছে সারা এশিয়ায় ইতিহাসের এক অদ্ভুত স্বাধীনতার লড়াই। একমাত্র ইন্দোচীনের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গেই এর তুলনা দেওয়া যাইতে পারে।

যুগান্তর পত্রিকার সহকারী সম্পাদক শ্রীমান কৃষ্ণ ধর কেবল একজন শক্তিশালী ও অভিজ্ঞ সাংবাদিক নন; তিনি একজন খ্যাতিমান কবি ও সাহিত্যিকও বটেন। তাঁর তীক্ষ্ণ, পরিচ্ছন্ন ও সরস রচনার আমি একজন অনুরাগী পাঠক। বিশেষতঃ তার প্রগতিশীল উদার দৃষ্টিভঙ্গী—যে দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর কবিতা ও সাংবাদিকতাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে এবং মানুষের মুক্তি সংগ্রামে তাঁর লেখনীকে প্রাণবন্ত

করিয়া তুলিয়াছে, আলোচ্য পুস্তকের ("মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ") মধ্যে পাঠকেরা সেই মননশীলতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাইবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশের এই অপূর্ব্ব মুক্তি যুদ্ধের মূলসূত্র কি, সেই ইতিহাসের রূপরেখা যেমন পাইবেন তেমনি এই যুদ্ধের একজন সহযাত্রীরূপে নূতন প্রেরণাও অনুভব করিবেন। শ্রীমান কৃষ্ণ ধরের লেখার সার্থকতা এখানে। ইতি—

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

লেখকের নিবেদন

পূর্ববাংলায়, যার নতুন নাম বাংলাদেশ, যে ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান দেখা দিয়েছে তার সূত্র অনুসন্ধান করতে গিয়েই এই বই লেখার প্রেরণা পাই। পূর্ববাংলা একদিন যুক্ত বঙ্গেরই অংশ ছিল। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগ একটি অভিশপ্ত সিদ্ধান্ত, যার জন্য দুই বাংলার মানুষকেই দিতে হয়েছে চরম মূল্য। অথচ তখনকার নেতাদের যদি একটু ধৈর্য ও দূরদর্শিতা থাকত তাহলে হয়তো বা এই ক্ষতিকর সিদ্ধান্ত এড়ানো যেত।

গত ২৩ বছরে অনেক শিক্ষা আমাদের হয়েছে। পূর্ববাংলার মানুষ রক্তের মূল্যে আজ উপলব্ধি করছেন স্বাধীনতা অর্জনের পথ কত দুর্গম, কত কঠিন। ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে একজন সামান্য লেখক ও সাংবাদিক হিসেবে আমার মনে হয়েছে, এই ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ করা আমাদের নিজেদের জন্যই আজ অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ, বাংলাদেশ আজ পৃথক রাষ্ট্র হলেও তার ইতিহাস আমাদের ইতিহাসের সঙ্গেই জড়িত। বিশেষ করে আমরা বাঙালীরা তো সীমান্তের ওপারের ঘটনাবলী কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারিনা।

বাংলাদেশের এই অভ্যুত্থানের পেছনে অন্যতম মহৎ চালিকাশক্তির কাজ করেছে বাংলাভাষা ও বাঙালীর সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। আমি এই বইয়ে দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, বৃটিশ আমল থেকেই বাঙালীর মনে সর্বপ্রথম দেখা দেয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও স্বাজাত্যবোধ। ক্ষুদ্র সংকীর্ণ অর্থে নয় স্বাদেশিকতার বৃহত্তর অর্থেই বাংলাদেশের জাগরণ ছিল এই উপমহাদেশের জাগরণের অগ্রদূত। বাঙালিয়ানার প্রতি আমার কোনো দুর্বলতা নেই। বাংলাদেশের এই মুক্তিযুদ্ধ শুধু বাঙালির আত্মগরিমায় আঘাত লেগেছে বলেই হয়েছে, একথা আমি মনে করিনা।

আমি মনে করি, এই অভ্যুত্থান একটি শোষিত জাতির আত্মরক্ষার অভিযান শোষকের বিরুদ্ধে। পশ্চিম পাকিস্তানী ধনিকশ্রেণীর স্বার্থেই বেতনভুক সৈন্যদের দিয়ে এত বড় গণহত্যা করা হল বাংলাদেশে।

এই সংগ্রামের একটি ঐতিহাসিক পটভূমিকা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে বইয়ে। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত সাফল্যের পর বৃহত্তর ও পূর্ণতর বিশ্লেষণ দেবেন ভবিষ্যতের লেখকরা। আমি শুধু তার ঐতিহাসিক রূপরেখা দিয়েই আমার কর্তব্য শেষ করলাম।

এই গ্রন্থ রচনায় পূর্বস্থূরী অনেক লেখকের গ্রন্থ থেকে তথ্যাদি গ্রহণ করেছি। তাঁদের নামের তালিকা গ্রন্থের শেষে দেওয়া হল। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমার সহকর্মী শ্রীবরুণ রায় তাঁর একটি রিপোর্ট এই গ্রন্থে পুনঃপ্রকাশের অনুমতি দিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় একটি গভীর বিশ্লেষণ-মূলক ভূমিকা লিখে দিয়ে এই গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। ভূমিকাটিকে শিরোধার্য করে তাঁর প্রতি জানাই আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা।

প্রকাশক বন্ধু শ্রীনিতাই মজুমদার অল্প সময়ের মধ্যে এবং যত্নের সঙ্গে বইটি ছাপাবার দায়িত্ব নিয়েছেন। তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানাই। দ্রুত মুদ্রণের জন্য বইয়ে কিছু ছাপার ভুল রয়ে গেল। সহৃদয় পাঠকদের কাছে তার জন্য আগেই ক্ষমাপ্রার্থী।

কৃষ্ণ ধর

গঙ্গা থেকে পদ্মা পেরিয়ে
যে বাংলাদেশ
তার মুক্তিযোদ্ধাদের
হাতে

এক আশ্চর্য দৃশ্য

॥ ১ ॥

'আমরা কুকুর বেড়ালের মত মরবনা, বাংলামায়ের
যোগ্য সন্তান হিসাবে শত্রুর মোকাবিলা করব।
আমরা সাড়ে সাত কোটি বাঙালী স্বাধীন।

শেখ মুজিবর রহমান।

ইতিহাসের এক আশ্চর্য দৃশ্য উন্মোচিত হল আমাদের চোখের সামনে। এ ইতিহাসের স্রষ্টা পঞ্চাশ বছরের এক বাঙালী। তাঁর নাম শেখ মুজিবর রহমান। ১৯৪১ সালের ২৬ মার্চ। রাত্রির আকাশে ভেসে এল সীমান্তের ওপার থেকে স্বাধীন বাংলা বেতারে মুজিবের কণ্ঠস্বর: বাংলাদেশ আজ থেকে স্বাধীন ও সার্বভৌম। আর পূর্ব পাকিস্তান নয়। এর নাম হল সার্বভৌম স্বাধীন জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশ সভরেণ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পিপলস্ রিপাবলিক অব বাংলাদেশ।

একই দিনে পশ্চিম পাকিস্তানের বেতার থেকে সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান হুমকী দিলেন: মুজিবর দেশদ্রোহী,

পাকিস্তানের শত্রু। পাকিস্তানকে ভেঙে টুকরো করতে চায় যারা তাদের শাস্তি পেতেই হবে।

এই ঘটনার এগারো দিন আগে থেকে এই ইয়াহিয়া খান সদলে এসে ধর্না দিয়েছিলেন বাংলাদেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী জননায়ক, জনগণের নির্বাচিত নেতা 'বঙ্গবন্ধু' শেখ মুজিবর রহমানের কাছে।

ঢাকায় প্রেসিডেণ্ট ভবনে কড়া পাঞ্জাবি মিলিটারির পাহারার আড়ালে বসে পাকিস্তানের স্ব-ঘোষিত প্রেসিডেণ্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান আলোচনার ভান করছিলেন বাংলাদেশের নেতাদের সঙ্গে। বিষয়ঃ সামরিক শাসকদের হাত থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর।

ইয়াহিয়ার পায়ে আয়ুবখাঁর পরিত্যক্ত বুটজোড়া। তিনি কতদূর যেতে পারেন তা বাংদেশের মানুষের অজানা নয়। তবু সাধারণ নির্বাচনে গোটা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবর রহমান তাঁর সঙ্গে বসলেন আলোচনায়। একদিন নয়। পর পর এগারো দিন চলল আলোচনা ঢাকার প্রেসিডেণ্ট ভবনে।

প্রথমে শুধু ইয়াহিয়া ও মুজিবর। পরে অন্যান্যরাও এসে যোগ দিলেন আলোচনায়।

আলোচনার প্রয়োজন ছিল প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়ার। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, নির্বাচনের পর নতুন জাতীয় পরিষদ কাজ করবে গণপরিষদ হিসেবে। তার উদ্দেশ্য পাকিস্তানের জন্য একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়ণ।

পাকিস্তানের দুই অংশের সকল রাজনৈতিক দল অংশ নিয়েছিল এই নির্বাচনে। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে নির্বাচন শেষ হয়। জাতীয় পরিষদে এবং প্রাদেশিক আইনসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেন মুজিবর এবং তাঁর দল আওয়ামি লীগ। পশ্চিম পাকিস্তানে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেন মুজিবরের প্রতিদ্বন্দ্বী পিপলস্ পার্টির জুলফিকার আলি ভুট্টো।

সুরু হল বিরোধ। মতের এবং পথের। মুজিবর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তাঁর জণগণের কাছে। কোরান ছুঁয়ে তিনি ঢাকার পল্টন ময়দানে লক্ষ লোকের জমায়েতে প্রতিজ্ঞা করেছেন, পূর্ববাংলার জন্য স্বায়ত্ত শাসন তিনি আনবেন। এটি ছিল তাঁর ছয় দফা দাবির অন্যতম। পাকিস্তানের ২৩ বছরের চেহারা তিনি দেখছেন। পূর্ব বাংলার মানুষও জানে পাকিস্তান কী এনে দিয়েছে তাদের জীবনে। আর নয়। এতদিন তাদের ছিল একজন উপযুক্ত নেতার অভাব।

মুজিবর রহমান তাদের সেই বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত নেতা। তিনি মুসলিম লীগ নেতাদের মতো হঠাৎ গজিয়ে ওঠেননি। বাংলার সংগ্রামী ঐতিহ্যের উত্তর সাধক মুজিবর। পাকিস্তানের জঙ্গী শাসনে তার ভাগ্য জুটেছে সুদীর্ঘ কারাবাস। ইয়াহিয়ার পূর্বসূরী মহম্মদ আয়ুব খান বাংলার এই অসমসাহসী দেশপ্রেমিক মানুষটিকে মিথ্যা ষড়যন্ত্র মামলায় ঝুলিয়ে ফাঁসি দেবার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করেছিলেন কিন্তু হলনা শেষ রক্ষা।

দশবছর একনায়কত্ব চালিয়ে প্রচুর ধনসম্পত্তি অর্জন করে আয়ুব খাঁকে বিদায় নিতে হয় অকস্মৎ ১৯৪৯ সালের মার্চে। তাঁর স্থান দখল করেন আরেক ফৌজ নায়ক জেনারেল ইয়াহিয়া খান।

দৃশ্যপট হল পরিবর্তিত। পাকিস্তানে এবার নতুন পালা। কোনো সামরিক শাসক স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ত্যাগ করেছে, এমন নজীর ইতিহাসে বিরল। ইয়াহিয়া সেই বিরলপুরুষদের অন্যতম হবার কোনো আকাঙ্ক্ষা রাখেন না।

তবু জনমতের চাপে তাঁকে বলতে হ'ল পাকিস্তানে অসামরিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনই তাঁর ক্ষমতা দখলের একমাত্র লক্ষ্য। তাঁরই নির্দেশমত রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হল। প্রতিশ্রুতি দিলেন প্রাপ্তবয়স্কের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের। পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল চারটি প্রদেশ মিলে এক ইউনিট। ইয়াহিয়া এক ইউনিট

ভেঙ্গে দিয়ে আবার পুরনো প্রদেশগুলোর অস্তিত্ব দিলেন ফিরিয়ে। দীর্ঘদিন ধরেই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে জনগণের এই দাবি।

পূর্ববাংলার মানুষ ভাবল, এবার নির্বাচনের পর গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে নিশ্চিতই তাদের দুঃখের দিন শেষ হবে। মুজিবরের আওয়ামিলীগ নির্বাচকদের সামনে ছ'দফা দাবি নিয়ে উপস্থিত হলেন।

এই ছ'টি দফা হল ঃ

১। ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করে পাকিস্তানকে একটি সত্যিকারের ফেডারেশন রূপে গঠন করতে হবে। এই সরকার হবে পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রানুযায়ী সরকার। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সার্বজনীন হবে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটের ভিত্তিতে। নির্বাচিত আইনসভাগুলো হবে সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন।

২। ফেডারেল সরকারের এক্তিয়ারে থাকবে মাত্র দুটি বিষয়—প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র। অবশিষ্ট সকল বিষয় রাজ্যসমূহের হাতে থাকবে।

৩। এই দফায় দুটি বিকল্প প্রস্তাব আছে ঃ (ক) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়-যোগ্য মুদ্রার প্রচলন। দুই অঞ্চলের জন্য দুটি স্বতন্ত্র ষ্টেট ব্যাঙ্ক অথবা (খ) দুই অঞ্চলে একই কারেন্সি থাকবে কিন্তু যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতে না পারে সংবিধানে তার ব্যবস্থা রাখতে হবে। এই বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও দুই অঞ্চলে দুটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকবে।

৪। সকল প্রকার খাজনা ও কর ধার্যের ক্ষমতা থাকবে রাজ্য সরকারগুলোর হাতে। আদায়ী রাজস্বের নির্ধারিত অংশ যাবে ফেডারেল তহবিলে।

৫। এই দফায় বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ে নিম্নলিখিত সুপারিশ করা হয়ঃ

(ক) দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক হিসাব রাখতে হবে।

(খ) পূর্ব পাকিস্তানে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এক্তিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এক্তিযারে রাখতে হবে।

(গ) ফেডারেশনের প্রয়োজনীর বৈদেশিক মুদ্রা দুই অঞ্চল থেকে সমানভাবে অথবা সংবিধানে নির্ধারিত হার অনুযায়ী আদায় হবে।

(ঘ) দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানী-রপ্তানী হবে।

(ঙ) বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি, ট্রেড মিশন স্থাপন ও আমদানী রপ্তানীর অধিকার রাজ্যসরকারকে দিতে হবে।

৬। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার জন্য একটি মিলিশিয়া অথবা প্যারা-মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করতে হবে।

এই ছ' দফা দাবি আওয়ামি লীগ বাংলাদেশের স্বায়ত্ত শাসন, তার শোষনমুক্তি ও নিজস্ব মর্যাদা প্রতিষ্ঠার অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করেছে। এই দাবি থেকে কোনো নেতার সময়েই একচুল সরে আসার উপায় নেই।

এই দাবিগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এতে পূর্ববাংলার এবং পাকিস্তানের অন্যান্য অঞ্চলেব স্বাযত্তশাসনের অধিকারই স্বীকৃত হয়েছে। পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হযে যাবার কোনো ইঙ্গিত এতে নেই। প্রকাশ্যে এই দাবির ভিত্তিতেই আওয়ামি লীগ নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়েছিল। ইয়াহিয়া খান বা তাঁর অনুগামীরা তখন এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলেননি। হয়তো তারা ভেবেছিলেন যে, এই দাবি একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের। তাদের পেছনে গোটা পূর্ববাংলা নেই।

তারা ভরসা করেছিলেন মুসলিম লীগ মোল্লাপন্থী জমায়েৎ-ইসলামী ও অন্যান্য ছোটখাটো অথচ রক্ষণশীল দলের ওপর।

পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলি ভুট্টো মজবুত কেন্দ্রীয় সরকারের দাবিতে পিপলস্ পার্টির হয়ে নির্বাচনে লড়লেন। মুসলিম লীগ, জমায়েৎ ইসলামী ছাড়া পশ্চিমে অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল খান ওয়ালি খানের ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেই তাঁর প্রভাব ও প্রতিপত্তি। পূর্ববাংলার অন্যতম বর্ষীয়ান জণনায়ক অশীতিয়ার বৃদ্ধ বামপন্থী মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামি পার্টি শেষ মুহূর্তে নির্বাচন থেকে তাঁর দলের প্রার্থীদের নাম প্রত্যাহার করে নেন। পূর্ববাংলায় যাতে সামগ্রিক জনমত কোনোরূপেই বিভক্ত না হয় মৌলানা ভাসানীর সিদ্ধান্ত ছিল সে উদ্দেশ্যেই। পরবর্তী ঘটনাবলী তা প্রমাণ করেছে।

নির্বাচনের আগে ১৯৪০ সালের অক্টোবরে পূর্ববাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত্যায় বিধ্বস্ত হয়ে যায়। নোয়াখালি, বরিশাল, খুলনার নিম্নাংশ, সন্দ্বীপ হাতিয়া, ভোলা প্রভৃতি এলাকায় কয়েক লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। আরও বহুলক্ষ লোক হয় গৃহহীন। বাংলাদেশের এই চরম দুর্দিনে পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট কিন্তু দুর্গতদের পাশে এসে দাঁড়াবার সময় পাননি। পিকিং থেকে ফেরার পথে তিনি বিমানে ঢাকায় এসে নামেন। হেলিকপ্টারে বিধ্বস্ত এলাকা ওপর থেকে দেখে ফিরে যান ইসলামাৰাদে।

বাঙালীর এই দুর্দিনে বিদেশীরা ছুটে গেলেন ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে। বৃটিশ সৈন্যরা গিয়ে মৃতদেহের স্তূপ থেকে উদ্ধার করল জীবিতদের। মার্কিনীরা অর্থ ও খাদ্য সাহার্য্য পাঠাল। ভারতবর্ষ পাঠাল এককোটি টাকার সাহায্য। পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট নড়লেন না ইসলামাবাদ থেকে। পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলকে তিনি এবং তাঁর সরকার কী চোখে দেখেন তার প্রমাণ আরেকবার পেল পূর্ববাংলার মানুষ।

এই ক্ষোভ প্রতিবাদের রূপ পেল নির্বাচনী ব্যালট বাস্কে।

ন্যাশনাল এসেম্বলি ও প্রাদেশিক আইনসভা দুটিতেই আওয়ামি লীগ পেল নিরঙ্কুশ, নিঃসংশয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা। ওদিকে পশ্চিম পাঞ্জাবে ও সিন্ধু প্রদেশে ৮৭টি আসন নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ হল পিপলস্ পার্টি। জুলফিকার আলি ভুট্টো যাঁর নেতা। নির্বাচনে দেখা গেল পূর্ব ও পশ্চিম সম্পূর্ণ আলাদা রাজনৈতিক চিন্তার দিক দিয়ে। পার্লামেণ্টারি রীতিনীতি মানতে হলে, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে মুজিবর রহমানকেই আহ্বান করতে হয় প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের জন্য। পাকিস্তানকে যদি একটি রাষ্ট্র হিসাবে গণ্য করা হয় তাহলে মুজিবরই প্রধানমন্ত্রী হন। গণপরিষদেও তাঁর দলেরই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। সুতরাং তার দল ইচ্ছা করলেই তাদের দাবি অনুযায়ী পাকিস্তানের নতুন গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনা করতে পারেন। ইয়াহিয়া খান বললেন, মুজিবরই হবেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। ইয়াহিয়া সেই কথা রাখতে পারলেন না। কারণ, তিনি সত্যি সত্যিই চাননি একজন বাঙালী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হোক। তিনি চাননি বাংলাদেশ তার ন্যায়সঙ্গত স্বায়ত্তশাসন অধিকার পাক। মুজিবর স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিলেন পাকিস্তানের নতুন সংবিধানের ভিত্তি হবে আওয়ামি লীগের ছ' দফা দাবি।

ওদিকে জুলফিকার আলি ভুট্টো শাসালেন, কোনোমতেই এই ছ' দফা দাবি মানা হবে না। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারকে দুর্বল করার কোনো দাবিই মেনে নেবেনা তার দল। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি।

মৌলানা ভাসানী জানতেন, এই নির্বাচন শুধু সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেবার জন্য। পশ্চিম পাকিস্তানী জঙ্গী শাসকরা কোনোদিনই জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। বাংলাদেশের মানুষের হাতে তো নয়ই। বৃদ্ধ মৌলানা ১৯৪০ সালের ১০ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে ঘোষণা করলেন, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা চাই। এ ছাড়া বাঙালীর কোনো মুক্তি নেই।

পশ্চিম পাকিস্তানের সকলেই পূর্ববাংলার এই দাবির প্রতি সহানুভূতিহীন, একথা মনে করলে ভুল হবে। জঙ্গী শাসনের দাপটে পশ্চিম পাকিস্তানে স্বাধীন চিন্তা ও মতবাদ স্তব্ধ হয়েছিল। কিন্তু নির্বাচনের পরে পশ্চিম পাকিস্তানের অনেক নেতা বুদ্ধিজীবী বললেন সংখ্যাগরিষ্ঠ আওয়ামী লীগকে তার ন্যায়সঙ্গত দাবি পূরণ করতে দেওয়া হক। পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখতে হলে পূর্ববাংলার সম্মতি নিয়েই তা রাখতে হবে। তাকে ভয় দেখিয়ে শাসিয়ে কাজ হবে না।

এই বিতর্কের মধ্যেই ইয়াহিয়া খান ঘোষনা করলেন, ১৯৪১ সালের ৩ মার্চ নব নির্বাচিত ন্যাশনাল এসেম্বলির অধিবেশন বসবে ঢাকায়। ঢাকায় অধিবেশন বসবার দাবি ছিল মুজিবরের। ভুট্টো অনড়। মুজিবরের সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাপটের তলায় তিনি ন্যাশনাল এসেম্বলিতে যেতে নারাজ। তিনি দুই পাকিস্তানে দুই প্রধানমন্ত্রীর এক প্রস্তাব দিলেন। তাতেও যখন কিছু হলনা তখন তিনি চাইলেন, অধিবেশন বসবার আগে মুজিবরের সঙ্গে আরেক দফা আলোচনা।

ইয়াহিয়া খান গোড়া থেকেই ভুট্টোকে তুষ্ট করতে ব্যস্ত। কারণ ভুট্টোর পিপলস্ পার্টির পেছনে পাঞ্জাবি ও সিন্ধী পুঁজিপতিদের সমবেত শক্তি। পাঞ্জাবী সেনাবাহিনীও ঝুঁকে রয়েছে ভুট্টোরই দিকে। তিনিই তাদের কাছে উদীয়মান সূর্য্য। পাকিস্তানের ত্রাতা। ইয়াহিয়া তাই ভুট্টোর কথামত ন্যাশনাল এসেম্বলির অধিবেশন পিছিয়ে দিলেন ২৫ মার্চ ১৯৫১ পর্যন্ত।

এদিকে ঢাকায় প্রতিনিধিরা সমবেত। অধিবেশনের সমস্ত প্রস্তুতি শেষ। ইয়াহিয়া খাঁর নির্দেশ আঘাত দিল বাংলার গণতান্ত্রিক জনমানসকে। তারা বুঝলেন, এ শুধু আলোয়ার পিছনে ছোটা। পশ্চিম পাকিস্তানী জঙ্গী শাসক ও তাদের তল্পীবাহকরা নিয়মতান্ত্রিকভাবে কোনোদিনই ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না।

এদিকে পয়লা মার্চ ১৯৫১, পূর্বপাকিস্তানের গভর্ণরভাইস-এডমিয়াল

এস, এম, আহ্‌মানকে কোনো কারণ না দেখিয়ে বরখাস্ত করলেন ইয়াহিয়া খাঁ। তখন থেকেই ষড়যন্ত্রের প্রস্তুতি। যে ষড়যন্ত্র ২৬ মার্চ তারিখে বাংলাদেশকে নিরস্ত্র মানুষের রক্তে আর অশ্রুতে ভাসিয়ে দিয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক চক্র। ভাইস-এডমিরাল আহ্‌মানের প্রথম দোষ ছিল তিনি বাঙালী। দ্বিতীয় দোষ, তিনি শেখ মুজিবর রহমানকে জনগণের এক আশ্চর্য নেতা বলে অভিহিত করেছিলেন। এমন এক ব্যক্তিকে গভর্ণর রেখে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের পক্ষে গণহত্যা সম্ভব হত না বলেই আগেই তাকে সরিয়ে পথ পরিষ্কার করে দেওয়া হল।

বাংলাদেশ প্রস্তুত হতে লাগল তার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের জন্য। পাকিস্তানী সৈন্যরা দলে দলে ব্যারাক থেকে বেরিয়ে রাজধানী ঢাকার পথে পথে ঘাটি আগলাতে লাগল। সান্ধ্য আইন জারি হল। ৩ মার্চ ১৯৫১। শেখ মুজিবর রহমান ঘোষনা করলেন কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। এ ছাড়া অন্য কোনো পথ খোলা ছিল না মুজিবর রহমানের সামনে। সাড়ে সাত কোটি মানুষের দেশ বাংলা। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশ। সংখ্যাগরিষ্ঠ এই অঞ্চলকে গত ২৪ বছর ধরে শোষণ ও শাসন করেছে পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যালঘু চক্র। ওরা বলেন মুজিবরের দাবি হল পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশকে বের করে নিয়ে যাবার।

মুজিবর জবাব দেন, আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। আমরা পাকিস্তান থেকে বের হয়ে যাব কেন?’

বাংলাদেশের গণজাগরণ দমন করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানীরা সেনাবাহিনী নিয়োগ করেছে পয়লা মার্চ থেকেই। হিংস্রনগ্ন ও নির্লজ্জ সে আক্রমণ। শান্তিপূর্ণ হরতাল দিয়ে সুরু হল বাংলাদেশের প্রতিবাদ অভিযান। মূল লক্ষ্য ছ’ দফা দাবি আদায়।

ইয়াহিয়া তখনও তার চাতুরীর খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন পূর্ববাংলার

মানুষের সঙ্গে। ১০ মার্চ তিনি আবার এক আলোচনা বৈঠক ডাকলেন নির্বাচিত নেতাদের সঙ্গে। কী করা যায় এ নিয়ে হবে আলোচনা। মুজিবর সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন। বাংলাদেশের নিরস্ত্র মানুষের ওপর হিংস্র আক্রমণ চালিয়ে বেয়নেটের মুখে তিনি আলোচনায় যোগ দিতে পারেন না।

আওয়ামী লীগের সভায় তিনি ঘোষনা করলেন শহীদের বুকের ওপর দিয়ে আমি ন্যাশন্যাল এসেম্বলিতে যোগ দিতে যাব না। ইয়াহিয়া দেখলেন, কোনো উপায় নেই। ন্যাশন্যাল এসেম্বলির টোপ দিয়েই বাংলার নেতাকে ধরতে হবে। ২৫ মার্চ ১৯২৫—নির্ধারিত হল ন্যাশান্যাল এসেম্বলির বৈঠকের নতুন তারিখ। এই ঘোষণা ইয়াহিয়া দিলেন ৫ মার্চ।

কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা দিল না বাংলাদেশে। ৭ মার্চ মুজিবর রহমান ঘোষনা করলেন, তিনি সমস্ত সরকারী ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নিচ্ছেন। সামরিক বাহিনীর লোকছাড়া অন্য সমস্ত সরকারী কর্মচারীকে তাঁর কাছ থেকে নির্দেশ নেবার জন্য তিনি আবেদন জানান। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের জনসাধারণকে কেন্দ্রীয় সরকারকে কোনরূপ কর না দিতে তিনি নির্দেশ দেন। ইয়াহিয়া খানকে তিনি জানিয়ে দেন, অবিলম্বে চারিটি শর্ত যদি পাকিস্তান সরকার মেনে নেন তাহলেই তাঁর দল ন্যাশন্যাল এসেম্বলিতে যোগ দেবে।

এই চারটি শর্ত হল ঃ

অবিলম্বে সারাদেশ থেকে সামরিক আইন তুলে নিত হবে।

সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে।

নির্বাচিত সরকারের হাতে শাসন ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে হবে।

বাংলাদেশে নির্বিচার হত্যার তদন্ত করতে হবে।

ইয়াহিয়া খান চললেন তাঁর সামরিক উপদেষ্টাদের পরামর্শে। আশা ছিল গুলি করেই তিনি বাঙালীদের শায়েস্তা করবেন। মুঘলরা

যেমন দিল্লী থেকে গভর্ণর পাঠাত বাংলাদেশে সেই কায়দাতেই ইয়াহিয়া খান অবাধ্য বাঙালীদের শাসন ও দমন করার জন্য পাঠালেন নতুন সামরিক গভর্ণর লেফটেনাণ্ট জেনারেল টিক্কাখানকে। ৯ মার্চ ছিল তাঁর শপথ গ্রহণের দিন। ঢাকার বিচারপতিরা একে একে সকলেই অসম্মতি জানালেন সামরিক গভর্ণরকে শপথ গ্রহণ করাতে।

বাংলাদেশ একের পর এক আশ্চর্য সাহসিকতা ও দেশাত্মবোধের পরিচয় দিতে লাগল। কেন্দ্রীয় সরকার হুকুম দিলেন, ১৫ মার্চের মধ্যে সরকারী কর্মচারীরা কাজে যোগ না দিলে তাদের শুধু বরদাস্তই করা হবে না সামরিক আদালতে তাদের বিচার হবে।

একটি মানুষও তাতে ভীত হল না। সরকারী কাজকর্ম আগের মতোই অচল। মুজিবরের ধানমণ্ডীর বাড়িই হল বাংলাদেশের সরকারীভবন। তাঁর কথা ছাড়া কেউ এক পা এগোলন না।

পনেরোই মার্চ তারিখেই মুজিবর ঘোষনা করলেন, স্বায়ত্তশাসন। ৩৫ দফা নির্দেশ জারি করলেন বাংলাদেশের মানুষের উদ্দেশ্যে। এই দিনটিতেই মুজিবর রহমান তাঁর প্রতিশ্রুতি কার্যকর করার পথে সুস্পষ্ট পদক্ষেপ করলেন। ৩৫টি নির্দেশনামা হল নতুন স্বায়ত্তশাসিত বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কিত। ঢাকা থেকে প্রচারিত এক ঘোষনায় মুজিবর বললেন, প্রাদেশিক আইনসভায় তাঁর দলের নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা এবং জাতীয় পরিষদে তাঁর দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে তিনি বাংলাদেশের ৭ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষের কল্যাণে দেশের শাসনভার নিজের হাতে তুলে নিলেন। বাংলাদেশের প্রশাসনভার তাঁর স্বহস্তে তুলে নেবার উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশের জনগণের মুক্তি।

ইসলামাবাদ টের পেল পূর্বকোনে ঝড়ের সংকেত। পূর্ব দিগন্তেই হয় সূর্যোদয়। পূর্বদেশের অপর নাম বাংলাদেশ। চক্রান্তকারী ইয়াহিয়া খান শান্ত নিরীহ আলোচনাকারীর মুখোস পরে সেইদিনই উড়ে এলেন ঢাকায়।

১৫ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ এগারোদিন তিনি ছিলেন ঢাকায়।

প্রত্যাশিত ন্যাশনাল এসেম্বলির বৈঠক বসল না। ঢাকায় দফায় দফায় বসল আলোচনা। আলোচনায় কোনো সূত্র আবিষ্কৃত হল না মীমাংসার। আলোচনার সময় পশ্চিম পাকিস্তানের জুলফিকার আলি ভুট্টো, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের খান ওয়ালি খানও উপস্থিত ছিলেন। এসেছিলেন বিচারপতি কর্ণেলিয়াসও।

কিন্তু জুলফিকার আলি ভুট্টো একচুলও নড়লেন না। ইয়াহিয়া খান বাংলাদেশের কোনো দাবিই স্বীকার করলেন না। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের আশা ব্যর্থ হল।

২৫ মার্চ গভীর রাত্রিতে আলোচনা অসমাপ্ত রেখে ঢাকার প্রেসিডেণ্ট ভবন থেকে এক বিশেষ বিমানে ইয়াহিয়া খান চলে গেলেন ইসলামাবাদ। তাঁর পিছু পিছু গেলেন জুলফিকার আলি ভুট্টো। ২৬ মার্চ মুজিবর ঘোষণা করলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা। একই দিনে ইয়াহিয়ার নেকড়ের দল ঝাপিয়ে পড়ল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ওপর।

এ হল ইতিহাসে পর্বান্তর। বাংলাদেশ আজ দুভাগে বিভক্ত। তাই পশ্চিমের বাঙালী অসহায়ের মতো রক্ত ঝরা দেখছে পূবের বাঙালীর।

বাংলাদেশের এই মর্মান্তিক পরিণতি জানতে হলে আমাদের আরও পিছিয়ে যেতে হবে। বাংলাদেশকে শায়েস্তা করার জন্য দমন-পীড়ন স্থরু হয়েছিল বৃটিশ আমলেই।

আমরা সেই ইতিহাসের দিকেই চোখ ফেরাই।

ইতিহাসের নেপথ্যে

॥ ২ ॥

সবুজ বাঙলা লালে লাল আজ একি ?
নীলিমায় লাল রক্তসূর্য ওঠে
কচি ঘাস পাতা বাঙ্‌লার ম্রিয়মান
পলাতক-আলো সোনার বাঙ্‌লা মাগো।

আনসার আলী

বাংলার বিদীর্ণ হৃদয়ের কান্না শোনা যায় পূর্ববাংলার তরুণ কবির মুখে। সত্তরের বিস্ফোরিত দশকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাংলা দেশের গণমানস আজ যেন নতুন সম্ভাবনায় থরোথরো কম্পমান। গঙ্গার জলে যে সুর ওঠে পদ্মার ঢেউয়ে তারই সঙ্গতি। ময়ূরাক্ষীর জলধারা আজ যেন খুঁজে নিতে চায় মেঘনা ধলেশ্বরীকে। গারো পাহাড়ের নীল অরণ্যের ছায়া এসে পড়ে রাঢ়ের উদার উজ্জ্বল গেরুয়া প্রান্তরের উদাস বুকে। পুবের হাওয়াতে ভেসে আসে এক অবিস্মরণীয় ধ্বনিঃ জয় বাংলা। এই ধ্বনি হৃত সর্বস্ব এই বাংলার বাঙালীদেরও হৃদয়ের কথা। এই ধ্বনির কোনো বিকল্প নেই। হু লিভস্ ইফ বেঙ্গল ডাইজ ? এই প্রশ্ন একদিন উচ্চারিত হয়েছিল যুক্ত বাংলার অন্তিম পর্বে দূরদ্রষ্টা রাজনীতিকের মুখে। বাংলাদেশ তখন মন্বন্তরের মহাশ্মশানে মৃতপ্রায়। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অস্তলগ্নে বিদ্রোহী বাংলাকে শেষবারের মতো আঘাত দিয়েছিল ইংরেজ শাসকদল। সারা ভারতবর্ষে তখন মুক্তির অন্দোলনের দুর্বার সংকেত—আসমুদ্র হিমগিরি কম্পমান। বাংলার

হৃদয়ে তখন অজস্র রক্তপাত। তাই জেগেছিল প্রশ্ন: বাংলা মরলে কে বাঁচে?

উনিশশো একাত্তরে বাংলার অপর প্রান্তে 'বঙ্গবন্ধু' মুজিবরের কণ্ঠেও আজ একই জিজ্ঞাসা: বাংলাদেশকে মারে সাধ্য কা'র? ইতিহাসের এক আশ্চর্য পট পরিবর্তন। ইতিহাসের চাকা এভাবেই আবর্তিত হয়। তার দুর্বার দুর্দম গতি রোধের সাধ্য কারো নেই। নাৎসী জার্মানীতে ফ্যাসিস্ত হিটলার চেয়েছিল; ইতিহাসের চাকা বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে দিতে। লক্ষ কোটি মানুষের প্রাণের মূল্যে সেই গতি আবার সঠিক পথে নিয়ে আসা হয়েছিল। বাংলা দেশেও যেন আমরা সেই ঐতিহাসিক অগ্রযাত্রাই লক্ষ্য করি।

একে আমরা কী আখ্যায় অভিহিত করব? বাঙালীর সংকীর্ণ জাতীয়তা বোধ? না, বাঙালীর বিদ্রোহী মানসিকতার জাগরণ?

পূর্ব ও পশ্চিম। একই সত্তার দুটি দিক। পুবের আকাশে যে সূর্যের দীপ্তি পশ্চিমে তারই উজ্জ্বলতা। পশ্চিমে যে জাগরণের সঙ্গীত পুবে তারই প্রসার। প্রীতি ও মমতার কোনো ভৌগোলিক সীমারেখা নেই। বাংলা দেশ আজ রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বে বিভক্ত; হৃদয়ের অস্তিত্বে সে অখণ্ডিত। দেশভাগ একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যেমন তার কোনো অস্তিত্ব নেই, হৃদয়ের ক্ষেত্রেও তাই। ব্যক্তিগত জীবনে যা সত্য, গণজীবনেই বা তা মিথ্যা হবে কেন? মিথ্যা যে হয় না তার প্রমাণ পুব বাংলায় সাম্প্রতিক জাগরণ। এ শুধু জাগরণ নয় এ যেন একটি জাতির সামগ্রিক উত্থান। ভাগীরথীর তীরে যে বঙ্গ-সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশ পদ্মার তীরেও তারই সস্নেহ লালন ও পরিচর্যা। এই বাংলায় যে ক্ষোভ তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে আমরা দেখতে পাব পুবের বাঙালীর বিদ্রোহ বা ক্ষোভের কারণের সঙ্গে রয়েছে এক আশ্চর্য সাদৃশ্য। বিচ্ছিন্নতা নয়, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার এক দুর্দম সংকল্প রয়েছে বাঙালীর মনে। বাংলার দুই প্রান্তে তার প্রকাশ ভিন্ন, আন্দোলনের গতি

ভিন্নতর। কিন্তু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, দুইয়েরই মনে একই ক্ষোভ। গণতান্ত্রিক অধিকার যখনই রাষ্ট্র শক্তির অন্যায় ব্যবহারে হয়েছে পর্যুদস্ত তখনি বাংলার জাগরণ। বাঙালীর মনে যে-বিদ্রোহী সত্তার উপস্থিতি এ তারই প্রকাশ।

রাষ্ট্রশক্তি বারবার বাংলা দেশকে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত করে চেয়েছে সংযত করতে। ইতিহাসে তার নজীর রয়েছে অনেক। বাংলাকে তার জন্য দিতে হয়েছে চরম মূল্য। কিন্তু চিরকালই এই উপমহাদেশে বাংলাদেশ "আঁফাঁ তেরিবল"—সেই নিঃশঙ্ক বিদ্রোহী। রাজনীতিতে সংস্কৃতিতে, জীবন চর্যায় তার স্বাতন্ত্র্য সে বজায় রাখতে চেয়েছে। গণমুক্তির আদর্শে বিশ্বাসী বাংলা চিরকালই চেয়েছে উদার মানবিকতার জয়। তার সমাজবিন্যাসে, শিল্পে, সংস্কৃতিতে সেই জয়যাত্রারই অভ্রান্ত স্বাক্ষর।

মুজিবর রহমান যে-ভাষায় কথা বলছেন, পুবের বাঙালীরা যে-ভাষার প্রতিধ্বনি করছেন সাড়ে সাত কোটি কণ্ঠে, এ ভাষা শাশ্বত বাংলারই ভাষা। একই সংস্কৃতির উত্তর-সাধক রূপে আমরা দুই প্রান্তের বাঙালী আজ পরস্পরের কাছাকাছি। ২৪ বছরের অদর্শন, প্রতিকূলতার প্রাচীর হৃদয়ের সেই বন্ধন ছিন্ন করতে পারেনি। তাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরের কণ্ঠে শুনি বাংলার নিজস্ব অন্তরের কথা। তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথ-নজরুলকে বাদ দিয়ে বঙ্গ সংস্কৃতির চিন্তা করা পাপ। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের ওপর কোনোরূপ নিষেধাজ্ঞা বাঙালী সহ্য করবে না। নজরুলের কবিতার কোনরূপ অঙ্গহানি বাঙালীর কাছে অসহনীয়।

বাংলার কালচার বাঙালীরই কালচার। তাকে পাকিস্তানী পলেস্তারা দেওয়া চলবে না। বাংলা ভাষা বাঙালীর হৃদয়ের ভাষা। তাতে অযথা উর্দু আরবীর হস্তক্ষেপ ঘটানো চলবেনা। পুবের বাঙালী তাই মাইকেল মধুসূদনের জন্মদিনে নতশিরে হৃদয়ের অর্ঘ নিয়ে সমবেত হয় কপোতাক্ষ নদের তীরে সাগরদাঁড়ি গ্রামে,

কবির পৈত্রিক ভিটেয়—বাঙালীর ঋণ শোধ করতে। যে-কবি বলেছিলেন, 'রেখো মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে' সে কবিকে বাঙালী বিস্মৃত হয়নি। আমরা যেন এখনো শুনি সেই কবির আবেদন, দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে।

মুজিবরও তাই বলছেন, জন্ম যদি তব বঙ্গে। বাংলা দেশই বাঙালীর প্রথম তীর্থ। বাংলাদেশই বাঙ্গালীর প্রথম আরাধ্য। এখান থেকেই তার জাতীয়তাবাদের দীক্ষা। এই মাটি থেকেই তার আন্তর্জাতিকতায় উত্তরণ। 'দক্ষিণে সুন্দরবন উত্তরে টেরাই'—কবির ভাষায় এই হল বাংলার সীমানা। এই সীমানা বদল হয়েছে রাজনীতির কারণে। কিন্তু বাংলার হৃদয় রয়েছে এক ও অখণ্ড।

বাঙালীকে বলা হয় ভাবপ্রবণ জাতি। বাঙালী তার নিজস্বতা নিয়ে বড় বেশি চিন্তা করে। কেন করে এই বিচার করবার দিন আজ এসেছে। আজ কেন দুই বাংলাই আবেগে উত্তাল। দুই বাংলাতেই এক অবিস্মরণীয় গণ-জাগরণ। এই জাগরণের সূত্রপাত হয়েছে শতাব্দীকাল আগেই। বাংলাদেশ যখন ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবলিত উপনিবেশ। এখানেই প্রথম বৃটিশের পদসঞ্চার। এখানেই তার বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ। বৃটিশ শাসনে প্রথম বিদ্রোহ—সিপাহীদের যুদ্ধ সুরু হয় এই বাংলাদেশ থেকেই। ব্যারাকপুর ছাউনিতে প্রথম বিদ্রোহের পতাকা ওড়ায় সিপাহী মঙ্গল পাঁড়ে। তারও আগে এই বাংলাদেশে ঘটেছে অত্যাচারিত কৃষকদের বিদ্রোহ। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় বাঁকুড়ায় দেখা দিয়েছিল কৃষকদের বিদ্রোহ। মেদিনীপুরে চোয়ার বিদ্রোহ (১৭৯৯), উত্তর বাংলায় সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬০-১৮০০), দিনাজপুরে কোম্পানীর ইজারদার অত্যাচারী দেবী সিংএর বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহের নজীর রয়েছে ইতিহাসে। এ থেকে বোঝা যায় বাংলাদেশ কোন সময়েই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের শাসন ও শোষণ

নীরবে বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয়নি। এর জন্য তাকে মূল্য দিতে হয়েছে প্রচুর।

ইতিহাস বলে, বিদ্রোহের পথেই আসে সমাজ পরিবর্তনের ইঙ্গিত। আজ পূব বাংলায় যে সংগ্রাম সুরু হয়েছে কিংবা এই বাংলায় যে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের পক্ষে বিপুল গণ-জাগরণ তার চরিত্র পৃথক হলেও, একথা স্বীকার্য যে, দুই বাংলাই নিজেকে বঞ্চিত মনে করে বলেই এই ক্ষোভ। পূর্ববাংলার ক্ষোভ তীব্রতর এই কারণে যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে তাঁর অধিবাসীরা গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত, পশ্চিমী অর্থনীতিক শোষণে নয়া উপনিবেশে রূপান্তরিত। ভারতের অন্তর্ভুক্ত পশ্চিম বাংলা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অঙ্গীভূত হলেও তার অর্থনীতিক শোষণ জনসাধারণকে রিক্ত ও নিঃস্ব করে ফেলেছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও বৃহৎ ভারত রাষ্ট্রে বাঙালীর স্থান আজ নগন্য। তার ভাষার কোনো মর্যাদা নেই। তার অর্থনীতিক অবস্থা আজ এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেচে যে ব্যাপক কর্মপ্রচেষ্টা ও সমাজ তান্ত্রিক পরিকল্পনা ব্যতীত এই রাজ্যের বৈষয়িক সমৃদ্ধি ও বেকার সমস্যার সমাধান অসম্ভব।

দুই বাংলাই নিজ নিজ রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কর্তাব্যক্তিদের শিরঃপীড়ার কারণ। বাংলাদেশ যখন অখণ্ড ছিল তখনও বিদেশী শাসকদের কাছে সবচেয়ে উদ্বেগের কারণ ছিল বাঙালীই—সে হিন্দুই হোক, কি মুসলিমই হোক। বাংলাদেশই সর্বপ্রথম পথ দেখিয়েছে বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের। সে বিদ্রোহ নিশ্চিতই বিপ্লব ছিল না। কিন্তু আজকের যুগে গেরিলারা যে-পথে অপশাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, বাঙালীর সশস্ত্র বিদ্রোহে যেন তারই অঙ্কুর ছিল সেদিন। সুদূর চট্টগ্রাম থেকে মেদিনীপুর পর্যন্ত বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দেখা দিয়েছিল বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে উদ্ধত বিদ্রোহ। পরে ভারতের অন্যান্য প্রান্তেও বাংলার আত্মদান অনুপ্রাণিত করে হাজার হাজার তরুণকে। ক্ষুদিরাম হলেন সেই বিদ্রোহের প্রথম অগ্নিশিখা। প্রেইরী

প্রান্তরে আগুনের মতো তা ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতের নানা প্রান্তে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে সুরু হয় বাংলার এই অগ্নি-অভিযান। সেদিনও প্রথম আঘাত এসেছিল সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রীদের কাছ থেকেই। ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল—এই সাম্রাজ্যবাদী নীতি ইংরেজরা সর্বত্র তাদের উপনিবেশে প্রয়োজন মতো ব্যবহার করেছে। অখণ্ড বাংলাদেশেও এই নীতিই তারা প্রয়োগ করেছিল বাংলাদেশকে ভাগ করে।

বাংলাদেশের বিক্ষোভ ও বিদ্রোহে সন্ত্রস্ত ইংরেজ শাসকরা প্রথমেই আঘাত হানলেন এঁকে দু টুকরো করার জন্য। যে বিভাগ ১৯৪৭ সালে ১৪-১৫ আগস্ট কায়েম হয়েছিল ভারতবর্ষকে বিদীর্ণ করে তার প্রথম মহড়া হয়েছিল তারও অনেক আগে ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের কূটবুদ্ধিতে। সাম্রাজ্যবাদীরা বুঝতে পেরেছিল পূর্বদেশ থেকেই সুরু হবে সূর্য পরিক্রমা। ওদিকে নবজাগ্রত জাপানের হাতে দুর্ধর্ষ রুশ সম্রাট জারের পরাজয় (১৯০৪-০৫) গোটা এশিয়ায় নতুন উদ্দীপনার বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। পারস্যে, তুরস্কে, চীনে তার পরবর্তী বছরগুলোতেই দেখা দেয় বিপ্লবের মাথা নাড়া।

ভারতে বৃটিশ ভাইসরয় লর্ড কার্জন তার অর্থ বুঝতে দেরী করলেন না। প্রথমেই নির্দেশ দিলেন, বাঙালীর বিক্ষোভকে দমন করতে হলে তার ভৌগোলিক সীমারেখা করতে হবে সংকুচিত। কার্জনী খড়্গাঘাতে এক বাংলা দেশ হল দ্বিধাবিভক্ত। একটি হল বঙ্গ। কলকাতা হল তার রাজধানী। অপরটি হল পূর্ববঙ্গ ও আসাম। ঢাকা হল তার রাজধানী। হিন্দু ও মুসলিম বিরোধ জাগিয়ে তোলাই ছিল এই চক্রান্তের উদ্দেশ্য। বিদীর্ণ বাংলার হৃদয় থেকে সেদিন যে রক্ত ঝরেছিল তা রূপান্তরিত হল জাতীয় ক্রোধে। সুরু হল ঐতিহাসিক স্বদেশী আন্দোলন। কলকাতার রাজপথে রবীন্দ্রনাথ বেরোলেন তাঁর অপূর্ব কণ্ঠের স্মরণীয় সঙ্গীত নিয়ে—

বিধির বাঁধন কাটবে তুমি
এমন শক্তিমান
তুমি কি এমনি শক্তিমান!

সারা ভারতবর্ষ উত্তাল হয়ে উঠল। বাংলার প্রতি এই অবিচারের প্রতিকারের জন্য মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখলে দেশে ও বিদেশে জনমত সংগঠন করতে লাগলেন। ভাইসরয়ের লেজিস লেটিভ কাউন্সিলে গোখলে আবেদন করলেন, My lord, conciliate Bengal! দুই বাংলার সম্মিলনের জন্য গোখেলের সেই আবেদনে কোনো ফল হলনা। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর কার্জনী কানুনে বাংলা যেদিন বিভক্ত হল সেদিন সারা বাংলায় সুরু হল এক অভূতপূর্ব আন্দোলন—স্বদেশী আন্দোলন নামে যার ইতিহাস প্রসিদ্ধি। সেই দিনটিকে দুই বাংলার মানুষ পালন করেছিল জাতীয় শোক দিবস রূপে।

মাতৃভূমির অঙ্গচ্ছেদ অসহনীয় যে কোনো দেশপ্রেমিক মানুষের কাছে। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন সেই বিখ্যাত গান:

বাংলার মাটি বাংলার জল,
বাংলার বায়ু বাংলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হোউক,
হে ভগবান।

সে এক অভূতপূর্ব উন্মাদনা। বাংলা দেশকে ভাগ করা চলবে না। বাংলার মানুষ এক; বাংলার সংস্কৃতি এক। জন্মসূত্রে বাঙালীর পারস্পরিক রাখি বন্ধন। তাকে ছিন্ন করার ক্ষমতা নেই বিদেশী শাসকদের।

আজকের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে আমরা যখন ওপার বাংলা থেকে ধ্বনি শুনি: জয় বাংলা, তখন শতাব্দীর প্রথম দশকে যে আন্দোলন হয়েছিল তারই প্রতিধ্বনি যেন অনুভব করি অন্তরে। এ যেন ইতিহাস চক্রেরই আবর্তন। সেদিন হয়তো বা মুসলিম

বাঙালীর চেতনা আজকের মতো শাণিত হয়নি। কিন্তু আজ তারা রক্ত দিয়ে মাতৃভূমির ঋণ শোধ করছে। তার মহিমান্বিত রূপ প্রত্যক্ষ করে আমরা অভিভূত। আমাদের স্মরণে আসছে ১৯০৫ সালের পয়লা নভেম্বরের কথা। সেদিন কলকাতায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী এক জনসভায় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন বাঙালীর জাতীয়তাবাদের উজ্জ্বল ইস্তাহার। তিনি বলেছিলেন :

> Whereas the Goverment has thought fit to effectuate the Partition of Bengal in-spite of the universal protest of the Bengali nation, we hereby pledge and proclaim that, as a people, we shall do everything in our power to counteract the evil effects of the dismemberment of our province and to maintain the integrity of our race. So help us God.

অর্থাৎ বাঙালী জাতির সামগ্রিক প্রতিবাদ সত্ত্বেও যখন সরকার বঙ্গদেশ বিভাগের সিদ্ধান্ত নেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করেছেন তখন আমারা এই প্রতিজ্ঞা ঘোষনা করছি যে, আমাদের প্রদেশের অঙ্গচ্ছেদ রোধে এবং আমাদের জাতির সংহতি রক্ষার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে আমরা কাজ করে যাব। ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন।" ইংরেজ শাসক কিছুদিন পরেই উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, তাদের এই অপসিদ্ধান্তের সমর্থক নেই এদেশে। কিন্তু আর কিছু করার উপায় নেই। কারণ বঙ্গবিভাগ বৃটিশ শাসকদের মতে, একটি "Settled fact"। সুরেন্দ্রনাথ বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, We shal unsettle the settled fact."

সেই সময়েই সুরু বাংলার অগ্নিযুগ। সশস্ত্র সন্ত্রাসের পথ নিল বাংলার যুব সমাজ। তখন থেকেই বোমারু বাঙালী নাম ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশে। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্লচাকী সেই আত্মোৎসর্গকারী দলের অগ্রযাত্রী। শত সহস্র শহীদের রক্তে লাল হল বাংলার সবুজ

প্রান্তর। দুঃখ অভিসারে সেদিনই বাংলার যাত্রা। গঙ্গা থেকে বুড়িগঙ্গা, ময়ূরাক্ষী থেকে শীতলক্ষ্যা সর্বত্র স্রোতস্বিনীর জল রঞ্জিত হয়ে উঠল বাঙালীর তাজা রক্তে।

বঙ্গভঙ্গ দিয়েই এই শতাব্দীর স্বাধীনতা অন্দোলন নতুন মোড় নিয়েছিল ১৯০৫ সালে। ১৯১৯ সালে সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশের স্বাধিকার ঘোষণার মাধ্যমে বাঙালীর সংগ্রাম পেল নতুনতর সংকেত। একই কাহিনী, একই ইতিহাস। সেদিন সাম্রাজ্যবাদী কুচক্রীরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলাভাগ করেছিল, আজ তাদেরই উত্তর সাধকরা নতুন নামে নতুনতর পোশাকে অবির্ভূত হয়েছে বাংলাকে হাজার মাইল দূরবর্তী পাঞ্জাবী সিন্ধি ধনিক বণিকের উপনিবেশ করে রাখতে।

বিদ্রোহ বাঙালীর রক্তে মিশে আছে। কিন্তু ভাবপ্রবণতাই শুধু তার কারণ নয়। এর কারণ ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক। কার্জনী তর্জনগর্জন স্তব্ধ করে দিয়ে বঙ্গভঙ্গ রদ করেছিল সেদিনের বাঙালী। মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিরূপে মুজিবরের ডাকে যে ভাবে সুরু হয়েছিল সত্যাগ্রহ অসহযোগ এবং শোষকদের বয়কট আন্দোলন—১৯০৫ সালেই বাঙালীরা তা প্রথম সুরু করে। মুজিবর ইতিহাস থেকেই গ্রহণ করেছেন নজীর। দোর্দণ্ড প্রতাপ বৃটিশ রাজশক্তিকে সদিন কাঁপিয়ে দিয়েছিল জনগণের এই আন্দোলন। ছেষট্টি বছর পর আবার ইতিহাসেরই নির্দেশে পূর্ব বাংলায় ফিরে এল সেই আন্দোলন।

এ-আন্দোলন সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর স্বাধিকার রক্ষার আন্দোলন। শতাব্দীর গোড়াতে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে প্রথম বাঙালীরা দৃষ্টি আকর্যণ করেছিল সারাভারতের। গুপ্ত রাজনৈতিকদল গঠন, গণ সংগঠন ও সশস্ত্র আন্দোলনের হাতেখড়িও তখন থেকেই। বাঙালী বিদ্রোহীর জাতি, বোমাকাল্টে বিশ্বাসী —এ ধারণাও বৃটিশ রাজশক্তির তখন থেকেই বদ্ধমূল হয়।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন থেকেই ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসী বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রেরণা পায়। যেমন আজ পূর্ববাংলার আন্দোলন পাকিস্তানের পশ্চিম প্রান্তের অনেক গণতান্ত্রিক মানুষকেও নতুন চিন্তায় উদ্‌বুদ্ধ করেছে। যত সহজ ভেবেছিলেন কার্জন বঙ্গভঙ্গ কাজটি তত সহজ হতে দেয়নি বাঙালীরা। যত সহজে ভেবেছিলেন পূর্ববাংলার মানুষকে দমন করে রাখতে পারবেন পাকিস্তানের শাসকরা কাজটি তত সহজ হল না। ১৯০৫ থেকে ১৯১৯ অনেক দূরের পথ। কিন্তু পথ একটাই।

১৯১১ সালে কার্জনী বঙ্গভঙ্গ রদ হল। ১৯২২ সালে পাকিস্থানী গ্রাস থেকে পুবের বাঙালী মুক্ত হবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। কারণ, এতো শুধু একটা প্রাদেশিক অধিকার বা চাকুরী বণ্টনের জন্য মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের আন্দোলন নয়। এ আন্দোলনের শিকড় অনেক গভীরে, পূর্ববাংলার গ্রামে গ্রামে তার বিস্তার। জনমনের কাছে তার আত্মীয়তা।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সম্পর্কে সেদিন বৃটিশ আমলাতন্ত্রের স্বীকারোক্তি "With them (i.e. the people of other provinces) the partition was the occasion rather than the cause of a movement which both antibritish and revolutionary in character."
অর্থাৎ ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসীদের কাছে এই বিভাগ ছিল একটি বৃটিশ বিরোধী এবং বৈপ্লবিক আন্দোলনের উপলক্ষ্য। পূর্ববাংলার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করাও বর্তমান আন্দোলনের উপলক্ষ্য। এটিই একমাত্র কারণ নয়। ১৯২২ সালের মার্চ মাসের পূর্ববাংলার স্বাধিকার সংগ্রামের ইতিহাস জানতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে পেছন দিকে। সে ইতিহাস বঞ্চনার ও শোষণের। সে ইতিহাসের পথ শহীদের রক্তে রঞ্জিত।

বিচ্ছেদের প্রস্তুতি

॥ ৩ ॥

সারে জাহাসে আচ্ছা হিন্দুস্তান হামারা
ময় বুলবুলি হ্যায় উস্‌কি উহ্‌ গুলিস্তাঁ হামারা।

মুহম্মদ ইকবাল।

মুজিব বলেছেন, 'যারা বল-প্রয়োগের ষড়যন্ত্র করছে আমাদের জনগণ তাদের রুখবেই। বাংলা দেশের স্বাধীনতা অপ্রতিরোধ্য। আমরা ব্যর্থ হব না। আমাদের আগামীদিনের সন্তানেরা যাতে স্বাধীনতার মুক্ত আলোতে বাস করতে পারে, প্রয়োজন হলে সেজন্য আমরা প্রতিটি মানুষ মৃত্যু বরণ করব। স্বাধীন দেশে স্বাধীন নাগরিকের মর্যাদা নিয়ে আমরা বাঁচতে চাই।'

এই কথাগুলো উচ্চারিত হয়েছে ঢাকায়, রমনা ময়দানে ১৯২২ সালের মার্চের এক তপ্ত মধ্যাহ্নে লাখো লাখো মানুষের সমাবেশে। জনতা জয়ধ্বনি দিয়ে বলেছে, জয় বাংলা, আমরা প্রস্তুত। অথচ মাত্র ২৩ বছরের ব্যবধান। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পূর্ব বাংলা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ভারত থেকে মুসলিমদের স্বাধিকার স্বীকৃতির দাবি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর।

আমরা একটু পেছন ফিরে তাকাই এবার। কীভাবে বাংলার সোনার অঙ্গ দ্বিতীয়বার ছেদ হল ১৯৪৭ সালে। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হবার পর ১৯৪৭ সালে কেন আবার বঙ্গচ্ছেদ? আমরা ওপরে উদ্ধৃতি দিয়েছি মুহম্মদ ইকবালের একটি বিখ্যাত গানের প্রথম দুটি কলি। এই গানে তিনি ভারতকে বলেছেন জগতের সকল দেশের

সেরা। 'ভারত উদ্যানের তিনি বুলবুলি। সত্যিই তিনি তা ছিলেন। তিনিই কিন্তু সর্বপ্রথম একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করেন।

১৯৩০ সাল। সারা ভারতে তখন চলছে গান্ধীজীর নেতৃত্বে আইন অমান্য ও অসহযোগ আন্দোলন। পূর্ব বাংলায় মুজিবরের আহ্বানে যে-আন্দোলন দুর্বার তিরিশে গোটা ভারতে চলেছিল সেই একই আন্দোলন বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীতে। তার আগেই ১৯২৭-সালে কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে জওহরলাল নেহরুর উদ্যোগে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পাশ হয়েছে। কংগ্রেসের সঙ্গে মুসলিম লীগের মতের বা পথের মিল ছিল না। কিন্তু মুসলিম জনমানসে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু শাসনের ভীতি ছিলই। মুহম্মদ ইকবাল বললেন, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বালুচিস্তান, সিন্ধু এবং কাশ্মীর নিয়ে ভারতীয় ফেডারেশনের মধ্যেই গঠন করা হক একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ। এই হল ভিন্ন রাষ্ট্রের অংকুর। কবির কল্পনায় যা ছিল রোমান্টিক স্বপ্ন তাই ১৯৩৩ সালে ক্যামব্রিজের বাঙালী ছাত্র চৌধুরী রহমত আলির চিন্তায় আরও সুস্পষ্ট রূপ নিল।

রহমত আলিই একটি কল্পিত রাষ্ট্রের নাম দিলেন—পাকিস্তান। ইংরেজি বানানে এই অক্ষরগুলো এসেছে কয়েকটি রাজ্যের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী। পাঞ্জাবের P, আফগানদের A, কাশ্মীরের K এবং সিন্ধুর S এই অক্ষরগুলোর সঙ্গে Stan কথাটি যোগ করে হল Pakistan অর্থাৎ পবিত্রভূমি। ক্যামব্রিজের স্বপ্নবিলাসী ছাত্রের এই কল্পনা কোনদিন যে বাস্তবে রূপ নেবে তা কেউই কল্পনা করেনি। কারো নজরও পড়েনি সেদিকে।

দৃষ্টি পড়ল তীক্ষ্ণধী নেতা মহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌র। কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর বিরোধ তখন চরমে। তাঁর হাতে পড়ল রহমত আলির লেখা একটি বই : The Millat of Islam and the Menace of Indianism. ১৯৪০ সাল। এই বইয়ে রহমত আলি তাঁর

পাকিস্তানের পরিকল্পনা আরও বিস্তারিত করে লেখেন। তিনি চাইলেন তিনটি মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্র—পশ্চিমপাকিস্তান (পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও কাশ্মীর), বাংলাস্তান (পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ) এবং ওসমানিস্তান (হায়দরাবাদ)। ইকবাল চেয়েছিলেন ভারতের অভ্যন্তরে মুসলিম রাজ্য। অন্যরা চাইলেন, ভারত থেকে বিছিন্ন হয়ে যেতে। মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ দ্বিতীয় পন্থায় বিশ্বাসী।

এর আগে জিন্নাহ্র ছিল চৌদ্দ দফা দাবি। কংগ্রেস যখন স্বাধীনতার আন্দোলন করছে, তখন জিন্নাহ্ মুসলিমদের স্বার্থ নিয়ে ১৯৩০ সালে লণ্ডনের গোলটেবিল বৈঠকে পেশ করলেন এই চৌদ্দ দফা দাবি। ভারত স্বাধীন হলে সেই রাষ্ট্রের চেহারা কী রকম হবে? জিন্নাহ্ বললেন তার প্রথম ও দ্বিতীয় দফার দাবিতে, ভারত হবে একটি ফেডারেল রাষ্ট্র; কেন্দ্রীয় ক্ষমতা ছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত ক্ষমতা থাকবে প্রদেশগুলোর হাতে এবং সকল প্রদেশের সমান স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার থাকবে।

পূর্ববাংলার জননেতা শেখ মুজিব রহমান তো এই দাবিই করছেন। তবু এই দাবির কথা শুনেই পশ্চিম পাকিস্তানীরা এখন আঁৎকে উঠছেন কেন?

তৃতীয় পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম দফায় জিন্নাহ্ যুক্তি দিলেন মুসলিমদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার। এই নির্বাচন ব্যবস্থার পরিবর্তন বা সংশোধন করতে হলে মুসলিমদের সম্মতি নিতে হবে। মুসলিমদের অধিকার সংরক্ষণের গ্যারান্টি দিতে হবে ভবিষ্যৎ সংবিধানে।

জিন্নাহর্ উত্তর সাধকরা কিন্তু পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের কোনো সাংবিধানিক গ্যারান্টি রাখেননি। পাকিস্তানকে ঘোষণা করেছে ইসলামিক রিপাবলিক। এবং জনগণের গনতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে গত তেইশ বছর ধরে চালিয়ে গেছে সামরিক একনায়কতন্ত্রের আড়ালে পশ্চিম পাকিস্তানী ধনিক বণিকদের শোষণরাজ। অষ্টম

দফার দাবি ছিল, সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন সমাধান করতে হলে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের তিন চতুর্থাংশের সম্মতিসূচক ভোট লাগবে।

চতুর্থ ও ত্রয়োদশ দফায় তিনি চাইলেন, কেন্দ্রীয় সরকারে কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ মন্ত্রীর আসন সংরক্ষিত রাখতে হবে মুসলিমদের জন্য। এবং কেন্দ্র বা রাজ্য কোনো সরকারই অন্তত এক তৃতীয়াংশ মুসলিম সদস্য ছাড়া গঠিত হবে না। নবম দফায় দাবি ছিল, বোম্বাই প্রেসিডেন্সি থেকে সিন্ধুপ্রদেশকে আলাদা করে দেওয়া। এই দাবি স্বাধীনতা লাভের আগেই স্বীকৃত হয়েছিল। দশম দাবি: উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বালুবিস্তানে আইন সভা গঠন। এগারো দফায় দাবি ছিল, সমস্ত চাকুরিতে অন্যান্য ভারতীয়দের সঙ্গে মুসলিমদের উপযুক্ত অংশ।

দ্বাদশতম দাবি: সমস্ত জাতীয় ভাষার বিকাশ ও ধর্মের স্বাধীনতা। কিন্তু সবচেয়ে মোক্ষম দাবি হল, ভবিষ্যতে সংবিধান সংশোধন করতে হলে সমস্ত অঙ্গরাজ্যের সম্মতি চাই। এবং উপরোক্ত দাবিগুলোর সঙ্গে সঙ্গতি না থাকলে কোন সংবিধানই মুসলিম সম্প্রদায়ের পক্ষে গ্রহণ যোগ্য হবে না।

দেশভাগ হবার পর আজ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিচার করে দেখলে মনে হবে, জিন্নার চৌদ্দ দফা দাবির ভাষা কঠোর হলেও তার সবগুলোই অযৌক্তিক ছিল না। ভারতের ঐক্যের স্বার্থে তাঁর সঙ্গে কতকগুলো শর্তে হয়তো বা বোঝাপড়া করা যেত। কিন্তু কংগ্রেস নেতারা এ বিষয়ে কোন কথা বলতেই রাজী হলেন না। জিন্নাহ্ও চৌদ্দ দফায় রইলেন অনড়। ব্যবধান বাড়তে লাগল। এই দাবির ভিত্তিতে জিন্নাহ্র নেতৃত্বও মুসলিম সমাজের মধ্যে ক্রমশ অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠল। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মুসলিম শ্রেণী এই চৌদ্দ দফায় নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি পেল। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন, জাতীয় ভাষাসমূহের বিকাশ, সিন্ধু প্রদেশের স্বীকৃতির দাবি এর আগে অন্যান্য মুসলিম সংস্থাগুলোও করেছিল। জিন্নাহ্র নেতৃত্বে মুসলিমলীগ

মুসলীম সম্প্রদায়ের মুখ্য প্রবক্তা হয়ে উঠল। কংগ্রেসের অনুগামী মুসলিম সদস্যরা ১৯৩১ সালে লখনৌ সম্মেলনে মিলিত হয়ে জিন্নাহ্‌র চৌদ্দ দফার অধিকাংশ দাবিরই বিরোধিতা করেন। কিন্তু তারা পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা তুলে দিয়ে সার্বজনীন ভোটাধিকার দাবি জানান। জাতীয় ভাষাসমূহের বিকাশ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সমূহের জন্য নিরাপত্তার গ্যারান্টিও তারা চান।

কিন্তু জিন্নাহ্‌র প্রভাব ও মুসলিম সমাজে তার জনপ্রিয়তা বেড়েই চলল। মুসলিম বুর্জোয়ারা দেখলেন এই তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের সুযোগ। ১৯৩০ সাল পর্যন্ত মুসলিম লীগ ছিল ওপরতলার মুসলিমদের সংগঠন। মধ্যবিত্তশ্রেণীর মুসলিমদের একটা বড় অংশ ছিল কংগ্রেসেরই সঙ্গে। বুদ্ধিজীবি ও শ্রমজীবী মুসলিমদের একটা অংশ কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে ছিলেন যুক্ত। কিন্তু কৃষক সমাজে বামপন্থী রাজনীতির প্রভাব ছিল দুর্বল।

বৃটিশরা এর সুযোগ নিল। তাদের নীতিই ছিল' ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল'। জিন্নাহ্‌র চৌদ্দ দফাকে তারা কাজে লাগাল হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের বনিয়াদকে ধ্বংস করার জন্য। ১৯৩০ সালের পর থেকে জিন্নাহ্‌ তাঁর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে তুললেন মুসলিম সমাজে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা দেখলেন যে এই বিরোধ যত জীইয়ে রাখা যায় ভারতে তাদের শোষন ও শাসন ততই দীর্ঘস্থায়ী হবার সম্ভাবনা। এই হল বৃটিশ ঔপনিবেশিকদের চতুর ও চিরাচরিতনীতি।

হিন্দু ও মুসলিম সাধারণ মানুষের মধ্যে ঐক্যের কোনো অভাব ছিল না। ভারতের বৃটিশ বিরোধী মুক্তিসংগ্রামে বহু মুসলিম আত্মদান করেছেন। বাংলাদেশে গণআন্দোলনের যে-ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছিল স্বদেশী যুগ থেকে তার প্রভাবে উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ও সাধারণ মানুষই ছিলেন উদ্‌বুদ্ধ। তাই আমরা দেখি বাংলাদেশে মুসলিম লীগের প্রতিপত্তি ছিল কম। এখানে মুসলিম জনতার অবিসম্বাদী নেতা ছিলেন

ফজলুল হক। মধ্যবিত্ত কৃষকদের প্রতিনিধিরূপে তিনি বাংলার এক জনপ্রিয় নেতা রূপেই স্মরণীয়। তাঁর কৃষক প্রজা পার্টির আবেদন মুসলিম সমাজে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি কংগ্রেসের কাছে আবেদন করেছিলেন কোয়ালিশন সরকার গঠন করে মুসলিম লীগের বিভেদপন্থী ভ্রান্তনীতিকে পরাস্ত করতে।

বাংলাদেশের এই বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতারা কোনদিনই যাচাই করে দেখেননি। নিজেরা একক সংখ্যাগরিষ্ঠ নাহলে কোথাও মন্ত্রিসভা গঠন করবনা-এই নীতি অনুযায়ী কংগ্রেস বাংলাদেশে ফজলুল হকের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠন করলেন না ১৯৩৭ সালে। যদিও আসামে এবং সিন্ধু প্রদেশে কোয়ালিশনে শেষ পর্যন্ত সম্মতি দিয়েছিল কংগ্রেস।

বাংলার সমস্যার প্রতি সর্বভারতীয় কংগ্রেসের এই উপেক্ষা এবং রাজনৈতিক অপরিণামদর্শিতা এই দেশের মানুষের অশেষ দুঃখের কারণ হয়েছে। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস ছটি প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও মুসলিম আসনে তাদের ব্যর্থতাই প্রমাণ করে দিল যে মুসলিম সমাজকে প্রতিনিধিত্ব করার দাবি ধোপে টেঁকেনা। একমাত্র ব্যতিক্রম উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। খান আবদুল গফ্ফর খাঁর অসাধারণ জনপ্রিয়তায় সেখানে কংগ্রেস ১৫টি মুসলিম আসন দখল করতে পেরেছিল।

বাংলাদেশে ফজলুল হকের তখন জয়জয়কার। ১১৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে মাত্র ৪০টি এখানে মুসলিম লীগ পেয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের একটার পর একটা ভুল পরোক্ষ সাহায্য দিতে লাগল জিন্নাহ্‌কে। একথা আজ আর অস্বীকার করে লাভ নেই যে কংগ্রেস আন্দোলনের ধরণ-ধারণে হিন্দু চিন্তাভাবনার প্রভাব ছিল বেশি। মুসলিম জনতাকে তা কাছে টানতে সাহায্য করেনি। স্বদেশীযুগে লোকমান্য তিলক, অরবিন্দ ঘোষ হিন্দু পুনরুজ্জীবনেরই স্বপ্ন দেখতেন। শিবাজী-উৎসব প্রর্বতনে তার ইঙ্গিত স্পষ্ট।

১৯৩৭ সালে যে-সমস্ত প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করেছিল সেখানেও মুসলিম লীগকে তারা কোনো পাত্তা দিল না। উত্তরপ্রদেশে মুসলিম লীগ মুসলিম আসনের প্রায় অর্ধেক লাভ করলেও, কংগ্রেস মন্ত্রিসভা তাদের সঙ্গে কোনোরূপ আলাপ-আলোচনাতেই গেল না। উত্তর প্রদেশই ছিল মুসলিম বুর্জোয়া শ্রেণীর শক্ত ঘাঁটি। উর্দু তাদের ভাষা। এবং উর্দুর সাহিত্যকর্ম হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েরই প্রিয়। কিন্তু কংগ্রেস মন্ত্রিসভা উর্দুকে কোনোরূপ স্বীকৃতি দিল না। তারা হিন্দী চাপিয়ে দিল মুসলমানদের ওপরে। স্কুলে হিন্দী পড়া আবশ্যিক করা হল। উর্দু, আরবী বা পারসিক সাহিত্য পড়ার কোনো সুযোগ তারা রাখলেন না। এতে মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের ক্ষোভ বাড়ল। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা ভারতের ক্ষমতা পেলে মুসলিম সংস্কৃতি বিপন্ন হবে বলে তারা আশংকা করলেন।

জিন্নাহ্ এই সুযোগ নিলেন। কংগ্রেস যে প্রধানত হিন্দু প্রতিষ্ঠান এই প্রচার তিনি চালালেন। আবদুল গফফর খাঁ, মৌলানা আজাদের মতো বিশিষ্ট মুসলিম নেতারা কংগ্রেসের সঙ্গে থাকলেও মুসলিমদের মধ্যে জিন্নাহের প্রভাবই বাড়তে লাগল। তিনি খাড়া করলেন দ্বিজাতি তত্ত্ব বা টুনেশন থিওরি। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এই সুযোগই খুঁজছিলেন। কংগ্রেস যাতে একা ক্ষমতা পেতে না পারে, ভারতের স্বাধীনতা যাতে বিলম্বিত হয়, এই উদ্দেশ্য নিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা জিন্নাহর টুনেশন থিওরিকে পরম উৎসাহে সমর্থন জানাতে লাগল।

১৯৪০ সাল। লাহোরে মুসলিম লীগের অধিবেশনে মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ সর্বপ্রথম পাকিস্তান দাবি পেশ করলেন। জিন্নাহ্ বললেন Indian Muslims are not a religious Community, but a nation inhabiting a compact territory in the North West and East of the country, and therefore possessing the right of self determination.

অর্থাৎ ভারতীয় মুসলিমরা একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় নয় দেশের উত্তর

পশ্চিমে এবং পূর্বে একটি সন্নিহিত অঞ্চলে বসবাসকারী জাতি এবং সেইহেতু আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারী।

আজ মুজিবরও তো সেই কথাই বলেছেন। পূর্ববাংলার অধিবাসীরা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারী। জিন্নাহ্‌র উক্তিতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। লাহার অধিবেশনে ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তানের প্রস্তাবেও বলা হয়েছে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ প্রতিষ্ঠার কথা—একটি পাকিস্তান রাষ্ট্রের কথা নয়।

প্রস্তাবের বয়ানে পাকিস্থানের ভৌগোলিক সীমা নির্দিষ্ট করে বলা হয় "The areas in which Muslims are numerically majority, as in the North western and Eastern zones of India, should be grouped to constitute Independent States, in which, the constituent units shall be antonomous and sovereigin.

অর্থাৎ যে সমস্ত এলাকায় মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ যেমন ভারতের উত্তর পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চলে সেগুলোকে স্বাধীন রাষ্ট্র সমূহে সংগঠিত করতে হবে যেখানে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলো হবে স্বায়ত্তশাসিত এবং সার্বভৌম।

লাহোরে পাকিস্তান প্রস্তাবের উত্থাপক ছিলেন ফজলুল হক। শের-ই-বাঙ্গাল বলে তখনকার দিনে মুসলিমরা যাঁকে জানতেন। এই ফজলুল হকই যখন ১৯৫৪ সালে লাহোর প্রস্তাবের উল্লেখ করে পূর্ব বাংলার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবি তুললেন তখন তাঁকে পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাবি তল্পিবাহক সরকার বললেন—ট্রেটর ট্ পকিস্তান পাকিস্তানের প্রতি বিশ্বাস.ঘাতক।

জিন্নাহ্‌র রাজনৈতিক দৃঢ়তা ছিল অসাধারণ। গান্ধী, নেহরু, আজাদ, বল্লভ ভাইয়ের মতো বাঘা বাঘা নেতার সঙ্গে তিনি একাই লড়লেন তাঁর দাবি নিয়ে। ১৯৪০ সালে যে দাবি ছিল নিতান্ত হাস্যকর ও উদ্ভট, ১৯৪৭ সালের মধ্যেই তা বাস্তবে রূপ নিল এক ভয়াবহ রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে। ১৯৩৭ সালেও জিন্নাহ্‌র

মুসলিম লীগের সাংগঠনিক শক্তি কংগ্রেসের তুলনায় ছিল নগন্য। জওহরলাল নেহরু তো বলেই ছিলেন, দেশে এখন মাত্র দুটি পক্ষ —কংগ্রেস ও বৃটিশ সরকার। তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ মুসলিম লীগকে তিনি পাত্তাই দিলেন না। জিন্নাহ্ এই অপমান ভুলতে পারেননি। নেহরুর সঙ্গে, সে কারণেই, কোনদিনই জিন্নাহ্র ন্যূনতম মনের মিল হল না। নেহরুর সঙ্গে জিন্নাহর দেখা হলে তিনি শুধু চৌদ্দ দফা দাবিই তুললেন না কংগ্রেসের ত্রিবর্ণ পতাকা ও বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত সম্পর্কেও তুললেন প্রবল আপত্তি। কংগ্রেস পরে বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত থেকে দুর্গা প্রতিমা বন্দনার অংশটি বাদ দিয়ে দেয়। কিন্তু তাতে মুসলিম লীগও খুশি হল না, কংগ্রেসের ভেতরে রক্ষণশীল হিন্দুরাও না।

এদিকে মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা মুসলিম সমাজের মধ্যে বাড়তে লাগল স্বাভাবিক কারণেই। লীগের ইংরেজি মুখপত্র 'ডন' অন্যান্য সাময়িক পত্র, পাঠ্য বই এবং আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা মারফৎ পাকিস্তানের দাবি ও জিন্নাহ্ প্রবর্তিত "দ্বিজাতি তত্ব" ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও প্রচারে সহায়তা করতে লাগল। মোল্লা, উলেমারা এতে জোগাতে লাগল ধর্মীয় ইন্ধন। কিন্তু শুধু ধর্মোন্মত্ততাই সবটা ছিল না। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবির পেছনে একটি অর্থনৈতিক কারণও কাজ করছিল। মুসলিম বুর্জোয়াদের কাছে একটি আলাদা মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অর্থ হল বৃহৎ হিন্দু শিল্পপতিদের প্রতিযোগিতা থেকে মুক্ত হওয়া।

অবিভক্ত ভারতে শিল্প ব্যবসায়ে মুসলিমরা নিশ্চিতই হিন্দু ব্যবসায়ীদের অনেক পেছনে ছিল। তারা দেখল এই তো সুযোগ। চাকরী বাকরী ব্যবসায়ী সব কিছুতেই একটি অসম প্রতিযোগিতার হাত থেকে পাওয়া যাবে অব্যাহতি।

বাংলাদেশে মুসলিম নবাব ধনিকরাও পাকিস্তান সৃষ্টির মধ্যে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ খুঁজে পেলেন স্বাভাবিকভাবেই। পূর্ব

বাংলার দরিদ্র মুসলিম কৃষক সমাজ হিন্দু জমিদার সুদখোর মহাজনদের দ্বারা আজন্ম শোষিত। তারাও পাকিস্তান প্রস্তাবের সমর্থনে এসে দাঁড়াল প্রধানত অর্থনীতিক কারণে। এর আগে ফজলুল হক যখন কৃষকদের ঋণ-মকুবের জন্য আইন পাশ করিয়েছিলেন তখন কংগ্রেসের জমিদার সদস্যরা এই আইনের বিরোধিতা করেছিলেন। কারণ এতে নাকি হিন্দুদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হবে। হিন্দু-মুসলিম বিরোধের অর্থনীতিক কারণ দূর করতেও কংগ্রেস নেতারা সেদিন চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

ভারতের হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতি—জিন্নাহ্‌র এই তত্ত্ব ইতিহাস প্রমাণ করে না। তিনি এই তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছিলেন রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে পাবার জন্য। মুসলিম লীগ চেয়েছিল একটি শিথিল ভারতীয় ফেডারেশন যাতে অঙ্গরাজ্যগুলো হবে স্বায়ত্তশাসিত। কংগ্রেস চেয়েছিল একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার, অঙ্গরাজ্যগুলোর ওপর খবরদারির জন্য। পাকিস্তান সৃষ্টির পর জিন্নাহ্, কিন্তু নিজের দেশে শিথিল ফেডারেশনে বিশ্বাসী হলেন না। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে শক্ত নিগড়ে বাঁধলেন। বিভক্ত ভারতে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু এখন ভারতের রাজ্যগুলোও কি অধিকতর ক্ষমতা নিজেদের হাতে চাইছে না? তামিল নাড়ুতে উগ্রপ্রাদেশিকতাপন্থী দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাগম কংগ্রেসকে অপসারিত করেছে। বিভক্ত পাঞ্জাবে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে পাঞ্জাবী শিখদের সাম্প্রদায়িক অকালী দল। নাগাল্যাণ্ডকে দাবিয়ে রাখতে দীর্ঘ ১৫ বছর দিল্লী থেকে পাঠাতে হয়েছে ফৌজ। বিভিন্ন রাজ্যে প্রাদেশিক 'সেনাদল' বা বেসরকারী জঙ্গী বাহিনী গড়ে উঠেছে যাদের প্রতিপত্তির মূলে রয়েছে কেন্দ্র বিরোধী মনোভাব।

আজ তাই মনে হয়, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যগুলোর প্রাদেশিক আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার মেনে নিলে সম্ভবত দেশভাগ রোধ করা যেত। যে-দাবি নিয়ে সীমান্ত গান্ধী আবদুল গফ্ফর খান আজীবন সংগ্রাম

করেছেন। পূর্ববাংলায় মুজিবরের নেতৃত্বে সেই আন্দোলনই আজ সোচ্চার। গফফর খাঁকে পাকিস্থানী শাসকরা কোনোদিন শান্তি দেয়নি। তিনি আজ নির্বাসিতের জীবন যাপন করছেন আফগানিস্তানে। ইতিহাসের এমনই পরিহাস যে পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া খানকে দুই পাকিস্তানের সংহতি রক্ষার জন্য সাহায্য নিতে হয়েছে গফ্‌ফর খাঁর পুত্র উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা খান ওয়ালী খানের। অথচ ইয়াহিয়ার পূর্ববর্তী প্রত্যেক পাকিস্তানী প্রেসিডেণ্ট গফফর খাঁকে আখ্যা দিয়েছিল দেশদ্রোহী, পাকিস্তান রাষ্ট্রের শত্রু।

পাকিস্তান প্রস্তাবের প্রতি প্রবল সমর্থন এল মুসলিম বুর্জোয়াশ্রেণীর কাছ থেকে। উত্তর প্রদেশ তখনকার দিনে যুক্ত প্রদেশ নামে পরিচিত, ছিল ধনিক-বণিক শিক্ষিত মুসলিমদের জায়গা। ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস মন্ত্রিসভার আমলে উত্তর প্রদেশে মুসলিম জবান উর্দু'র উপেক্ষা তাদের তাতিয়ে তুলেছিল। তারা দেখলেন যে, পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র না হলে মুসলিম বুর্জোয়াদের আশা আকাঙ্খা পূরণের কোনো সুযোগ তারা পাবেন না। যদিও এটা নিশ্চিতই ছিল যে পাকিস্তান হলেও উত্তর প্রদেশ কোনো সময়েই সেই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হবে না। সবচেয়ে বেশি উৎসাহিত হল পাঞ্জাবের মুসলিমরা। হিন্দু ও শিখ বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে মুক্ত হয়ে তারা স্বপ্ন দেখল নতুন এক রাষ্ট্রের যেখানকার ক্ষমতা স্বাভাবিকভাবেই হবে তাদের করায়ত্ত। পাঞ্জাবের মুসলিম জমিদাররা দেখলেন তাদের শিল্প-বাণিজ্য, ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় প্রসারের সুযোগ। মুসলিম আমলারা দেখলেন মন্ত্রিত্বের স্বপ্ন। তাই তাঁরা সোৎসাহে জিন্নাহ্‌'র পিছনে এসে দাঁড়ালেন। যদিও পাঞ্জাবের মন্ত্রিত্বের ক্ষমতায় ছিলেন লীগ বিরোধী ইউনিয়নিষ্ট পার্টির জমিদার নেতা মালিক খিজির হায়াৎ খান।

দেশবিভাগ যদি ধর্মের ভিত্তিতে হয় তাহলে তার প্রতিক্রিয়া যে কী সাংঘাতিক হবে পাঞ্জাবের গণতান্ত্রিক নেতারা তা যথাসময়ে প্রকাশ

করতে ব্যর্থ হলেন। সেই সুযোগে মুসলিম লীগ পাঞ্জাবের রাজনীতিতে তার ডানা বিস্তার করল (১৯৪৩-৪৬)। লীগ এই কাজে সাহায্য নিল ফ্যাসিপন্থী খাকসার বাহিনীর। খাকসার বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা ইনায়তুল্লা খান মাশরিকী। ১৯৩১ সালে তিনি এই ফ্যাসিপন্থী মুসলিম আধা মিলিটারি বাহিনী তৈরী করেন মুসলিমদের অধিকার রক্ষার সংকল্প নিয়ে। সদস্যরা ছিল নিম্ন শ্রেণীর মানুষ যাদের বলা যায় লুম্পেন প্রলিতারিয়েত। পেশোয়ার লাহোর এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অন্যান্য শহরেই ছিল এদের প্রতিপত্তি! মুসলিম লীগ দেখল যে পাকিস্তান দাবি আদায় করতে হলে চাই জঙ্গীপনা। খাকসার বাহিনী সেই সুযোগ এনে দিল জিন্নাহ্‌র হাতে।

বাংলাদেশে মুসলীম লীগ পা রাখবার জায়গা পেল যখন কংগ্রেসের কাছে আবেদন নিবেদনে ব্যর্থ হয়ে ফজ ক হকের কৃষক প্রজা পার্টি মুসলিম লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন করতে বাধ্য হলেন। জোতদার, জমিদার শ্রেণীর মুসলমানরা লীগের পতাকা তলে নিলেন আশ্রয়। পূর্ব বাংলায় কৃষক সমাজ ছিল মুখ্যতঃ মুসলমান—দরিদ্র, নিঃস্ব, ঋণভার পীড়িত। আর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে সেখান কার বৃহৎ জমিদার গোষ্ঠীর অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু। পূর্ব বাংলার কৃষক আন্দোলনকে মুসলীম লীগ সাম্প্রদায়িকতার দিকে নিয়ে যেতে পেরেছিল এই কারণেই ১৯৩৭ সালের নির্বাচনী ইস্তাহারে কৃষক প্রজা পার্টি এবং ১৯৪৫ সালের নির্বাচনে মুসলীম লীগ এই প্রচারই করেছিল যে, জমিদারী ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের জন্য তারা যে আইন আনছেন তা একমাত্র পাকিস্তান সৃষ্টি হলেই সম্ভব হবে এবং তার দ্বারাই দরিদ্র, শোষিত মুসলিম কৃষক পাবে মুক্তি। জনসাধারণ সহজেই বিভ্রান্ত হয়। বাংলার শোষিত কৃষক সমাজ যাদের অধিকাংশই ছিল ধর্মসূত্রে মুসলিম, তারা মুসলিম লীগের জমিদার নবাব পুঁজিপতি নেতাদের এই আশ্বাসে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। বাংলাদেশে যারা গণতান্ত্রিক আন্দোলন করতেন, কৃষক আন্দোলনের সহযাত্রী ছিলেন,

তারা এই ধর্মীয় রাজনৈতিক প্রচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারলেন না।

আরেক অভিশাপ ১৩৫০ সালের বাংলার মন্বন্তর। দ্বিতীয়বিশ্বযুদ্ধের রক্তাক্ত নখরাঘাতে ভারতের পূর্বসীমান্ত তখন বিপন্ন। জাপানী ফ্যাসিস্ত বাহিনী কবলিত করেছে সিঙ্গাপুর থেকে মান্দালয় পর্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ড। বৃটিশ সাম্রাজ্য যায় যায়। তারা যে কোনো সময়ে আশংকা করলেন বাংলা দেশের মাটিতে জাপানী বাহিনীর পদার্পণ। জাপানীদের হাতে যাতে কোনো রকম খাদ্যদ্রব্য না পড়ে, কোনোরূপ যান বাহন যাতে তারা না পায় সেজন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের তল্পিবাহক হয়ে বাংলার লীগ মন্ত্রিসভা অনুসরণ করতে লাগল 'ডিনায়েল পলিসি'। বাংলার সমস্ত চাউল উধাও হয়ে গেল। পূর্ববাংলার নদীমাতৃক দেশে কৃষক, মাঝি, মাল্লাদের একমাত্র পরিবহন নৌকা চলাচল বন্ধ করে দিল লীগ সরকার। একজায়গার খাদ্য অন্য জায়গায় যেতে পারল না। এই সুযোগে মুনাফাখোররা, যাদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই ছিল, মানুষের রক্তে ব্যবসা করতে লাগল চুটিয়ে।

বাংলা শ্মশান হয়ে গেল। সরকারী হিসাবে স্বীকৃতি ছিল পনেরো লক্ষ মৃত্যুর। বেসরকারী হিসাবে এই মৃত্যুর সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ লক্ষ। 'মানুষের সৎভাই চায় শুধু ফ্যান।' কিন্তু সেই ফ্যানও হল দুষ্প্রাপ্য। কলকাতা, ঢাকার পথে পথে হাজার হাজার মানুষ একটু ফ্যান দাও, ফ্যান দাও বলে নিঃশেষে প্রাণ দিল। কংগ্রেস নেতারা তখন কারাগারের অন্তরালে। কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা ও অন্যান্য সেবাব্রতীরা এই দুঃস্থ আর্ত মানবতার জন্য সেবাকর্মে আত্মনিয়োগ করলেন। কিন্তু তাদের তখন কতটুকুই বা ক্ষমতা, কতটুকুই বা পার্টি সংগঠন।

মুসলীম লীগের নেতারা বলে বেড়াতে লাগলেন, এই দুর্ভিক্ষ মানুষের তৈরি এবং সে মানুষ হল হিন্দু মুনাফাবাজ ও কালোবাজারীরা।

কথাটা আংশিক সত্য। মুনাফাবাজ ও কালোবাজারীর মধ্যে হিন্দু নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু মুসলমানেরাও ছিল। মরেছে শুধু মুসলমান নয়, হিন্দুও। এবং এ সত্যও তারা প্রকাশ করেন নি যে শোষক শ্রেণীর কোনো জাতিবিচার নেই, ধর্ম নেই। তারা আলাদা জাত। শোষণই তাদের ধর্ম। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এই কথাগুলো তখনও স্পষ্ট করে বলা হয়নি। দেশ পরাধীন। বন্ধন মুক্তির সংগ্রামই তখন সকলের লক্ষ্য। স্বাধীনতা আগে, তারপর অন্য সব কিছু বিচার। মুসলিম লীগ নেতারাও দিলেন একই দাওয়াই, পাকিস্তান হাসিল করো, তারপর তোমাদের সব দুঃখ দূর করব।

১৯৪০ সালে যা ছিল শুধুমাত্র প্রস্তাব, যুদ্ধের বছরগুলোতে তাই হয়ে উঠল এক প্রত্যক্ষ আন্দোলন। কংগ্রেস নেতারা এই আন্দোলনকে গণমুখী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পরিণত করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। যদিও দেশে হিন্দু মুসলিম জনসাধারণের ঐক্য ছিল অটুট। ১৯৪২ সালের ভারতছাড়ো আন্দোলনে হিন্দু-মুসলিম সহযোগিতা ছিল। কিন্তু যুদ্ধের বছরগুলোতেই জিন্নাহ্ তাঁর দলের শক্তি ও প্রতিপত্তি বাড়াবার সুযোগ পেলেন সবচেয়ে বেশি। কংগ্রেস তখন নিষিদ্ধ, তাঁর নেতা ও কর্মীরা কারান্তরালে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এই সুযোগে লীগের সাম্প্রদায়িকতাকে জোরদার করে তুলতে সাহায্য করল। তাদের আশা ছিল যে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে এই বিভেদ জীইয়ে রাখতে পারলে ভারতবর্ষের ওপর তাদের উপনিবেশিক দখলদারী থাকবে অটুট। কংগ্রেসের অবর্তমানে এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অনুপস্থিতিতে যুদ্ধের বছরগুলোতেই জিন্নাহ্-র মুসলিম লীগ একটি গণপার্টিতে রূপান্তরিত হবার সুযোগ পেল মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে।

বাংলাদেশে তখন মুসলিম লীগ সরকার। অক্সফোর্ড শিক্ষিত বাঙালী হুসেন শহিদ সুরাওয়ার্দি'র নেতৃত্বে এই সরকার বাংলাদেশে পাকিস্তান সৃষ্টির জমি প্রস্তুত করলেন। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য

আন্দোলনের সুন্দরতম মুহূর্তেই নেমে এল বিচ্ছেদের কালো যবনিকা। সারে জাঁহাসে আচ্ছা যে হিন্দুস্তান তার ভাগ্যবিধাতা নির্দিষ্ট করে দিলেন এক বিভক্ত ভারত এবং বিদীর্ণ বাংলার দুঃখকাতর ইতিহাস। সেই রক্তাক্ত ইতিহাসের নায়ক হল সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন। মুসলিম লীগ হল তার যন্ত্র মাত্র।

পাকিস্তানের জন্ম

॥ ৪ ॥

I consider vivisection of India to be a sin.

—*Gandhi*

দেশ ভাগকে যিনি পাপ বলে মনে করতেন তাঁর চোখের সামনেই বিভক্ত হয়েছিল দেশ। ইতিহাসের অনিবার্য গতি রোধ করার ক্ষমতা কার? গান্ধীজীর মতো ব্যক্তিকেও সেদিন ইতিহাসের রথচক্র পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল তার নির্দিষ্ট গতিপথে।

কী সে ইতিহাস? কী ভাবে তা সম্ভব হল? আজকের পূর্ব বাংলার গণ-অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে আমারা সেদিনের ইতিহাসের দিকে তাকাব। জিন্নাহ্‌র পাকিস্তান প্রস্তাব বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের খুব পছন্দ হল। ভারতের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী শক্তি যত বিভক্ত হয় সাম্রাজ্যবাদীদের ততোই লাভ। কিন্তু যখন এই প্রস্তাব সত্যি সত্যিই একটা আন্দোলনের রূপ নিল এবং জিন্নাহ্‌ও স্বাধীনতার দাবি তুললেন তখন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা পাল্টা নানারকম প্রস্তাব দিয়ে ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নটি বিলম্বিত করতে চাইল। যখনই কংগ্রেস ও লীগ কোনো প্রস্তাবে মীমাংসার কাছাকাছি আসত, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তখনি নানান ফন্দী ফিকির বার করে বলত, না এ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়।

যতই দিন যেতে লাগল, কংগ্রেসের একাংশ ভাবতে লাগল যে, জোর করে সম্ভবত ভারতের ঐক্য বজায় রাখা সম্ভব হবে না। এই বিষয়ে মাদ্রাজের রাজনীতিবিদ চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী হলেন

অগ্রণী। সেটা ১৯৪২ সাল। রাজাগোপালাচারি বললেন, ভারতের ঐক্য রক্ষার বিতর্কে জড়িয়ে জাতীয় সরকার গঠনের সুযোগ হারানো মোটেই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়। তার চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম অনিষ্টকর অর্থাৎ মুসলিম লীগের দেশ বিভাগের দাবি মেনে নেওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

রাজাগোপালাচারির ফরমুলা হল এই যে, পাকিস্তান হবে কিনা এই প্রশ্ন জাতীয় সরকার গঠিত না হওয়া পর্যন্ত মুলতুবী থাকবে। জাতীয় সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবার পর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোতে এ নিয়ে গণভোট গ্রহণ করা হবে।

জিন্নাহ্ অবশ্য এই প্রস্তাবে রাজী হননি। কারণ তিনি একে একটি সচতুর কৌশল হিসেবেই মনে করেছিলেন। কিন্তু সাধারণ মুসলমানের মনে এ প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া ছিল ইতিবাচক। কারণ, ১৯৪২ সালেও তারা কল্পনা করতে পারেননি যে ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হবে এবং স্বাধীনতা আসবে দেশ বিভাগের রক্তস্নাত পথ ধরে।

বৃটিশ সরকার তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বিব্রত। পূর্ব দেশে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে গঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজ ইম্ফলের দুয়ারে এসে হানা দিয়েছে। ভারতের অভ্যন্তরে মুক্তিকামী গণশক্তি তখন সংগ্রামে উত্তাল। বৃটেনে তখন যুদ্ধকালীন জাতীয় গভর্ণমেণ্টের নেতা গোঁড়া রক্ষণশীল ভারত-বিদ্বেষী সাম্রাজ্যবাদী উইনস্টন চার্চিল। তিনি তো বলেই দিয়েছিলেন যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের অবলুপ্তির ওপর সভাপতিত্ব করবার জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী হননি।

কিন্তু ইতিহাসের চাপ ছিল বড় দুর্দম। তাই ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে চৌখস বৃটিশ রাজনীতিবিদ লেবার পার্টির প্রাইজবয় সার স্ট্যাফোড ক্রিপসের হাত দিয়ে একটি প্রস্তাব পাঠান হল ভারতে। যার নাম হল ক্রিপস মিশন।

প্রস্তাবে স্বাধীনতার নাম গন্ধও ছিলনা। শুধু বলা হয়েছিল, যুদ্ধে ভারতীয় নেতারা সহযোগিতা করলে যুদ্ধান্তে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়টি

বিচার করা হবে। এখন বড়লাটের অধীনে একটি অন্তবর্তী সরকার গঠন করা হক যাতে থাকবেন হিন্দু ও মুসলিম প্রতিনিধিরা।

শোনা যায় গান্ধীজী নাকি এই প্রস্তাব সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, A post-dated cheque on a crashing bank. শূন্যহাতে ফিরে গেলেন ক্রিপস। কিছুই হল না। বিয়াল্লিশের আগস্টে কংগ্রেস প্রস্তাব নিল ইংরেজ ভারত ছাড়। শুরু হল নেতাদের ধরপাকড়। কংগ্রেস হল নিষিদ্ধ। নেতৃহীন জনতার অভ্যুত্থান ঘটল সারা দেশে।

এদিকে রাজাগোপালাচারির ফরমুলা নিয়ে চলল আলোচনা। ১৯৪৪ সালে জাতীয়তাবাদী মুসলিমদের এক সম্মেলনে আবেদন করা হল, কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে আবার সুরু হক অলোচনা। ডাকা হক গণপরিষদ যাতে ভবিষ্যৎ ভারতের সংবিধান হবে রচিত। এবং তাতে ভারত ফেডারেশন অংশবিশেষে সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন অথবা ফেডারেশন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার অধিকারকে দিতে হবে স্বীকৃতি। মুসলিম লীগের সাধারণ সদস্যরা এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানালেন। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে আলোচনা সুরু করার সুযোগ দেবার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে সালিশী কমিটিও গঠিত হল।

জিন্নাহ্ রাজী হলেন কংগ্রেসের সঙ্গে আবার আলোচনায় বসতে। প্রথমে সুরু হল গান্ধী-জিন্নাহ্ পত্রালাপ। ১৯৪৪ সালের অক্টোবর কিন্তু তাতে সমাধানের কোনো সূত্র পাওয়া গেল না। জিন্নাহ্ চাইলেন ভারত স্বাধীন হক বা না হক, নীতি হিসাবে আগেই পাকিস্তানের দাবি স্বীকার করে নিতে হবে। তিনি কংগ্রেসকে একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি দিতেও রাজী হলেন না। স্বভাবতই আলোচনা ভেঙ্গে গেল। গান্ধীজী বললেন, স্বাধীনতা আগে, পরে অন্য দাবি। তা ছাড়া মুসলিমলীগই ভারতের মুসলমানদের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে তিনি স্বীকার করতে অসম্মত হলেন।

আলোচনা ব্যর্থ হলে সবচেয়ে লাভবান হল ইংরেজই। কারণ,

তারা কংগ্রেস লীগ অনৈক্যের অজুহাত দেখিয়ে ভারতের স্বাধীনতাকে বিলম্বিত করতে লাগলেন। ১৯৪৫ সালে সিমলায় ভাইসরয় লর্ড ওয়েভেল এক সম্মেলন ডাকলেন। সেখানে ভাইসরয়ের একসিকিউটিভ কাউন্সিল সম্প্রসারণেরই প্রস্তাব দেওয়া হল। একে নাম দেওয়া হবে ইণ্টারিম গভর্ণমেণ্ট বা অন্তবর্তী কালীন সরকার। কিন্তু আসল কথা রইল উহ্য। কবে ভারত পূর্ণ স্বাধীনতা পাবে তার তারিখ দেওয়া হল না। বরং বৃটিশরা নিজেদের কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে সালিশী বা মধ্যস্থের ভূমিকা নিয়ে এমন ভাব দেখাতে লাগল যে, শুধু এই দুইয়ের ঐক্য না হওয়াতেই ভারতের স্বাধীনতা আটকাচ্ছে।

আসলে ভারতে একটি শক্তিশালী গনতান্ত্রিক স্বাধীন সরকার গঠিত হোক ইংরেজের তা কখনই কাম্য ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে ফ্যাসিস্ত শক্তির পরাজয় শুধু বৃটেন বা আমেরিকার প্রচেষ্টায় হয়নি। তাতে এক গৌরবময় মহাশক্তিশালী ভূমিকা ছিল স্ট্যালিনের নেতৃত্বধীন সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা তখনি বুঝতে পেরেছিল যে তাদের নির্লজ্জ শোষণ ও ঔপনিবেশিক শাসনের দিন ঘনিয়ে এসেছে এশিয়ায়। চীনে তখন জাপ সাম্রাজ্যবাদীরা পর্যুদস্ত। চীনে এক নতুন শক্তির অভ্যুদয় ঘটছে। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ তার লক্ষ্যে উপনীত হতে না পারলেও একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছে। ভারতবাসী জানে কীভাবে অস্ত্র ধরতে হয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে। সুভাষচন্দ্রের অসীম সাহসিকতা, ভারতীয় সেনাদলে জাতীয়তাবাদের জাগরণ হিন্দু মুসলিম ঐক্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বড় সাধের ঘুম ভেঙে দিচ্ছিল বারবার।

ওরা বুঝেছিল, আর দেরী নেই। এবার যেতে হবে। কিন্তু যাবার আগে ভারতবর্ষকে তারা পঙ্গু করে দিয়ে যেতে চাইল। কংগ্রেস-লীগ দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য লাভবান করল কুচক্রী বৃটিশদেরই। কংগ্রেসের অদূরদর্শিতা এবং জিন্নাহ্‌র অনমনীয়তা সেই দুর্ভাগ্যকে

আরও বাড়িয়ে তুলল। সিমলা সম্মেলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল অচিরেই। মৌলানা আজাদ এ সম্পর্কে লিখেছেন "ভাইসরয়ের একসিকিউট কাউন্সিলে কে কে থাকবেন এ নিয়েই দেখা দিল পার্থক্য অথচ রাজনৈতিক প্রশ্নগুলোর মীমাংসা হয়েই গিয়েছিল। জিন্নাহ্‌র বিরোধিতার জন্য সম্মেলন যদি ভেঙে না যেত তাহলে ভারতে মুসলমানদের সংখ্যা যেখানে মাত্র ২৫ শতাংশ সেখানে ১৪ জনের পরিষদে তাদের প্রতিনিধি থাকত ৭ জন। লীগ নাকি ছিল মুসলিম স্বার্থের ধারক কিন্তু লীগের বিরোধিতায় ভারতের মুসলমানরা অখণ্ড ভারতের প্রশাসনে একটা উল্লেখযোগ্য শরিকানা থেকে বঞ্চিত হল।" (ইণ্ডিয়া উইনল্ ফ্রিডম ঃ মৌলানা আবুল কালাম আজাদ)।

১৯৪৫ সালে বৃটিশ নির্বাচনে লেবার পার্টি জয়ী হল। ক্লিমেন্ট এটলির নেতৃত্বে বৃটিশ সরকার ঘোষণা করলেন যে ১৯৪৫ সালের শেষে এবং ১৯৪৬ সালের গোড়ায় ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভার এবং প্রাদেশিক আইন সভাসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের থেকেই গঠিত হবে ভারতের গণপরিষদ বা কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলী।

এই নির্বাচনে মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেসই ভারতের সর্বপ্রধান দুটি রাজনৈতিক দল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হল। এই নির্বাচনে আরও প্রমাণিত হল যে মুসলিম লীগের প্রভাব মুসলমানদের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী! সমস্ত আইনসভার মুসলিম আসনের ৭০ শতাংশ আসন গেল লীগের দখলে। মোট ৬০০ মুসলিম আসনের মধ্যে ৪২০ আসন পেল মুসলিম লীগ। তবে একমাত্র বাংলাদেশ ছাড়া অন্য কোথাও মুসলিম লীগপেল না নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। বাংলাদেশে হুসেন শহীদ সুরাওয়ার্দির নেতৃত্বে গঠিত হল অবিভক্ত বাংলার শেষ মুসলিমলীগ মন্ত্রিসভা।

নির্বাচনে আরও দেখা গেল মুসলিম সর্বহারাদের মধ্যেও বামপন্থী প্রগতিশীল দলগুলোর প্রভাব অতি সামান্য। মধ্যবিত্ত মুসলিমদের

মধ্যে কংগ্রেস হারিয়েছে তার প্রভাব। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত থেকে সুরু করে সাধারণ কৃষক শ্রমিকও পাকিস্তান দাবিতে লীগের পক্ষেই ভোট দিল। একমাত্র ব্যতিক্রম খান আবদুল গফফর খাঁর পাঠানরা। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তাঁর খুদাই খিদমদগাররা লীগের দ্বিজাতিতত্ত্বের বিরুদ্ধে রায় দিয়ে জয়ী করেছিল কংগ্রেসকেই। কিন্তু কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত এই মহান সংগ্রামীকেও নেকড়ের মুখে ঠেলে দিতে দ্বিধা করল না বিভক্ত ভারতে ক্ষমতাসীন হবার উদগ্র বাসনায়।

ইংরেজ জানত এভাবে আর রাখা যাবে না ভারতকে। ১৯৪৬ সালের মার্চে লর্ড পেথিক লরেন্সের নেতৃত্বে এল বৃটিশ ক্যাবিনেটের একটি মিশন। এই মিশনের অপর তুই সদস্য ছিলেন সার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ও এ ভি আলেকজাণ্ডার। এরা সকলেই ছিলেন বৃটিশ মন্ত্রিসভার সদস্য। ক্রিপসের সঙ্গে নেহুরুর বন্ধুত্বও ছিল ক্যামব্রিজে পড়বার সময়ে। ক্যাবিনেট ভেবেই এসেছিলেন এবার একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে। যুদ্ধ শেষ হয়েছে। যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় বৃটিশ অর্থনীতি বিপর্যস্ত। সাম্রাজ্য রাখা যে আর সম্ভব হবে না এটা বৃটিশ ধুরন্ধররা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই এবার একটা সমাধানের চেষ্টা।

ক্যাবিনেট মিশন ঘোষনা করলেন গণপরিষদ নতুন সংবিধান তৈরি করলে ভারতকে দেওয়া হবে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস। অথাৎ বৃটিশ কমনওয়েলথের অধীনে একটি স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্র। ভারতরাষ্ট্রকে তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হবে। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলো নিয়ে একটি গ্রুপ। পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলো নিয়ে (বাংলা ও আসাম) অরেকটি গ্রুপ ; এবং পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশগুলো নিয়ে (পাঞ্জাব সিন্ধু ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ) তৃতীয় গ্রুপ। প্রত্যেকটি গ্রুপ ও তার অন্তর্ভুক্ত প্রদেশগুলোর থাকবে স্বায়ত্তশাসন। কেবল মাত্র প্রতিরক্ষা পররাষ্ট্র বিভাগ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকবে কেন্দ্রীয় ফেডারেল সরকারের অধীন। নতুন সংবিধান রচিত না হওয়া পর্যন্ত

যে অন্তবর্তী সরকার গঠিত হবে তার ৪০ শতাংশ আসন পাবে হিন্দুরা কংগ্রেসের মনোনীত সদস্য হিসেবে, ৪০ শতাংশ পাবে মুসলিম লীগ মনোনীত মুসলমান সদস্যরা এবং ২০ শতাংশ পাবে শিখ হরিজন পার্শি খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের লোকেরা।

এতে না রইল অবিলম্বে পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণার প্রতিশ্রুতি, না রইল গণপরিষদের নির্বাচন। কার্যত এতেই রয়ে গেল দেশভাগের সূচনা। ভারতকে কয়েকটি বিবাদমান আঞ্চলিক গোষ্ঠিতে ভাগ করে বৃটেন হাত মুছে চলে যেতে চাইল এই আশায় যে গৃহযুদ্ধ বাধলে এদের সকলকেই নির্ভর করতে হবে বৃটেনের ওপর।

মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে শত্রুতার নতুনতর ভিত্তি রচিত হল। তা সত্ত্বেও একটি নির্দিষ্ট প্রস্তাব থাকার দরুণ অনেক আলাপ আলোচনার পর কংগ্রেস ও লীগ উভয়েই এই প্রস্তাব গ্রহণে জানাল সম্মতি। গান্ধীজীর ভাষায় "It is the best document the British could have produced in the circumstances"

১৯৪৬ সালের ৬ জুন মুসলীম লীগের প্রস্তাবে বলা হল:

The Muslim league is willing to cooperate with the constitution-making machinery proposed in the scheme out lined by the cabinet mission in the hope that it would ultimately result in the establishment of completely sovereign Pakistan and in the consummation of the goal of independence for the major nations, Muslims and Hindus, and all the other peoples inhabiting the vast subcontinent. অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করবে এই আশায় মুসলিমলীগ ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

সবই ভালয় ভালয় চলছিল। মনে হল যেন রক্তপাত ছাড়াই

স্বাধীন হতে চলেছে দেশ। সাম্প্রদায়িক সমস্যারও সমাধান হবার পথে।

১৯৪৬ সালের জুনে নির্বাচন হল গণপরিষদের। প্রাদেশিক আইন সভার সদস্যরাই নির্বাচন করে পাঠালেন প্রতিনিধিদের। ৩৮৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে কংগ্রেসেব ছিল ১৯২ জন, লীগের ৭০ জন।

হঠাৎ সমস্ত কিছু ওলট পালট হয়ে গেল। কংগ্রেস থেকে বলা হল যে, গণপরিষদ হবে একটি সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান। তার কাজকর্মের ওপর কারো কথা বলা চলবে না।

ধূর্ত বৃটিশ সঙ্গে সঙ্গে এর প্রতিবাদ করল। পেথিক লরেন্স বললেন না। সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে এর কোনো এক্তিয়ার থাকবে না। বৃটেনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বিষয়েও না। অর্থাৎ এদুটি বিষয় থাকবে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজেরই হাতে।

ক্ষিপ্ত হলেন জওহরলাল নেহরু। বোম্বাইয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংবাদিকরা জানতে চাইলেন, গণপরিষদে ঢোকা নিয়ে এমন কোনো শর্ত আছে কি না।

জওহরলাল বলেন, কোনো শর্ত নেই। কোনো শর্ত আমাদের ওপর চাপাতে চাইলে আমরা তা ছিঁড়ে ফেলব। সংখ্যালঘুদের সমস্যা আমাদের নিজস্ব ব্যাপার। আমরা নিঃসন্দেহে এর সমাধান করতে সফল হব। বাইরের কোনো হস্তক্ষেপ আমরা স্বীকার করব না—বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ তো নয়ই—গণপরিষদের সার্বভৌমত্ব সঙ্কুচিত করে এই তুটি শর্ত আমরা স্বীকার করি না।

জওহরলাল আরও বললেন, কংগ্রেস গণপরিষদে সহযোগিতা করতে সম্মত হয়েছে। কিন্তু ক্যাবিনেট মিশনের পুরো প্রস্তাবের সঙ্গে একমত নয়।

মুসলিম লীগ নেতাদের দৃষ্টি এড়াল না এই মন্তব্য। তারা বললেন, কংগ্রেসের কথায় ও কাজে মিল নেই। গণপরিষদকে

ওরা সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে চালাবে। জিন্নাহ্ একে বলতেন বর্বর সংখ্যাগরিষ্ঠতা—ব্রুট মেজরিটি।

মুসলিম লীগ আগেকার সিদ্ধান্ত বাতিল করে প্রত্যাখ্যান করল ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাব। বয়কট করল গণপরিষদ। ১৬ আগষ্ট ১৯৪৬ ঘোষিত হল মুসলিম লীগের 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে' প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস।'

ডাইরেক্ট অ্যাকশন কী চেহারা নেবে তা আগে কেউ আঁচ করতে পারেনি। বাংলা দেশেই তখন একমাত্র মুসলিম লীগ সরকার। সুরাওয়ার্দি তার প্রধান। সুরাওয়ার্দিকে জিন্নাহ্ খুব পছন্দ করতেন তা নয়। জিন্নাহ্র সব সময়েই মনে সন্দেহ ছিল যে সুরাওয়ার্দি সুযোগ পেলেই বাংলাদেশে তার নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানাবে। যদিও নিজের ক্ষমতা রাখবার জন্য সুরাওয়ার্দি তখন পাকিস্তানের একজন বড় প্রবক্তা।

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস সুরাওয়ার্দি হাতে এনে দিল নিজের ক্ষমতা দেখাবার এক সুবর্ণ সুযোগ। সুরাওর্দি ১৬ আগষ্ট ১৯৪৬ ছুটির দিন ঘোষণা করলেন। ৫ আগষ্ট বৃটিশ পরিচালিত ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় সুরাওয়ার্দি লিখলেন এক প্রবন্ধ 'শহীদ' ছদ্মনামে। তিনি লিখলেন, Bloodshed and disorder are not neecsarily evil in themselves, if resorted to for a noble cause. Among muslims to day, no cause is dearer or nobler than Pakistan.

সুরাওয়ার্দি যা লিখেছিলেন কাজেও তাই করলেন। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে কলকাতা পরিণত হল হত্যা নগরীতে। যা ছিল বৃটিশের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগের বিক্ষোভ পাকিস্তান স্বীকার না করার জন্য তা পরিণত হল হিন্দু-মুসলিম গৃহযুদ্ধে। হাজার হাজার মানুষ নিহত, আরও বহু সহস্র আহত গৃহহীন ও স্বজনহারা। রক্ত স্নানের মধ্য দিয়ে উদযাপিত হল মুসলিম লীগের 'ডাইরেক্ট

অ্যাকশন ডে'। তিনদিন ধরে চলেছিল এই নারকীয় উৎসব। বাংলাদেশে কোনো সরকারের অস্তিত্ব ছিল না যেন তখন। জিন্নাহ্ নেহরু সবাই দূর থেকে এ-র নিন্দা করলেন। কেউ এলেন না এই মৃত্যুপুরীতে। বড়লাট ওয়াভেল এলেন। সব দেখে শুনে তিনি বললেন,

I am appalled at what I have seen.

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা বুঝল, তাদের দিন ঘনিয়ে এসেছে। স্বাধীনতার দাবিতে সারা ভারতবর্ষ উত্তাল। আগষ্টের ২৪ তারিখে কংগ্রেস প্রবেশ করল অন্তবর্ত্তী সরকারে জহওলাল নেহরুর নেতৃত্বে। প্রায় দেড় মাস পর ১৫ অক্টোবর জিন্নাহ্ সম্মতি জানালেন অন্তবর্ত্তী সরকারে মুসলিম লীগের অংশ গ্রহণে।

তখনি বোঝা গিয়েছিল বাংলাদেশের মুসলমানদের কোনোরকম প্রাধান্য দিতে তিনি নারাজ। তাঁর প্রতিনিধিরা হলেন লিয়াকৎ আলি খান, ইসমাইল ইব্রাহিম চুন্দ্রিগড়, সর্দার আবদুর রব নিশতার, গজনফর আলি খাঁ এবং সকলকে আশ্চর্য করে দিয়ে একজন বাঙালী অনুন্নত সম্প্রদায়ের হিন্দু যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। বাদ পড়লেন বাঙলী খাজা নাজিমুদ্দিন, সুরাওয়ার্দি প্রমুখরা। পাঞ্জাবীদের প্রাধান্য তখন থেকেই সুরু। আজও পাকিস্তানের আসল শাসক পাঞ্জাবীরাই। যাদের কায়েমী স্বার্থের চাপে পূর্ব পাকিস্তানের দরিদ্র বাঙালীরা গত ২৩ বছর ধরে শোষিত, বঞ্চিত, উপেক্ষিত।

জিন্নাহ্ বাংলার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে ব্যবহার করেছিলেন তাঁর আন্দোলনে। বাঙালীর মানসিকতা থেকে তিনি ছিলেন অনেকদূরে, অপরিচিত বহিরাগতের মতো। বাঙালীদের সম্পর্কে তিনি যে ধারণা পোষণ করতেন তা বৃটিশদেরই কাছাকাছি বিদ্রোহী, ভাবপ্রবণ, অবাধ্য। বাংলার মুসলিম লীগ নেতাদের তিনি সেকারণেই সর্বভারতীয় প্রাধান্য দিতে ছিলেন গররাজী। মাউণ্টব্যাটেনের অন্তবর্তী সরকারে সেকারণেই বাংলার কোনো মুসলিম প্রতিনিধি রইলনা।

আজ পাকিস্তানের শাসকদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের বিক্ষোভের কারণ খুঁজতে গেলে আমরা দেখতে পাব সেই একই উপেক্ষা, সন্দেহ ও অবিশ্বাস। পূর্ববাংলা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও পাকিস্তানে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। গ্রেট বৃটেনে যেমন বঞ্চনা ছিল স্কট ও ওয়েলসবাসীদের, পাকিস্তানেও তেমনি বাঙালীদের। বাংলাদেশকে ওরা নিয়েছিল কাঁচামাল রপ্তানির উপনিবেশ রূপে। বিদ্রোহের আগুন জ্বলল সে কারণেই। ফজলুল হক যখন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তখন তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন, দরিদ্র কৃষিজীবী বাঙালীর ডাল ভাতের সমস্যা তিনি দূর করবেন। সে ১৯৩৭ সালের কথা। তারপর বাংলা ভাগ হল, মুসলিমরা পেলেন তাদের রাষ্ট্র পাকিস্তান। ডাল ভাতের সমস্যা তাদের দূর হয়নি।

জিন্নাহ্‌র নির্দেশে মুসলিম লীগের সদস্যরা উত্তরপ্রদেশের বিত্তশালী নেতা লিয়াকৎআলি খানের নেতৃত্বে অন্তবর্তী সরকারে যোগ দিলেও গণপরিষদ থেকে রইলেন তারা দূরে। ক্যাবিনেট মিশনে প্রদেশগুলোর যে গ্রুপিং-এর প্রস্তাব ছিল তার ব্যাখ্যা নিয়ে কংগ্রেস ও লীগের দেখা দিল নিদারুণ মতদ্বৈধ।

গণপরিষদের কাজ বন্ধ হয়ে গেল।

এদিকে ভারতবর্ষে তখন অভূতপূর্ব গণ জাগরণ। আজাদ হিন্দ ফৌজের কীর্তিকাহিনী ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। ছাত্র বিক্ষোভ শ্রমিক ধর্মঘট বোম্বাইয়ে নৌবিদ্রোহ ভারতবর্ষকে অনিবার্যভাবে এগিয়ে নিয়ে চলল তার আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার লক্ষ্যের দিকে।

মুসলিম লীগ আর কংগ্রেসের মতবিরোধ সত্বেও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এ সত্য হৃদয়ঙ্গম করল যে, বন্দরের বন্ধন কাল এবারের মত হল শেষ। ঘটনার গতি এগিয়ে চলল দুর্বার বেগে।

কমন্স সভায় বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেণ্ট এটলি ১৯৪৭ সালের ২০ ফ্রুয়ারি নাটকীয়ভাবে ঘোষণা করলেন ১৯৪৮ সালের ১লা জুন

তারিখের মধ্যেই বৃটিশ সরকার ভারতে দায়িত্বশীল সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বদ্ধপরিকর।

এতদিন যা ছিল অস্পষ্ট তা স্পষ্টতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বৃটিশ শাসন ও স্বাধীন ভারতের ইতিহাসের জল বিভাজিকা হল একটি তারিখ—১৯৪৮ সালের ১লা জুন।

জওহরলাল নেহরু উল্লসিত হয়ে বললেন, পূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের তারিখ ঘোষণা সমস্ত সন্দেহ ও ভ্রান্তধারনাই শুধু দূর করল না, ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে এনে দিয়েছে একটি বাস্তবতা ও একধরণের গতিশীলতা। 'It is a challenge to all of us, and we shall try to meet it bravely in the spirit of that challenge.'

জিন্নাহ্ তার স্বভাবজাত গাম্ভীর্য নিয়ে বললেন, তারিখ-টারিখ বুঝিনা। মুসলিম লীগ তার পাকিস্তান দাবি থেকে একচুলও নড়বে না। বিলাতে বৃটিশ টোরিরা সাম্রাজ্য হারাবার বাস্তব আশঙ্কায় দিশেহারা। আজন্ম ভারত বিরোধী উইনষ্টন চার্চিল সখেদে বললেন,

In handing over the Government of India to these so called political classes, we are handing over to men of straw of whom in a few years no trace will remain.

এটলি অটল।

মুসলিম লীগ আবার রক্তাক্ত সংঘর্ষ বাঁধিয়ে দিল পাঞ্জাবে নোয়াখালিতে বিহারে। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরাও অখণ্ডভারতের দাবিতে সেই রক্তের হোলিখেলায় যোগ দিল। কংগ্রেস নেতারা বুঝতে পারলেন, অবিভক্ত ভারতে শাসন ক্ষমতা পাবার আশা ছলনাময়ী। সুতরাং কোনো রুটি না পাওয়ার চেয়ে আর্ধেক রুটিই ভাল।

প্রথমে প্রস্তাব এল পাঞ্জাব বিভাগের। প্রস্তাবটা দিয়েছিলেন

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। কী হবে তাহলে কংগ্রেসের আদর্শে বিশ্বাসী উত্তরপ্রদেশ সীমান্ত প্রদেশের; ঠিক হল গণভোট নেওয়া হবে।

আর বাংলাদেশ? বাংলার পূর্বাঞ্চলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা হলেও তার পশ্চিমাঞ্চল ও উত্তর ভাগে অ-মুসলমানরা রাজী হবেন কেন পাকিস্তানে যেতে?

বৃটিশ সরকারের চূড়ান্ত ঘোষণা লিপিবদ্ধ হল ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অ্যাক্ট, ১৯৪৭ নামক আইনে।

ঠিক হল ভারতকে তুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত করা হবে—ভারত ও পাকিস্তান। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও আসামের সিলেট জেলার ভাগ্য নির্ধারিত হবে গণভোটের দ্বারা। সিন্ধু ও বাংলা পুরোটাই ভারত কিংবা পাকিস্তানে যাবে অথবা অংশ বিশেষ যাবে তার নির্ধারণের ভার পড়ল প্রাদেশিক আইনসভাগুলোর ওপর। ভোট হবে আলাদা—মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলোর ভোট একজায়গায়, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠদের অন্য জায়গায়। সীমান্ত প্রদেশের সাহসী স্বাধীনতা সংগ্রামী পাঠানরা হয়ে পড়ল কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এতদিন তারা নিজেদের স্বাধীনতার জন্য সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে পাশাপাশি লড়াই করেছে। রক্ত দিয়েছে। ভোগ করেছে অশেষ নির্যাতন। তারা জানতেও পারল না, কংগ্রেস নেতারা জিন্নাহ্‌র সঙ্গে এমন একটি চুক্তি করে ফেলেছেন।

বিষণ্ণ খুদাই খিদমদগার নেতা খান আবতুল গফফর খাঁ বললেন, আমাদের নেকড়ের মুখে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

পাখতুনরা গণভোট বয়কট করল। শতকরা ৪৯ শতাংশ ভোট পেয়ে জিন্নাহ্‌ সংগ্রামী পাঠানদের পদানত করলেন। খান আবতুল গফফর খাঁ যখন দেখলেন, বৃটিশ চক্রান্তে তাঁর অনমনীয় পাঠানরা মুসলিম লীগ নেতাদের কবলে চলে যাচ্ছে তখন তিনি জিন্নাহকে বললেন, পাঠানরা পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হতে

পারে যদি তাদের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিয়ে পাখতুনিস্তান মেনে নেওয়া হয়। লাহোর প্রস্তাব অনুসারেই পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার তাদের আছে।

জিন্নাহ রাজী হলেন না।

পূর্ববাংলা ও শ্রীহট্ট আলাদা হয়ে গেল। নাম হল পূর্বপাকিস্তান। পাঞ্জাবের অর্ধেক, সিন্ধু, উত্তর সীমান্ত প্রদেশ আর বালুচিস্তান নিয়ে হল পশ্চিম পাকিস্তান।

জন্মলগ্নে মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ মনে রাখলেন না লাহোরে গৃহীত পাকিস্তান প্রস্তাবের কথা। সেখানে সুস্পষ্ট ভাষাতেই বলা হয়েছিল যে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সন্নিহিত অঞ্চলগুলো নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ গঠিত হবে। প্রস্তাবের যথার্থ সঙ্গতি অনুসারে জন্মলগ্নেই পূর্বপাকিস্তান পেত পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন।

কিন্তু না, কোনোটাই স্বীকার করলেন না মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ। রক্ত, অশ্রু ও আগুনের লেলিহান শিখায় দেশভাগ হয়ে গেল। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট করাচীতে স্বাধীন পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল রূপে শপথ গ্রহণ করলেন মহম্মদ আলি জিন্নাহ্। কলকাতা থেকে মুসলীম লীগ নেতারা চলে গেলেন ঢাকায়। শুধু গেলেন না হুসেন শহীদ সুরাওয়ার্দি বাংলাদেশকে পাকিস্তানে দেবার প্রধান কৃতিত্ব যে রাজনীতিকের।

॥ ৫ ॥

I never thught it would happen. I never exp oted to see Pakistan in my life time

M. A. Jinnah

স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম। সিপাহী যুদ্ধ থেকে যার সুরু ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তার একটি পর্বের সমাপ্তি। এর জন্য কত শহীদ হাসিমুখে ফাঁসির দড়িকে চুম্বন করেছেন। তাঁরা আজ ইতিহাসের নায়ক। ভারত বিভক্ত হলেও তার দুটি অংশই স্বাধীন। কে কতটুকু পেল, কার জন্য পেল সে হিসেব সেদিন ছিল মুলতুবী। ভারত ও পাকিস্তানের আকাশে বাতাসে তখন শুধুমাত্র স্বাধীনতারই জয়ধ্বনি।

বাংলাদেশ ও পাঞ্জাব দিল তার চরমমূল্য। মানুষের রক্তে পথ হয়ে উঠল পিচ্ছিল। তবু সেইদিনটিতে উৎসবের আলোকে আলোকিত পথে পরাধীনতার গ্লানিমুক্ত মানুষ অভিনন্দন জানাতে সমবেত হল নবোদিত সূর্যকে।

এক ভেঙে হল দুই। ভারত ভেঙে হল ভারত ও পাকিস্তান। বাংলাদেশ হল দ্বিধাবিভক্ত। পাঞ্জাব হল দুটুকরো। ইতিহাসের নির্দেশই হয়তো ছিল তাই। নয়তো যে বাংলাদেশ স্বাধীনতার জন্য সবচেয়ে বেশি রক্ত দিয়েছে, যে পাঞ্জাবের সন্তান ভগৎ সিং প্রথম উচ্চারণ করেছিলেন 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' তাদের ভাগ্যে কেন মধ্যাহ্নেই নামল অন্ধকার? এই প্রশ্নের কোনো উত্তর মানুষ খুঁজে

পায়নি। আজ পূর্ববাংলার নবজাগ্রত মানুষ যেন সেই প্রশ্নেরই উত্তর দিতে চাইছে।

জিন্নাহ্ চেয়েছিলেন হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতার চাপ থেকে মুসলিমদের মুক্তি। তাঁর মতে ভারতে হিন্দু ও মুসলিমরা দুই জাতি, দুই সংস্কৃতি, দুই জীবনযাত্রার ধারক।

কিন্তু কোন ভিত্তিতে ভাগ হল দেশ; তার জনসাধারণের জাতিগত বা গোষ্ঠিগত সাদৃশ্য ও সমধর্মিতাকে কোনো প্রাধান্য দেওয়া হল না। গুরুত্ব পেলনা অর্থনীতিক বা সাংস্কৃতিক বন্ধন।

শুধু ধর্মই হল একমাত্র নিরিখ। কিন্তু তাও কি হল সর্বক্ষেত্রে? জিন্নাহ্ কি ভারতের সমস্ত সংখ্যালঘু মুসলিমদের স্থান দিলেন পাকিস্তানে? তা সম্ভবও ছিলনা, ভারত সে-প্রস্তাবে রাজীও হয়নি। সুতরাং জিন্নাহ্ পেলেন ওঁরই ভাষায় একটি খণ্ডিত ও পোকায়-খাওয়া (Truncated and moth eaten) পাকিস্তান। পূর্ব ও উত্তরবাংলার কটি জেলা নিয়ে পূর্বপাকিস্তান। পশ্চিমে পাঞ্জাব, সিন্ধু, বালুচিস্তান ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান। মাঝখানে রইল হাজার মাইলের ভারতভূমির ব্যবধান। ভারত বিভাগের পরও তিনকোটিরও বেশি মুসলিম রইলেন ভারতে। পূর্ব পাকিস্তানে রয়ে গেলেন মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৩ ভাগ হিন্দু। এ হল ১৯৫১ সালের হিসেব।

সবচেয়ে আঘাত লাগল বাঙালী ও পাঞ্জাবীদের। অধিকাংশ বাঙালী ও পাঞ্জাবীই পড়ে গেলেন পাকিস্তানে। বাকী অংশ অন্তর্ভুক্ত হল ভারতে।

পূর্ব পাকিস্তানই হল জনসংখ্যার দিক দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ। এবং তার শতকরা ৯৯ জনই হল বাঙালী। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে চারটি প্রধান জাতিগোষ্ঠির বাস পাঞ্জাবি, পাখতুন, সিন্ধী ও বালুচ। তাদের মধ্যে পাঞ্জাবীদেরই হল সংখ্যাগরিষ্ঠতা। ভাষার দিক দিয়েও পূর্বপাকিস্তানের একমাত্র ভাষা বাংলা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠের

ভাষা। পশ্চিম পাকিস্তানে পাঞ্জাবীদের উর্দু ছাড়াও রয়েছে সিন্ধী বালুচ ও পাখতুনদের নিজস্ব ভাষা।

ভারত বিভাগ শুধু রাজনৈতিক চিন্তাধারাকেই বিভক্ত করল না। বহু শতাব্দী ধরে যে ভৌগোলিক অখণ্ডতা একটি অর্থনীতির জন্ম দিয়েছিল তাও ভেঙে তছনছ হয়ে গেল। একটি দেশের অর্থনীতি ভৌগোলিক সন্নিহিতির কারণেই বিভিন্ন অঞ্চলের ওপর পারস্পরিক নির্ভরশীল। ভারত-পাকিস্তান উপমহাদেশও ছিল তাই।

বৃটিশের চক্রান্তে ও রাজনীতিকদের অদূরদর্শিতায় দেশ ভাগ হবার পর দেখা গেল উভয়ের অর্থনীতিরই অনেক গ্রন্থি আলগা হয়ে যাচ্ছে। অথচ জন্মলগ্নেই ভারত ও পাকিস্তানের বৈরিতা ছিল এমন তীব্র যার ফলে দুটি পৃথক রাষ্ট্রের মধ্যেও যেরকম অর্থনীতিক যোগাযোগ থাকে তা রক্ষা করা সম্ভব হল না।

পশ্চিম পাঞ্জাব ও সিন্ধুর পয়লা নম্বরের তুলা আসত বোম্বাই, কানপুর, আমেদাবাদের কাপড়ের কলে। পূর্ববাংলার পাট ও তামাক আসত কলকাতায়। ভারতের কয়লা, বিজলী শক্তি, ইস্পাত, লোহা ও অন্যান্য শিল্পসামগ্রীর যোগান পেত পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত এলাকাগুলো। ভারতের অনেক অঞ্চলকে খাদ্যসামগ্রীর জন্য নির্ভর করতে হত পাঞ্জাব ও পূর্ববাংলার ওপর। দেশভাগের আগে পূর্ববাংলা, সিন্ধু, পশ্চিম পাঞ্জাব প্রভৃতি এলাকার শ্রমিকরা কাজ পেত ভারতের শিল্প-শহরগুলোতে বিশেষ করে কলকাতায় ও বোম্বাইয়ে।

ভারত ও পাকিস্তানের তখন কোনো অঞ্চল নেই যা অর্থনীতিক সূত্রে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত না ছিল। ক্ষতিগ্রস্ত বেশি হল পাকিস্তানই। কারণ, শিল্পোন্নত ও প্রাকৃতিক সম্পদ পরিপূর্ণ এলাকার বেশির ভাগই পড়ল ভারতে। তার ওপর স্থান করে দিতে হল শরণার্থীদের জন্য। দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গেই দুই দেশ থেকে সংখ্যালঘুরা স্থানত্যাগ করতে থাকে। পাঞ্জাবে তো বেসরকারী ভাবেই সমস্ত সংখ্যালঘু পরস্পরের স্থান পরিবর্তন করল। পূর্বপাঞ্জাবের মুসলিমরা রক্ত ও আগুনের মধ্য

দিয়ে চলে গেল পশ্চিমে। ঠিক অনুরূপ ভাবেই পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে হিন্দু ও শিখদের কনভয় এল ভারতে।

পাকিস্তানের হিসাবে দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে বা তার কিছু পরে মোট ৭২ লাখ শরণার্থী ভারত থেকে গিয়ে আশ্রয় নেয় পাকিস্তানে। পশ্চিম পাকিস্তানে যায় ৬৫ লাখ, পূর্ববাংলায় যায় ৭ লাখ। পূর্ববাংলা থেকেও অনুরূপ সংখ্যক শরণার্থী এসেছে ভারতে। এখনও সেই আগমন শেষ হয়নি।

পূর্ববাংলা রইল করাচী থেকে দূরে, অনেক দূরে। তার দুঃখ ও অবহেলার বোঝা হল ভারী। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর জিন্নাহ্ হলেন গভর্ণর জেনারেল। তাঁর বিশ্বস্ত লিয়াকৎ আলি খান হলেন প্রথম প্রধানমন্ত্রী। পূর্বপাকিস্তানকে শাসন করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী করে পাঠান হল ঢাকার নবাব গোষ্ঠির অন্যতম খাজা নাজিমুদ্দিনকে।

বৃটিশ আমলে তৈরি ব্যুরোক্রাসির শক্তি রইল অটুট। এতকাল তারা বৃটিশ প্রভুদের সেবা করেছে। এবার নবলব্ধ পাকিস্তানের প্রভু জমিদার, ধনিক-বণিকের সেবায় আত্মনিয়োগ করল তারা।

মাউণ্টব্যাটেনকে বিস্মিত করে মহম্মদ আলী জিন্নাহ্ নিজে পাকিস্তানের গভর্ণর-জেনারেল হলেও পাকিস্তানে বৃটিশ অফিসারদের দিন তখনো ফুরোয়নি। পাকিস্তান সৃষ্টির পর পশ্চিম পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গভর্ণর ছিলেন বৃটিশ। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধানও ছিলেন অকিনলেক।

বাঙালীদের সম্পর্কে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠির মনোভাব গোড়া থেকেই ছিল অভিভাবকত্বের। দূরের প্রজাদের যে চোখে দেখা হয় বাঙালীদের ভাগ্যেও জুটল সেই বিড়ম্বনা। এর কারণ, পূর্ববাংলায় সেদিন তখন কোনো নেতা ছিলেন না যিনি জিন্নাহ্ বা লিয়াকতের মুখোমুখি হতে পারেন। সুরাওয়ার্দির বুদ্ধিও ছিল, ক্ষমতাও ছিল। কিন্তু ভারত বিভাগের পর তিনি কলকতাতেই রয়ে গেলেন কিছুকাল। কারণ, জিন্নাহ্‌র সঙ্গে তাঁর বনিবনা ছিল না। ফজলুল

হক তখন নেপথ্যে। মুসলিম লীগ রাজনীতির সঙ্গে তাঁর তখন যোগ ছিল না।

কে দেখে বাংলাদেশকে ?

ওদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে খান, নবাব, মীর, পীর প্রমুখ জমিদার বিত্তবান শ্রেণীর লোকেরাই পাকিস্তনের ক্ষমতা করায়ত্ত করল। এদের অধিকাংশই পাঞ্জাবী, কিছু সিন্ধী। তাদের সঙ্গে যোগ দিল মুসলিম ব্যবসায়ী শিল্পপতিরা। দেশভাগের পর এরা ভারত থেকে চলে যায় পাকিস্তানে। শুধু অর্থনীতির ওপরেই নয়, সরকারী ক্ষমতা ও প্রশাসন যন্ত্রের ওপরও এদের নিয়ন্ত্রণ ছিল কঠোর। পাকিস্তানের আইনসভাগুলোর সদস্যদের নামের তালিকার ওপর চোখ বুলোলেই তা স্পষ্ট বোঝা যেত।

পাকিস্তান হবার পর যারা নেতা হয়ে ওঠেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন পশ্চিম পাঞ্জাবের জমিদার—মালিক ফিরোজ খান নুন, মুস্তাক আহমেদ গুরমানি মিঞা মমতাজ দৌলতানা, ইফতিকার হুসেন খান মামদোত ; সিন্ধুর জমিদার মহম্মদ আয়ুব খুরো, মীর গুলাম আলি তালপুর। এদের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে নিলেন ভারত থেকে যাওয়া মুসলিম লীগ নেতারা—লিয়াকত আলি খান, চৌধুরী খালিকুজ্জমান, ইসমাইল ইব্রাহিম চুন্দ্রিগড় প্রমুখ। একজন বিশিষ্ট কানাডীয় রাজনৈতিক ইতিহাসকার কে-কালার্ড তাঁর পাকিস্তান নামক বইয়ে পাকিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, একটি ছোট্ট সুসংবদ্ধ গোষ্ঠীই পাকিস্তানের সমস্ত ক্ষমতা দখল করে নিয়েছিল। ২০ জনের একটি গোষ্ঠীই সর্বস্তরে সমস্ত রাজনৈতিক ও সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত।

এই কুড়িজনের মধ্যে বাংলার মুসলিম লীগের কোনো নেতা ছিলেন না। কারণ, জিন্নাহ্ বাঙালী নেতাদের পছন্দ করতেন না। পূর্বপাকিস্তানকে দেখা হতে লাগল একটি অনুন্নত, কাঁচামাল উৎপাদনকারী উপনিবেশ হিসাবে। পাকিস্তানের ছোট তরফ হল

পূর্বপাকিস্তান যদিও সংখ্যার দিক দিয়ে সারা পাকিস্তানে তারাই হল সংখ্যাগরিষ্ঠ।

পাকিস্তানের আসল কর্তৃত্ব গেল পশ্চিম পাঞ্জাবের বিত্তশালী শ্রেণীর হাতে। পূর্ববাংলাকে যেমন তারা শোষণ করছে, পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য অঞ্চল, সিন্ধু বালুচিস্তান ও পাখতুনদের দেশ উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকেও তারা শোষিত ও বঞ্চিত করেছে একইভাবে।

পূর্ববাংলার মানুষ চেয়েছিল পাকিস্তান সৃষ্টির পর শোষণ থেকে মুক্তি। তাদের সেই আশ্বাসও দেওয়া হয়েছিল। পাকিস্তান হলে হিন্দু জমিদার, সুদখোর মহাজন, তালুকদাররা আর মুসলিম কৃষকদের শোষণ করতে পারবে না, এই আশ্বাস দিয়েছিলেন মুসলিম লীগ নেতারা।

কিন্তু শোষকের ধর্মীয় গোষ্ঠি বদল হলেও শোষক থাকবেই পুঁজিবাদী সমাজে। যতদিন পাকিস্তানে সত্যিকারের গণতন্ত্রও সমাজবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে ততদিন চলবে এই শোষণ।

পূর্ববাংলায় অধিকাংশ মানুষই কৃষিজীবী। কৃষিজীবিদের মধ্যে মুসলিমদেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা। হিন্দুদের মধ্যে নমঃশূদ্র শ্রেণীর লোকেরাই নিজেরা চাষবাস করতেন। এই জমির শতকরা আশিভাগই ছিল জমিদার ও জোতদারদের হাতে। ওরাই খাজনা আদায় করত। গ্রামের জনসাধারণের এক তৃতীয়াংশই ভাগচাষী। তাদের কোনো জমি ছিল না। জমিদারদের দ্বারা শেষিত এই কৃষক সমাজ আশা করেছিল পাকিস্তান সৃষ্টির পর তাদের দুঃখের দিন অবসান হবে। সুদখোর মহাজনরা আর তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলতে পারবে না।

এই আশা তাদের সফল হয়নি পাকিস্তান যারা তৈরী করেছিলেন তারা সাধারণ দুঃখী মানুষের কথা ভেবে তা করেননি। তারা ছিলেন সমাজের ওপরতলার মানুষ। তাদের শ্রেণীস্বার্থ আর বিত্তহীন,

ভূমিহীন কৃষক শ্রমিক মুসলিমদের স্বার্থ এক নয়। পাকিস্তানের মাথার ওপর যারা বসেছিলেন এবং এখনও আছেন, তারা নিজেদের হাতে কতকগুলো সুখ-সুবিধা চাইছিলেন। চাকরীবাকরী, ব্যবসায়-বাণিজ্যে হিন্দুদের কাছ থেকে যতটা সম্ভব সুবিধা আদায় করা। তারা পেয়ে গেলেন একটি আস্ত রাষ্ট্র। এতটা বোধ হয় তারা আশা করেননি। ঘটনাচক্রে তা হয়ে গেল।

হিন্দুরা চলে গেলে মুসলিম গরীবদের সুবিধা হবে, এমন আশা মুসলিম লীগ নেতারা দিয়েছিলেন। কাজের বেলায় হল তার উল্টো। ১৯৫৩ সাল পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের উদবাস্তু পুনর্বাসন মন্ত্রী দৈয়দ মিরণ মহম্মদ শাহ্ প্রাদেশিক আইনসভায় জানিয়েছিলেন যে একমাত্র সিন্ধু প্রদেশেই হিন্দুরা ১,৩৪৫,০০০ একর চাষের জমি ফেলে ভারতে চলে যায়। এই জমিগুলো ভারত থেকে আগত নিঃস্ব মুসলিম শরণার্থীদের মধ্যে বণ্টন করার কথা। কিন্তু তা দখল করে নেয় পশ্চিম পাকিস্তানের জমিদারেরা।

পূর্ববাংলার মুসলিমদের ভাগ্যও ফিরল না হিন্দু জমিদারদের বিতাড়নের পর। ১৯৫০ সালে, অর্থাৎ পাকিস্তান সৃষ্টির তিন বৎসর পর, পূর্ববাংলায় চাষযোগ্য জমির শতকরা ৮০ ভাগই ছিল জমিদারদের দখলে।

পূর্ববাংলার বর্গাদার ও আধিয়ার চাষীদের জীবনে কোনো পরিবর্তন আনল না মুসলিম লীগ শাসিত পূর্বপাকিস্তান। পূর্ববাংলার কৃষিজীবি মানুষ তখন সংগ্রামের সংবাদ পেয়েছে। ১৯৪৬-৪৭ সাল, দেশভাগের সময়েই, পূর্ববাংলায় সুরু হয় তেভাগা আন্দোলন। ময়মনসিংহ, দিনাজপুরে, যশোহর ও খুলনায় এই আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। ময়মনসিংহের গারো পাহাড় অঞ্চলে গারো হাজং ভূমিহীন চাষীদের এই আন্দোলন সংগঠন করেন পূর্ববাংলার বীর সন্তান কমিউনিষ্ট নেতা মনি সিং। এই বিপ্লবী নেতা পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে জেলেই জীবনাতিপাত করছেন। এখনও তিনি কারান্তরালে।

মুসলিম লীগ নেতারা এই আন্দোলনে ভীত হয়ে একে প্রতিক্রিয়াশীল প্রচারে বিভ্রান্ত করে দিল। তারা বললেন, কৃষক সভার নেতাদের অধিকাংশই হিন্দু, ওদের কর্মীরাও হিন্দু। ওদের আন্দোলনের উদ্দেশ্য হল ভারতের স্বার্থে পাকিস্তানকে দুর্বল করে ধ্বংস করা। অমনি সময়ে দেশভাগের ফলে ভারত থেকে মুসলিম শরাণার্থীরা গিয়ে প্রবেশ করল পাকিস্তানে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে সামন্ততন্ত্র বিরোধী কৃষকদের গণ-আন্দোলন নষ্ট করতে বেশি সময় লাগলনা লীগ নেতাদের।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর প্রথম কয় বৎসর পূর্ববাংলার মানুষ নিজেদের কোনো বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ পেলনা। এমন কি প্রতিবাদ সংগঠনের ক্ষমতাও ছিল না তাদের। পাকিস্তান একটি নতুন রাষ্ট্র। তার দুই অংশ পরস্পর থেকে হাজার মাইলেরও বেশি দূরে। ধর্মে এক হলেও জাতি গোষ্টিতে দুই অংশ বিভিন্ন।

এমন একটি রাষ্ট্রকে সুসংহত করতে হলে যে দূরদর্শিতা ও গণতান্ত্রিক মুক্ত দৃষ্টি দরকার পাকিস্তানের শাসকদের তা ছিল না। থাকবার কথাও নয়। শ্রেণী চরিত্রে তারা পরশ্রমজীবি, শোষক। গরীবের রক্তেই তাদের পুষ্টি। ধর্মটা ছিল সেই শোষণের একটি মোক্ষম হাতিয়ার।

পশ্চিম পাকিস্তানের জমিদার পুঁজিপতিদের সঙ্গে যুক্ত হল ভারতত্যাগী পুঁজিপতিরা। তারা তাদের একচেটিয়া প্রভুত্ব কায়েম করল পূর্বপাকিস্তানে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধু, বালুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাখতুনদের ওপর।

পূর্ববাংলা হল পাকিস্তানের খিড়কি দুয়ার। তার বৈঠকখানা ও বার বাড়ি হল পশ্চিম পাকিস্তান, বিশেষ করে পাঞ্জাব। ওখানেই সব ঠিক হয়। হুকুম জারি করা হয়। পূর্ব বাংলার দরিদ্র মানুষ ইসলামের নামে তা তামিল করে ধন্য হয়। তাদের দুর্নীতিপরায়ণ, স্বার্থপর নেতারা নিজেদের আখের গুছোতেই ব্যস্ত। বাঙালি

মুসলমানের আত্মমর্যাদা, স্বাধিকার ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার কথা ওদের চিন্তাতেই ছিলনা।

পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকচক্র প্রথমেই নজর দিল করাচী বন্দর ও পশ্চিম পাঞ্জাবকে উন্নত করবার কাজে। কারণ এই অঞ্চলটিতেই পাঞ্জাবী জমিদার আর ভারত থেকে আগত ধনিক সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক স্বার্থ ছিল কেন্দ্রীভূত।

পূর্ববাংলার উন্নয়নের দিকে তাদের কোন দৃষ্টি ছিল না। অর্থনৈতিক উন্নয়নের খাতে বরাদ্দ টাকার সিংহভাগ পেল পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাব। এই পক্ষপাতিত্বের সুরু দেশভাগের সময় থেকেই। ১৯৪৮-৪৯ সালের একটি দৃষ্টান্ত। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার উন্নয়ন কর্মের জন্য প্রাদেশিক সরকারগুলোকে যে ঋণ দেন তার শতকরা ৪১৬ ভাগ পায় একা পশ্চিম পাঞ্জাব; ১২ কোটি টাকার মধ্যে ৫ কোটিই তার। দু বছরে পশ্চিম পাঞ্জাব পেল ১০ কোটি টাকা। অথচ পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বসতি পূর্ব বাংলায় দেওয়া হল মাত্র ৮ কোটি টাকা।

পাকিস্তানের বিদেশী মুদ্রা অর্জন করে পূর্ব বাংলার পাট। সেই টাকা ফিরে যায় না ঢাকায়। তা দিয়ে হয় পশ্চিম পাঞ্জাব এবং করাচীর অর্থনীতিক উন্নয়ন। প্রাদেশিক সরকারগুলোকে এভাবেই বঞ্চিত করে কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের বেনামীতে পশ্চিম পাঞ্জাব পরিপুষ্ট হতে লাগল।

অঙ্কের হিসাবে তো বটেই পূর্ব বাংলার মানুষ সবদিক দিয়েই বিমাতার আচরণ পেতে লাগল কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে।

পাকিস্তানের স্রষ্টা মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ মারা গেলেন ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বরে। পাকিস্তানের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করলেন জিন্নাহ্‌র বিশ্বস্ত সহচর প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান।

পূর্ব বাংলার প্রতি তাঁর কোনোদিনই কোনো দরদ ছিল না।

লখনৌর নবাবজাদা লিয়াকত বরং করুণার চোখেই দেখতেন পূর্ব বাংলার মুসলমানদের। তারা না বলে মুসলিম জবান উর্দু, না জানে উত্তর প্রদেশের মুসলিম আদব কায়দা। হিন্দুদের থেকে আলদা করে চেনাই যায় না এদের। নবাবজাদার কষ্ট হবারই কথা।

এদিকে শিক্ষিত বাঙালীরা দেখল যে, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারে তাদের চাকরী বন্ধ। ১৯৫০-৫১ সালে যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসার ছিল ২,৬১৮ জন, তাতে বাঙালী মাত্র ১১৩ জন। অথচ পাকিস্তানের ৫৫ শতাংশ অধিবাসীর বাস পূর্ব বাংলায়।

স্বাধীনতার স্বাদ এমন তেতো হবে তা বুঝতে পারেনি পূর্ব বাংলার মানুষ। যেমন বুঝতে পারেনি সীমান্ত প্রদেশের পাখতুন, আর বালুচিস্তানের বালুচরা।

পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ বলতে পাঞ্জাবি ও কতকাংশে সিন্দী পুঁজিপতি জমিদারদেরই শোষণ তখন কায়েম হয়েছে পাকিস্তানে। বাঙালিরা যেমন স্বাধীন হবার দাবি করছে, পাখতুন, বালুচদেরও দাবি অনুরূপ।

স্বায়ত্তশাসনের দাবি পাকিস্তানে প্রথম তোলেন খান আবদুল গফ্‌ফর খান। পাখতুনদের সঙ্গে কোনো পরামর্শ না করেই দেশ বিভাগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। খান আবদুল গফ্‌ফর খান গোড়াতেই জিন্নাহ্‌কে বলেছিলেন, পাখতুনদের স্বায়ত্তশাসন চাই। ক্ষমতা হাতে পেয়ে জিন্নাহ্‌ সে দাবি প্রত্যাখান করেন।

বালুচিস্তানের নেতা আবদুস সামাদ আচাকাজি এবং আবদুল গফ্‌ফর খান সুরু করেন পাখতুন জাতীয় আন্দোলন। ১৯৪৮ সাল। তাদের নেতৃত্বে গঠিত হয় পিপলস পার্টি, পরে তার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় পিপলস্‌ অর্গানাইজেশন অব্‌ পাকিস্তান। পাকিস্তানের বিভিন্ন জাতি গোষ্টির স্বায়ত্তশাসন হল এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। তাঁরা বললেন, শুধু প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বাণিজ্য, যোগাযোগ ও পরিবহন

থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। বাকী সব ক্ষমতা দিতে হবে প্রাদেশিক সরকারগুলোর নির্বাচিত প্রতিদিধিদের হাতে।

পূর্ববাংলার আওয়ামী লীগ আজ এই দাবিই আরও জোরদার করে তুলেছেন। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানে গনজাগরণ ছিল ক্ষুদ্র অংশে সীমাবদ্ধ। খান আবদুল গফ্ফর খান আজীবন বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামের অগ্রযাত্রী সৈনিক। গান্ধী আন্দোলনের তিনি ছিলেন সহযাত্রী। তাই মুসলিম লীগ নেতারা তাঁকে পাকিস্তানের শত্রু বলে চিহ্নিত করলেন। তাঁর স্থান হল কারাগারে। ষোল বছর তাঁকে কাটাতে হয় পাকিস্তানের জেলে। এখন এই বৃদ্ধ সংগ্রামী নেতা আফগানিস্তানে নির্বাসিত জীবন যাপন করছেন। কোনোদিন পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে হয়তো তিনি স্বদেশে ফিরতে পারবেন। সে আশা এখনও এই বর্ষীয়ান স্বাধীনতা সংগ্রামীর জীবনে সুদূরের স্বপ্ন বলেই মনে হয়।

পূর্ববাংলার অবস্থা তো আরও করুণ। আরও ভয়াবহ।

বাংলাদেশ থেকে আলাদা হয়ে গঠিত হল পূর্বপাকিস্তানে। সঙ্গে সঙ্গে তার নিজস্ব নাম গেল ঘুচে। পশ্চিম বাংলার সঙ্গে যাতে কোনরূপ যোগাযোগ না থাকে তার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানী মুরুব্বিরা সীমান্তে বসালেন পাহারা। দুই বাংলার মাঝখানে ওরা গড়ে তুলল এক অদৃশ্য পাঁচিল। সেই কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সীমান্তের ওপারে সুরু হল পূর্ববাংলার পূর্ণগ্রাস। বাঙালী মুসলিম চেয়েছিল স্বাধীনতা।

তারা পেল পাঞ্জাবীদের শাসন। এই হল বাঙালীর নিজের দেশে পাক স্বাধীনতার স্বাদ।

বুকের রক্ত মাতৃভাষা

॥ ৬ ॥

যে সব বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি ॥
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়,
নিজ দেশ ত্যাগি কেন বিদেশ ন জায়।
মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি
দেশী ভাষা উপদেশ মান হিত অতি।

আবদুল হাকিম, সপ্তদশ শতাব্দীর কবি।

ভাষা নিয়েই প্রথম ভাষা পেল বাঙালীর বিদ্রোহ।

সেই দিনটি বাংলাদেশের ইতিহাসে বাঙালীর রক্তে-রাঙা। একুশে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২। অসন্তোষ ধূমায়িত হচ্ছিল আরও আগেই। পাকিস্তান কায়েম হবার পর থেকেই বাঙালীরা বুঝতে পারল এ এক অন্য দেশ। বাংলা বা বাঙালীর স্থান এতে নেই। থাকলেও মনিবের বাড়িতে নোকরের। অথচ কথা ছিল ইসলামিক রাষ্ট্র পাকিস্তানে সকলেই সমান।

পাকিস্তানের স্রষ্টা গভর্ণর-জেনারেল মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে এলেন ঢাকা সহরে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে তিনি ভাষণ দেবেন। কার্জন হল ভরতি। পাকিস্তান সবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জনগণের মনে প্রচুর উৎসাহ কায়েদে আজম কী বলেন তা শোনবার জন্য। সমাবর্তন বক্তৃতায় জিন্নাহ্ অনেক কথার মধ্যে একটি কথা বললেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা

বিষয়ে। ' প্রসঙ্গটি নিয়ে ইতিমধ্যেই পূর্ব বাংলায় আলোচনা শুরু হয়েছে।

জিন্নাহ্ চাইলেন তাঁর ক্ষমতা ও ব্যক্তিত্বের ভার দিয়ে এই প্রসঙ্গের চূড়ান্ত ফয়সালা করে দিতে।

তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে বললেন, ···There could be only one lingua franca for Pakistan and that language should be Urdu. Ultimately, it is for you, the people of this Province, to decide what shall be the language of your Province. But let me make it very clear to you that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language." এর মর্মার্থ হল পাকিস্তানে একটিই মাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে এবং সে ভাষা হবে উর্দু। এই প্রদেশের ভাষা কী হবে তা আপনারা ঠিক করবেন। কিন্তু আমি পরিষ্কার ভাবে একথা বলে যেতে চাই যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, অন্য কোনো ভাষা নয়।

সভাস্থল নীরব। সকলেই উৎকর্ণ হয়ে শুনছেন কায়দে আজকের বাণী। হঠাৎ জনসভার একাংশ থেকে প্রতিবাদ উঠল: উর্দু নয় বাংলা। বাংলাই রাষ্ট্রভাষা হবে।

রুগ্ন, বৃদ্ধ এবং ক্ষমতাভিমানী জিন্নাহ্ এই অপ্রত্যাশিত বাধা পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। পাকিস্তানে তাঁর মুখের ওপর কেউ কথা বলতে পারে এ ছিল তাঁর কল্পনাতীত। তিনি ভাষণ অসমাপ্ত রেখে হল ছেড়ে চলে গেলেন গভর্ণর-জেনারেলের প্রাসাদে।

বাংলাদেশে বিদ্রোহের বীজ সেদিনই বোনা হল ঢাকায়, পাকিস্তানের মালিক মহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌র নাকের ডগায়।

এর আগেই করাচীতে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় আইনসভায়, যা তখন গণপরিষদ হিসাবেও কাজ করছিল, পূর্ববাংলার সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র নাথ দত্ত একটি সংশোধন প্রস্তাব এনে দাবি করেছিলেন, উর্দু ও

ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাকেও আইনসভায় ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হক। পাকিস্তানে বাঙালীর সংখ্যাই বেশি। তা সত্ত্বেও এর জন্য অনুমতি চাইতে হল। নবাব জাদা লিয়াকৎ আলি খান তখন প্রধানমন্ত্রী। তিনি জবাব দিলেন, পাকিস্তান হল একটি মুসলিম রাষ্ট্র। তার রাষ্ট্রভাষাও হতে হবে একটি মুসলিম ভাষাকেই। সেই ভাষা উর্দু ছাড়া আর কিছু হতে পারেনা। তাজ্জব হবারই কথা। ভাষাতেও কি ধর্মের ছাপমারা আছে? উর্দু যদি মুসলিমদের ভাষা হয়, পূর্ববাংলার সাড়ে সাত কোটি মুসলিমের মাতৃভাষা বাংলা তবে কাদের ভাষা?

উর্দুই কি পাকিস্তানের ভাষা? এই ভাষা ভারতের উত্তরাঞ্চলের ভাষা। দিল্লি ও উত্তর প্রদেশেই এর প্রচলন। পাকিস্তানে খুব সামান্য লোকই বুঝত উর্দু ভাষা। কিন্তু মুসলিমলীগের নেতারা অধিকাংশই গিয়েছিলেন উর্দুভাষী ভারতীয় এলাকা থেকে। ক্ষমতার তক্তে ওরা বসলেন প্রধান পাঞ্জাবি বড়লোক, পুঁজিপতি জমিদারদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে। বাংলাদেশের মুসলিমদের ওরা প্রকৃত মুসলমান বলেই মনে করতেন না। ওদের ভাবা হত পাঠান আমলে ধর্মান্তরিত হিন্দুদের বংশধর। বাংলাভাষার সঙ্গে সংস্কৃতের যোগাযোগ রয়েছে, এ তথ্য জানবার পর থেকেই মুসলিম লীগ নেতারা ঠিক করলেন যে, হিন্দু প্রভাব থেকে পূর্ব বাংলার মুসলিমদের মুক্ত করার পথ হল তাদের জবান কেড়ে নেওয়া। বাংলার বদলে উর্দুই হবে সে জবান।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর তার বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠির সংখ্যা ছিল এই রকম।

বাংলা : ৫৪·৬% ; পাঞ্জাবি : ২৭·১% ; উর্দু ৬% , পুশ্‌তো : ৬·১% , সিন্ধি : ৪·৮% , ইংরেজি : ১·৪%

সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষার স্থান হল না পাকিস্তান আইন সভায়। গণপরিষদের মূলনীতি কমিটির সুপারিশ হল উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। বাংলাদেশ ক্ষোভে ক্রোধে ফেটে পড়ল। পাকিস্তানের

প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি ঢাকার জনসভায় ঘোষণা করলেন, মূলনীতি কমিটির সুপারিশই গৃহীত হবে। বাংলার কোনো স্থান নেই।

নাজিমুদ্দিন নিহত লিয়াকতের তক্তে আরোহণ করে বাংলাদেশ ও বাংলাভাষার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। পূর্ব বাংলার মানুষ এই বিশ্বাসঘাতকতায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা হরতালের ডাক দিলেন। বাংলাভাষার জন্য সংগ্রাম চালাবার উদ্দেশ্যে গঠিত হল সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি। পূর্ব-বাংলার সর্বত্র প্রস্তুতি চলল বাংলাভাষার স্বীকৃতির জন্য আন্দোলনের। মৌলানা ভাসানী পাশে এসে দাঁড়ালেন ছাত্রদের। সিদ্ধান্ত হল বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি না দেওয়া পর্যন্ত চলবে সংগ্রাম। ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ তারিখে সারা পূর্ব-বাংলায় ডাক দেওয়া হল সর্বাত্মক হরতালের।

পাকিস্তান সরকার ও তার মুসলিম লীগ নেতারা বুঝতেই পারেননি বাংলাভাষার জন্য পূর্ব-বাংলার মুসলিমরা কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে। তারা ভেবেছিলেন, এ হল ভাবপ্রবণ মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মানুষ আর ছাত্রদের বিক্ষোভ। মনে সন্দেহ ছিল, এর পেছনে হিন্দু বুদ্ধিজীবীদেরও উস্কানি আছে।

কিন্তু না। আলাওল, নজরুল, রবীন্দ্রনাথের ভাষা বাঙালী হিন্দু ও মুসলিমের সাধারণ সম্পত্তি, গৌরবজনক উত্তরাধিকার। ভাষা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছেই আদরনীয়। মাতৃভাষার প্রতি আঘাত বা অবমাননায় ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই বিক্ষুব্ধ হয়। সরকার আগে থেকেই সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা নিলেন। ঢাকায় তখন প্রাদেশিক আইনসভায় বাজেট অধিবেশন। ঢাকা জেলার সর্বত্র ১৪৪ ধারা জারী করে সভাসমিতি ও মিছিল নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল একমাসের জন্য। আগুনে যেন ঘি পড়ল সরকারের এই আদেশে। সমাজের যে সমস্ত শ্রেণী দ্বিধাগ্রস্ত ছিল কিংবা এই আন্দোলনকে এতটা গুরুত্ব দিয়ে দেখেনি তারাও এসে সামিল হল ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে।

সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির প্রবীন নেতাদের মধ্যে দেখা দিল দ্বিধা। সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করা হবে কিনা। তারা চাইছিলেন একটা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন। আবেদন নিবেদনে যতটা হয়। কমিটির বৈঠকে যুবলীগের নেতা ওলি আহাদ এক দৃপ্তভাষণে বললেন, এখন পশ্চাদপসরণের অর্থ হবে সরকারের দমননীতির কাছে নতি স্বীকার যা জনগণের প্রতি হবে চরম বিশ্বাসঘাতকতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এসে জানালেন তারা হরতাল পালনের সিদ্ধান্তে অটল। সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত নিলেন তার বিপরীত অর্থাৎ ১৪৪ ধারা আদেশ অমান্য করে ২১ ফেব্রুয়ারি কোনো মিছিল বার করা হবেনা।

সংকট সময়ে নেতারা যখন পিছিয়ে পড়েন জনতা থেকেই তখন নেতার আবির্ভাব হয়।

স্মরনীয় একুশে ফেব্রুয়ারির সকাল হল। ঢাকা শহরের আবহাওয়া থমথমে। স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল হয়ে গেল। বেলা সাড়ে বারোটায় সভা বসল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। ভাষা আন্দোলনের পটভূমিকা ব্যাখ্যা করে বক্তৃতা দিলেন ছাত্রনেতারা। সভার শেষে মিছিল করে বেরোল ছাত্ররা। দাবি নিয়ে যাবে বিধানসভা ভবনে। সঙ্গে-সঙ্গে পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ল। সরকারী নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে কোনো মিছিল রাজপথে তারা বেরোতে দেবেনা। সুরু হল খণ্ডযুদ্ধ। শত শত ছাত্র গ্রেপ্তার হল। তাদের পুলিশের গাড়িতে করে সরিয়ে নেওয়া হল। কিন্তু এতো অগনন জনগণ। এর শেষ নেই। লাঠি, কাঁদানে গ্যাসে যখন কাজ হল না পুলিশ গুলী ছুড়ল। বেলা তখন সাড়ে তিনটা। গুলীতে উনিশজন মিছিলকারী রাস্তায় লুটিয়ে পড়লেন। দুজন ছাত্র—আবদুল জববার ও রফিউদ্দীন আহমেদ ঘটনাস্থলেই মারা গেলেন।

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাবার পর রাত আটটায় মারা গেলেন আবুল বরকত।

বাংলাভাষার তিন শহীদ। বুকের রক্ত দিয়ে মাতৃভাষার ঋণ শোধ করলেন মৃত্যুঞ্জয়ী বীর তরুণের দল।

পূর্ববাংলার মুক্তিসংগ্রামের অগ্রযাত্রী এই শহীদগণ। পাকিস্তানী অপশাসনের মৃতুবীজ উপ্ত হল তিনটি বাঙালী তরুণের তাজা রক্তে। বাংলার স্বাধীনতার আকাঙ্খাকে তাঁরাই ভাষা দিয়ে গেলেন। পূর্ব-বাংলার মানুষ বুঝতে পারলেন এ কোন রাষ্ট্রযন্ত্রের নাগপাশে তারা আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন—এর থেকে মুক্তির পথ যে শহীদের রক্তে রঞ্জিত এ সত্য উদঘাটিত হল তাদের সামনে।

বিধানসভার ভিতরে তখন সেই হত্যা সংবাদ নিদারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনের কাছে বিরোধী পক্ষের সদস্যরা দাবি জানালেন এই বর্বরতার কারণ কি? কেন তাজা তরুণের রক্তে এভাবে ভাসিয়ে দেওয়া হল ঢাকার রাজপথ?

বিরোধী দলের সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন ধর স্পিকারকে অনুরোধ করলেন বিধানসভার অধিবেশন মুলতুবী রেখে সদস্যদের যেতে দেওয়া হক নিপীড়িত ছাত্রদের কাজে। তারা আমাদেরই সন্তান, তাদের কেন হত্যা করা হচ্ছে? তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কৈফিয়ৎ দাবি করলেন। নুরুল আমিন অবিচলিত কণ্ঠে জবাব দিলেন, আমাদের আবেগে চালিত হওয়া উচিত নয়। মুখ্যমন্ত্রীর এই হৃদয়হীন উক্তিতে বিধানসভায় মুসলিম লীগ সদস্যরাও ক্ষুব্ধ হলেন। বর্ষীয়ান মুসলিম লীগ সদস্য মৌলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশ দাঁড়িয়ে উঠে উত্তপ্ত কণ্ঠে বললেন: বাইরে যখন আমাদের ছাত্রদের হত্যা করা হচ্ছে তখন আমার পাখার তলায় আরামে এখানে বসে থাকব—এ আমি সহ্য করতে পারছিনা। এই বলে তিনি বিরোধী কংগ্রেস সদস্যদের সঙ্গে বিধানসভা ত্যাগ করে বেরিয়ে যান।

মৌলানা তর্কবাগীশ মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে ছাত্রদের জানালেন, তিনি বাংলাভাষার এই আন্দোলন সম্পূর্ণ সমর্থন করেন। নুরুল আমিন ভয় পেয়ে গেলেন। কারণ তাঁর দলের অনেক সদস্যই

বিরোধীদের সারিতে গিয়ে বসছিলেন। গুলী চালনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তিনি বিধানসভায় এক প্রস্তাব পাশ করে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেবার জন্য কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারকে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু অত্যাচার কমল না একটুও। পরদিন ২২ ফেব্রুয়ারি আবার বিক্ষোভ মিছিলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পাকিস্তানী পুলিশ। ছাত্রদেশ তারা শিক্ষা না দিয়ে ছাড়বেনা। আরও ছ'জন নিহত হলেন। বেসরকারী হিসাবে এই আন্দোলনে নিহতের সংখ্যা ৩৯।

ভাষা আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল বহু লোককে নুরুল আমিন সরকার গ্রেপ্তার করে জেলে পুরলেন। গ্রেপ্তার হলেন মনোরঞ্জন ধর, গোবিন্দলাল ব্যানার্জি, আবুল হাসেম, খয়রাত হুসেন ও মৌলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুনির চৌধুরী, পুলিন দে, মুজাফ্‌ফর আহমেদ, পৃথ্বীশ চন্দ্র চক্রবর্তী ও অজিত গুহকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল মুসলিম লীগ সরকারের পুলিশ। আরও ক'দিন পর গ্রেপ্তার হলেন আত্মগোপনকারী ছাত্রনেতা ওলি আহাদ, মহম্মদ তোয়াহা ও আবদুল মতিন।

কিছুই করতে পারলনা অত্যাচারী সরকার। মুসলিম লীগের অপশাসনের সমাধি রচিত হল উনিশশো বাহান্ন সালের এই ঘটনা থেকেই। একুশে ফেব্রুয়ারি হয়ে উঠল পূর্ব বাংলার জাতীয় সংগ্রামের রক্ত রাঙা দিন। একুশে ফেব্রুয়ারির সংগ্রামী চেতনাই ১৯৩৯ সালে বাংলাদেশকে স্বতন্ত্র স্বাধীন সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র ঘোষণার শক্তি জুগিয়েছে।

পূর্ব বাংলার কবির কণ্ঠেই শুনি বাংলাভাষার জয়গান ঃ

বিধাতা কি কখনো বলেছেন তোমাকে
তোমার ঐশ্বর্য নেই তবুও তাতেই
তোমার সকল শান্তি, মঙ্গল, কল্যাণ।

তবে কেন মা আমার,
সেই দিন তোমার ভাষায়
কথা কইতে শেখালে, এবং
অকুণ্ঠ নির্দেশ দিলে প্রাণ দিতে তোমার সম্মানে ?

[আমার মাকে : জিন্না হায়দার]

এ হল সূত্রপাত বাংলাদেশের নবজাগরণের। পাকিস্তান সৃষ্টির পর পাঁচ বছর বাংলার মানুষ, মধ্যবিত্ত, কৃষক ও শ্রমিক অপরিসীম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতায় অপেক্ষা করেছে। তারা চেয়েছিল ভাষার স্বীকৃতি, পেয়েছে বুলেট। চেয়েছে শিক্ষা, চাকরী, খেটে-খাওয়া মানুষের প্রাপ্য অধিকার। পশ্চিম পাকিস্তানীরা সব দিক দিয়ে তাদের বঞ্চিত করেছে। যখনই বাঁচবার দাবি তুলেছেন তারা তখনই পশ্চিম পাকিস্তানীদের এক জবাব, ইসলাম বিপন্ন, পাকিস্তানের সংহতি বিপন্ন।

বাঙালীরা বুঝতে পারল পাকিস্তানের সংহতির নামে পূর্ববাংলাকে সম্পূর্ণ কবলিত করেছে পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজিপতিরা এবং এই পুঁজিপতিরাই তখন এসে ভীড় করেছে মুসলিম লীগে সম্পদের বাঁটোয়ারার আশায়। পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পপতিরা এসে দখল করল পূর্ববাংলার পাটের বাজার। এই পাট পূর্ববাংলার প্রধান সম্পদ। পাকিস্তানের প্রধান পণ্য যা দিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। নারায়নগঞ্জে তৈরী হল আদমজী জুট মিল। চট্টগ্রামে তৈরী হল কর্নফুলি পেপার মিল। মুলধন পশ্চিম পাকিস্তানের। পূর্ববাংলার সম্পদ পাচার হতে লাগল নিঃশব্দে।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর বাঙালী মুসলিমদের মধ্যে ধীরে ধীরে গড়ে উঠল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। অবিভক্ত বাংলার অগ্রসর হিন্দুদের সঙ্গে তারা প্রতিযোগিতায় পেরে উঠত না। শিক্ষার প্রসারও ছিল তুলনায় কম। পাকিস্তান সৃষ্টির পর নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনায় মুসলিম বাঙালী এলেন কলেজের ইউনিভারসিটিতে। গড়ে উঠল

তারুণ্যদীপ্ত এক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। তারা পাকিস্তানের নাগরিক হিসেবেই চেয়েছিলেন জীবনের পূর্ণতা। কিন্তু দেখলেন যে, পাকিস্তানেও তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর পাকিস্তানী। বাঙালী বলে তাদের দেখা হয় সন্দেহের চোখে। এমন কি তাদের মুখের ভাষাও নিতে চেয়েছিল কেড়ে।

শহীদের রক্তদানে তাদের ভাষার স্বীকৃতি আদায় হল। কিন্তু কোথায় রাজনৈতিক মুক্তি? কোথায় বা অর্থনৈতিক শোষনের অবসান? একই সময়ে ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীন হল। ভারত স্বাধীনতা অর্জনের তিনবৎসরের মধ্যে নতুন সংবিধান রচনা করল। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি সেই সংবিধান প্রবর্তিত হল। ভারত হল একটি গনতান্ত্রিক সাধারনতন্ত্র। পাকিস্তানে সেই আশা পূরণ হল না। জনসাধারণের বাংলা দেশ এবার সুরু করল রাজনৈতিক অধিকার ও গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।

ভাষা অন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ববাংলার গণতান্ত্রিক শক্তি, ঐক্যবদ্ধ হল এবং তরুণ সমাজের সুপ্ত ও অনাবিষ্কৃত শক্তির হল জাগরণ। বাহান্ন সালের ভাষা আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক অবদান হল এই।

পাকিস্তানে কায়েমী স্বার্থের বাহক, রক্ষণশীল সাম্প্রদায়িক মুসলিম লীগ রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আঘাত এল পূর্ববাংলা থেকেই। আমরা এবার সেই ইতিহাসের দিকেই দৃষ্টি ফেরাব।

যুক্তফ্রণ্ট ও ফজলুল হকের প্রত্যাবর্তন

॥ ১ ॥

বাঙালী এক অখণ্ড জাতি, তারা একই ভাষায় কথা বলে, তাদের আদর্শ এক, জীবনের উদ্দেশ্য এক এবং জীবন ধারণের পদ্ধতিও এক। দেশ বিভাগ সত্ত্বেও দুইবাংলা মিলিতভাবে সারাদেশকে পথ দেখাতে পারে।

মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক, কলকাতায় বক্তৃতা, ১৯৫৪।

বাংলা দেশের রাজনীতিতে বরিশালের মৌলবী আবুল কাশেম ফজলুল হক এক বিশ্রুতকীর্তি পুরুষ। অবিভক্ত বাংলার তিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন দীর্ঘকাল। মুসলিম লীগের অভ্যুত্থানের পর তিনি বিদায় নেন।

আবার তাঁকে দেখা গেল এক যুগ পর রাজনীতির পুরোভাগে। এবার কলকাতায় নয় ঢাকায়। অবিভক্ত বাংলাদেশে নয়, বিভক্ত পূর্ব-বাংলায় যার এখানকার নাম পূর্ব-পাকিস্তান। ফজলুল হক তখন অশীতিপর বৃদ্ধ। কিন্তু তেমনি প্রাণবন্ত, দিলখোলা, দরদী এবং সাধারণ মানুষের বন্ধু।

কীভাবে তার রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন হল সে এক স্মরণীয় ইতিহাস। বাংলাদেশের ভাগ্যপরিবর্তনের সূচনায় তিনি পূর্ব-বাংলায় ক্ষমতায় এলেন যুক্তফ্রণ্টের নেতা হিসাবে, মুসলিম লীগের শোকহীন সন্তাপহীন রাজনৈতিক মৃত্যুর পর। জিন্নাহ্‌র মৃত্যুর পর ঢাকার খাজা নাজিমুদ্দিনকে গভর্ণর জেনারেলের পদ দেওয়া হয়। ১৯৫১সাল পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎআলি খান আততায়ীর হাতে নিহত হলে নাজিমুদ্দিন হন প্রধানমন্ত্রী। গোলাম মহম্মদ হলেন গভর্ণর জেনারেল।

জিন্নাহ্ নেই, লিয়াকৎআলিকেও সরানো হল। পাকিস্তানে দেখা দিল নেতৃত্বের সংকট। মুসলিম লীগ তার পুরনো নাম ভাঙিয়ে পাকিস্তানের মানুষকে বিভ্রান্ত করতে লাগল। নাজিমুদ্দিন্ ছিলেন বৃটিশ আমলের নাইট। স্বভাবতই বৃটিশ-ঘেঁষা নীতি ছিল তাঁর। এ-দিকে দুনিয়াতে মার্কিন আধিপত্য প্রসারের যুগ তখন। পাকিস্তানের দিকেই তাদের নজর। কারণ নেহরুর নেতৃত্বে ভারত এখন জোট-নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করে চলেছে।

নাজিমুদ্দিনকে বরখাস্ত করলেন গুলাম মহম্মদ। তাঁর জায়গায় প্রধানমন্ত্রী করে আনা হল আমেরিকার পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত বগুড়ার মহম্মদ আলিকে। তিনি বাঙালী বটে। কিন্তু সেটা শুধু পূর্ব-বাংলার মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য।

বাংলাদেশ কিছুই পেলনা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে শুধু প্রতিশ্রুতি ছাড়া। কৃষিপ্রধান পূর্ব বাংলার কৃষি-সমস্যার কোনো সমাধান করতে পারেনি পাকিস্তান সরকার। খাদ্যের অভাব, কৃষিপণ্যের মূল্যহ্রাস, মহাজন ব্যবসায়ীদের ফাটকাবাজী পূর্ব-বাংলার কৃষকদের অবস্থা দুঃসহ করে তুলল। বাঙালী তাঁতীদের অবস্থাও হয়ে উঠল করুণ। কারণ তাদের তুলার যোগান নেই।

পুঁজিপতিদের প্রতিনিধি পাকিস্তান সরকার বাংলার শ্রমিক কৃষকদের এই জীবন-ধারণ সমস্যার দিকে কোনো নজরই দিল না। বেকারি, অর্ধবেকারদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে লাগল।

পাকিস্তান সরকারের নীতি ছিল প্রথমে পশ্চিম পাকিস্তানকে ধনে সম্পদে মজবুত করে তোলা। এই সংকট সময়েও ১৯৪৮-১৯৫৩ সালের মধ্যে পূর্ববাংলা বৈদেশিক পণ্য রপ্তানী থেকে আয় করল ২,৯০০০ লক্ষ টাকা। এই টাকার অধিকাংশই দেওয়া হল পশ্চিম পাকিস্তানের বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতি মেটাতে। প্রতিবৎসর ত্রিশ কোটি টাকা পূর্ববাংলা থেকে নিয়ে যাওয়া হত পশ্চিম পাকিস্তানের সমৃদ্ধির জন্য।

পূর্ব-বাংলায় যখনি কোনো শিল্পকারখানা খোলার অনুমতি দেওয়া

হত তখনি তার লাইসেন্সটি পেত পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পপতিরা। পূর্ব-বাংলার প্রধান পণ্য ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী পাটের কলের মালিক হল পশ্চিম পাকিস্তানের আদমজী ও ইস্পাহানী।

পূর্ববাংলা যেমন ছিল তেমনি রয়ে গেল—একটি অনগ্রসর কৃষি-প্রধান এলাকা। এখান থেকে কাঁচামাল নিয়ে পাকিস্তানীরা বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করত এবং পশ্চিম পাকিস্তানে তৈরী পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের বাজার হিসাবে ব্যবহার করা হত পূর্ব-বাংলাকে।

পশ্চিম পাকিস্তানী বুর্জোয়া শাসকগোষ্ঠি ও জমিদাররা চাইত না যে বাংলাদেশের জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি হক। পূর্ব-বাংলায় তারা নিজেদের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠায় ছিল ব্যগ্র। এবং এই কাজে তারা কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে জমি, ঋণ ও কর মকুব পেয়ে সহজেই বাঙালীদের কোণঠাসা করে ফেলল।

বাঙালী নিজ বাসভূমে হল পরবাসী।

চাকুরীতেও বাঙালীদের প্রতি দেখানো হত বৈষম্য। পশ্চিম-পাকিস্তানে তো বটেই, পূর্ব-বাংলাতেও পদস্থ প্রায় সমস্ত অফিসারই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী, অর্থাৎ পাঞ্জাবী। পাঞ্জাবিরা পূর্ব-বাংলায় বদলি হলে এমন উন্নাসিক ভাব দেখাত যে, তাদের যেন নির্বাসনে পাঠানো হচ্ছে।

দেশভাগের সময় অবিভক্ত ভারতের সিভিল সার্ভিসে মাত্র একজন পূর্ব-বাংলার মুসলিম অফিসার ছিলেন। পাকিস্তান হবার পর সিভিল সার্ভিসে পাকিস্তানের দুই অংশে কোটা প্রথা থাকা সত্ত্বেও ন'বছরের মধ্যে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসে পূর্ব-বাংলার ছিল মাত্র ৩ জন জয়েণ্ট সেক্রেটারি, ১০ জন ডেপুটি সেক্রেটারি, ৩৮ জন আণ্ডার সেক্রেটারি। সে তুলনায় পশ্চিম-পাকিস্তানের ভাগ্যে ছিল ৩৮ জন জয়েণ্ট সেক্রেটারি, ১২৩ জন ডেপুটি সেক্রেটারি, এবং ৫১০ জন আণ্ডার সেক্রেটারি।

পাস্তিকান গণপরিষদে ক্ষোভ প্রকাশ করে বাংলার সদস্য আতাউর রহমান বললেন, মুসলিম লীগের নেতারা মনে করেন আমরা হলাম প্রজা আর ওরা হলেন রাজার জাতি।

মুষ্টিমেয় খয়ের খাঁ বাঙালীকে ওরা নিয়ে গিয়ে মন্ত্রী করলেন, প্রধানমন্ত্রীও করলেন। কিন্তু তাতে সাধারণ বাঙালীর দুঃখের অবসান হল না। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানেও বাঙালী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ করতপশ্চিম পাকিস্তানী মালিকরা। পশ্চিম-পাকিস্তানের কর্মচারীরা একই কাজের জন্য বাঙালী সহকর্মীদের চাইতে দু-তিন গুণ বেশি মাইনে পেত।

এর কোনো প্রতিকার করলনা মুসলিম লীগ সরকার। তারা জানত জনতার কাছে গেলে তারা প্রত্যাখ্যাত হবে। তাই সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের নামগন্ধও আনলেন না মুসলিম লীগ নেতারা। আইনসভার মেয়াদ বাড়িয়ে তারা অবিভক্ত বাংলার আইনসভার সদস্যদের নিয়েই দেশ শাসন করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল ১৯৫৪ সালে সাধারণ নির্বাচন হবে। পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন।

মুসলিম লীগের হাত থেকে শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে না নিলে বাংলাদেশের মুক্তি নেই—একথা বিরোধীরা বুঝলেন। ১৯৫৪ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী বাংলা ভাষার অমর শহীদদের স্মরণ দিবসে গঠিত হল সর্বদলীয় ব্লক। মুসলিম লীগ সরকারের অপশাসনের বিরুদ্ধে বিরাট বিক্ষোভ মিছিল সেদিন সংগঠিত হয়েছিল সারা বাংলায়। মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ডাক দিলেন পাকিস্তানের সামরিক জোটবদ্ধতার বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হতে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের জনগণকে, বিশেষ করে পূর্ব-বাংলার জাগ্রত জনতাকে তিনি প্রতিবাদ করতে বললেন।

নির্বাচনের মুখে ঐক্যবদ্ধ ফ্রণ্ট গঠনের জন্য ভাসানীর আওয়ামিলীগ ও ফজলুল হকের কৃষক শ্রমিক পার্টি শুরু করলেন আলোচনা।

অন্যান্য দল ও এসে যোগ দিল আলোচনায়। গঠিত হল যুক্তফ্রণ্ট। যুক্তফ্রণ্টের অন্যান্য সদস্য হল নিজাম-ই-ইসলাম পার্টি, বামপন্থী গণতন্ত্রী দল, পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস, তপশীলী জাতি ফেডারেশন। কমিউনিষ্ট পার্টি প্রকাশ্যে ফ্রণ্টে যোগ দিতে না পারলেও পূর্ণ সমর্থন জানাল যুক্তফ্রণ্টকে। যুক্তফ্রণ্টের নেতা নির্বাচিত হলেন ফজলুল হক। তিনি ছিলেন পূর্বপাকিস্তানের এ্যাডভোকেট-জেনারেল। সেই পদ ত্যাগ করে তিনি ভাসানী-সুরাওয়ার্দির সঙ্গে হাত মিলিয়ে নামলেন নির্বাচনে।

১৯৫৪ সালের এই নির্বাচনে মুজিবর রহমান ছিলেন একজন তরুণ কর্মী এবং প্রার্থী। সুরওয়ার্দির অনুগামী হিসেবে তিনি তখনই আওয়ামি লীগের একজন তরুণ নেতা। সতেরো বছর পর তিনিই হলেন বাংলাদেশের মুখ্যনেতা, গণ-মুক্তিফৌজের সংগঠক, স্বাধীন বাংলা সরকারের প্রধান। যুক্তফ্রণ্টের একুশ দফা কর্মসূচীর প্রথমেই ছিল বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দানের প্রতিশ্রুতি। লাহোরের পাকিস্তান প্রস্তাব অনুযায়ী (১৯৪০ সালে যে প্রস্তাবের উত্থাপক ছিলেন ফজলুল হক) পূর্ব বাংলাকে সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যে পরিণত করার প্রতিশ্রুতিও ছিল। পরবর্তীকালে মুজিবরের ছ' দফা কর্মসূচীতে এটিই প্রায় সর্বাধিক প্রাধান্য। কারণ বাংলার মানুষ বুঝতে পেরেছিল যে, স্বায়ত্তশাসন ছাড়া তার মুক্তি নেই।

যুক্তফ্রণ্টই বাংলাদেশের প্রথম সুসংহত রাজনৈতিক প্রতিবাদ পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণের বিরুদ্ধে। ১৯৫১ সালে যে অভ্যুত্থান গণ মুক্তিফৌজের জন্ম দিয়েছে ১৯৫৪ সালে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সম্মিলিত শক্তি শাসনতান্ত্রিক উপায়ে পশ্চিম পাকিস্তানের মোকাবিলা করেছিল সেই গণজাগণেরই চাপে। মুসলিম লীগ বাংলাদেশকে সর্বনাশের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, এ বোধ জাগ্রত হয়েছে তখন বাংলাদেশের মানুষের মনে। এই শাসকশক্তিকে

বাংলার মাটি থেকে সম্পূর্ণ উৎখাত করতে না পারলে বাংলার মুক্তি নেই।

মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ফজলুল হক ছাড়া তখন দৃপ্ত চ্যালেঞ্জ সেদিন আর কে দিতে পারতেন ?

১৯৫৪ সাল পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে একটি জলবিভাজিকা রেখা। পাকিস্তান রাজনীতির অবসানকল্পে বাংলার জনগণমুখী রাজনীতির সেদিন জয়যাত্রা শুরু।

নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট শুধু বিজয়ীই হলনা, মুসলিম লীগের নাম প্রায় মুছে গেল বাংলাদেশের মাটি থেকে। বিধানসভার ৩১০টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট পেল ২১৮। মুসলিম লীগ, পাকিস্তানের হাসিলদার, একচ্ছত্র শাসকপার্টি, পেল মাত্র ৯টি আসন। মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন ময়মন সিংহে তাঁর নিজের নির্বাচনী কেন্দ্রে ২৫ বছরের যুবক খালেক নওয়াজের হাতে পরাজিত হলেন। তাঁর মন্ত্রিসভার সমস্ত মন্ত্রী পরাজিত। ১৯৩১ সালে মধ্যবর্তী নির্বাচনে পশ্চিম বাংলার যুক্তফ্রন্টের জয়ের সঙ্গেই একমাত্র তুলনা চলে ১৯৫৪ সালের এই বিজয়কে। এখানেও শাসক পার্টি বিরোধী পুঞ্জীভূত ক্ষোভ যুক্তফ্রন্টকে এক আশ্চর্য সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপহার দিয়েছিল। যদিও যুক্তফ্রন্টের শরিকরা সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্মান রক্ষা করতে পারেনি।

যুক্তফ্রন্টের মধ্যে ভাসানী-সুরাওয়ার্দির আওয়ামি লীগ পেল ১৪২ আসন, ফজলুল হকের কৃষক শ্রমিক পাটি ৪৮, নিজাম-ই-ইসলামি ১৯টি আসন। এই প্রথম এবং শেষবারের মতো পাকিস্তানে কমিউনিষ্ট পার্টি ৪টি আসন পেল সংখ্যালঘুদের নির্বাচন কেন্দ্র থেকে।

ফজলুল হককে মন্ত্রিসভা গঠন করতে না দেবার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানী সরকার চাপ দিল পূর্ব বাংলার গভর্ণর চৌধুরী খালিকুজ্জমানকে। খালিকুজ্জমান শাসনতন্ত্র বিরোধী কোনো কাজ করতে অস্বীকার করলেন। হক মন্ত্রিসভা গঠিত হল ৩ এপ্রিল,

১৯৫৫। যুবক মুজিবর রহমান সেই মন্ত্রিসভার একজন মন্ত্রী ছিলেন।

যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা বিভিন্নদল নিয়ে গঠিত বলে তা কোনো বৈপ্লবিক কর্মসূচী নিতে পারেনি। কিন্তু বাংলাদেশে বাঙালীরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এই প্রথম একটি মন্ত্রিসভা পেল যা পশ্চিম পাকিস্তানের তাঁবেদার নয়।

পশ্চিম পাকিস্তান সরকার, তাদের অনুগত অফিসার এবং বাংলাদেশে বসবাসকারী পশ্চিম পাকিস্তানীরা গোড়া থেকেই এই মন্ত্রিসভা বানচালের জন্য ষড়যন্ত্র সুরু করে। ইয়াহিয়া খাঁ ১৯৩১ সালে যা করলেন তা নতুন কিছু নয়। পশ্চিম পাকিস্তানীরা ১৯৫৪ সালেই বাঙালী মন্ত্রিসভাকে ধ্বংস করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল।

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সরকার জনগণের কল্যাণে কাজ করুক, পশ্চিম পাকিস্তানের তা ঈপ্সিত ছিলনা। বাংলার সম্পদ লুণ্ঠন যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য তারা ঢাকায় চায় একটি তাঁবেদার পুতুল মন্ত্রিসভা। যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভাকে কি তারা বরদাস্ত করতে পারে?

ফজলুল হক ঘোষণা করলেন, তাঁর মন্ত্রিসভার প্রথম কাজ হবে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া। সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেবার প্রতিশ্রুতি তিনি কার্যকর করবেন। পাকিস্তানী শাসকদের হাতে বাংলার সংগ্রামী সন্তানরা ১৯৪৭ সাল থেকে কারাগারে দুঃসহ জীবন যাপন করছিলেন। যুক্তফ্রণ্টের একুশ দফা কর্মসূচীতে তাদের মুক্তিদানের প্রতিশ্রুতি ছিল।

বাংলা পাকিস্তনের রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি পেল ১৯৫৪ সালের ১৯ এপ্রিল। হক সাহেব বললেন, সাধারণ মানুষের স্বার্থে তিনি দুই বাংলার মধ্যে ভিসা প্রথা তুলে দেবেন। কারণ সীমান্ত বন্ধ থাকার ফলে পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক ক্ষতি হচ্ছে। পাটচাষীদের অভিযোগ প্রতিকারের জন্য তিনি অবিলম্বে পাটশিল্প সম্পর্কে ব্যাপক তদন্তের কথাও ঘোষণা করলেন।

বাংলার এই গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক সরকারের কর্মসূচী ঘোষণা পশ্চিম পাকিস্তানেও গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন মানুষদের আন্দোলিত করল। তারা দাবি করলেন, অপ্রতিনিধিমূলক গণপরিষদ ভেঙে দিয়ে প্রাপ্তবয়স্কের সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নতুন গণপরিষদ গঠন করা হক। অবিলম্বে মুসলিমলীগ সরকার বাতিল করে সারা দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক।

আওয়ামি লীগের পশ্চিম পাকিস্তানী নেতা মানকি শরিফের পীর বললেন, পূর্ব বাংলায় সাধারণ নির্বাচন দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অনাস্থা প্রকাশ করেছে সেটা পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থার ওপর। আজাদ পাকিস্তান পাটির জননেতা মিঞা ইফতিকার উদ্দীন দাবি করলেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে একটি সর্বদলীয় অস্থায়ী সরকার গঠন করা হোক সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসেবে।

সীমান্তের লালকোর্তা দল এবং সিন্ধুর প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলোও একই দাবি করলেন। পদত্যাগ চাই মুসলিম লীগ সরকারের।

বাংলার 'লাল' মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী পাকিস্তানের উভয় অংশের প্রগতিশীল শক্তির কাছে আবেদন জানালেন একটি বৈঠকে মিলিত হয়ে দেশের শত্রুদের ক্ষমতা থেকে অপসারণের সম্মিলিত কার্যসূচী গ্রহণের জন্য।

বাংলাদেশই সেদিন গোটা পাকিস্তানকে দেখিয়েছিল মুক্তির পথ, গণতন্ত্রের পথ। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ১৯৫৪ সালের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত হল সর্বদলীয় সম্মেলন। স্থির হল বাংলাদেশের আদর্শে সারা পাকিস্তানে গঠিত হবে যুক্তফ্রণ্ট। তাদের কাজ হবে ক্ষমতাপহারক অপ্রতিনিধিত্বমূলক প্রাদেশিক আইনসভাগুলো ভেঙে দিয়ে মুসলিম লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করা। দেশে গণতান্ত্রিক সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।

এক বিশ্বাসঘাতক বাঙালী বগুড়ার মহম্মদ আলী তখন

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতের পুতুল তিনি। বাংলার এই গণতান্ত্রিক জাগরণকে আঁতুড়েই বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্রে হাত দিলেন তিনি। বিরোধী দলগুলোকে বিভক্ত করে তাদের শক্তি নষ্ট করার জন্য তিনি এবং তাঁর সরকার পূর্ববাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধী জীইয়ে তোলার চেষ্টা করলেন।

ফজলুল হক তাঁর মন্ত্রিসভা যেদিন সম্প্রসারিত করেন, ১৯৫৪ সালের ১৫ মে সেদিনই নারায়ণগঞ্জে আদমজী জুট মিলে বাঙালী ও পশ্চিম পাকিস্তানী শ্রমিকদের মধ্যে ষড়যন্ত্রকারীরা দাঙ্গা বাঁধিয়ে দেয়। বাঙালী শ্রমিকরাই সেদিন কেবল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শীতলক্ষার জল লাল হয়ে ওঠে বাঙালী শ্রমিকের রক্তে। ঢাকার লাটভবন থেকে মন্ত্রীরা সেদিন ছুটে যান দাঙ্গা থামাতে। তাদের একজন ছিলেন তরুণ মন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান। পাকিস্তানী ষড়যন্ত্র সেদিন থেকেই সুরু হয় বাংলার গণতান্ত্রিক আশা আকাঙ্ক্ষাকে ব্যর্থ করে তাদের শোষণ-রাজ কায়েম রাখতে।

আদমজী জুটমিলের শ্রমিকদের একটি ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন ভাসানী। বাঙালী শ্রমিকরা যুক্তফ্রণ্টের প্রার্থীদের ভোট দিয়েছে, এই অপরাধেই সেদিন তাদের হত্যা করা হয়েছিল। যেমন এখন সাধারণ বাঙালীকে হত্যা করছে পাকিস্তানী ফৌজ একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পক্ষে দাঁড়ানোর অপরাধে।

বাংলার সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক বিরোধকে তীব্রতর করে তুলতে পাকিস্তানের পুতুল প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মহম্মদ আলি একটার পর একটা ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। আদমজী জুট মিলের শ্রমিক দাঙ্গাকে কেন্দ্রীয় পাকিস্তানে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করলেন। পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্ বাহিনীর কর্তৃত্ব প্রাদেশিক সরকারের হাত থেকে নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জি, ও, সি-র হাতে দেওয়া হল। বাঙালীর হাতে বন্ধুক দিয়ে পাকিস্তান কোনোদিন বিশ্বাস রাখতে

পারেনি। তাই এই ব্যবস্থা। মহম্মদ আলি গোটা ঘটনার দায়িত্ব চাপালেন কমিউনিষ্ট ও পাকিস্তান-বিরোধী অন্যান্য শক্তির ওপর। পূর্ব বাংলার ইনসপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ এক ঔদ্ধত্যপূর্ণ বিবৃতি দিয়ে বললেন, পূর্ববাংলা বিধানসভায় অনেক কমিউনিষ্ট আছে এবং মন্ত্রিসভার অন্তত তিনজন সদস্য কমিউনিষ্ট। তিনি একজনের নামোল্লেখ করলেন। তাঁর নাম শেখ মুজিবর রহমান।

এই সময়ে বৃদ্ধ ফজলুল হক চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পরামর্শ নেবার জন্য কলকাতায় আসেন। ১৯৫৪ সালের ৩০ এপ্রিল তিনি সস্ত্রীক আসেন কলকাতায়। কলকাতার মানুষের কাছে হক সাহের একটি জনপ্রিয় পরিচিত নাম। অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রীই তিনি। কলকাতায় নানা সম্বর্দ্ধনা সভায় বাঙালীর প্রীতিমুগ্ধ হক সাহেব আবেগভরে কিছু কথা বলেন যা পাকিস্তান সরকার এবং যুক্তফ্রন্ট বিরোধী শক্তি তাঁর বিরুদ্ধে কাজে লাগায়। তিনি দুই বাংলার মধ্যে আত্মিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের কথা বলেছিলেন। পাকিস্তান ভেঙে দিয়ে দুই বাংলা এক করব, একথা বলেননি। তিনি চাইছিলেন, সাধারণ মানুষের স্বার্থে দুই বাংলার মধ্যে ভিসা প্রথার কড়াকড়ি শিথিল করতে। বাঙালী জাতির অখণ্ডতার ওপরও তিনি জোর দিয়েছিলেন।

কলকাতার মিডলটন রোডে শান্তিসেনা প্রতিষ্ঠান আয়োজিত এক সম্বর্দ্ধনার প্রত্যুত্তরে হক সাহেবের বক্তব্য হিসেবে কলকাতার সংবাদপত্রে এই কথাগুলো প্রকাশিত হয়ঃ দুই বাংলার মধ্যে যে ব্যবধান আছে তা একটা স্বপ্ন ও ধোঁকা মাত্র। করুণাময় খোদাতাল্লার দরবারে আমার একমাত্র প্রার্থনা এই যে তিনি যেন এই ব্যবধান দূর করতে পারেন। আমার এই আকাঙ্খা যাতে পূরণ হয় সেজন্য আপনারা আমাকে দোয়া করুন।

এলগিন রোডে নেতাজীভবনে প্রদত্ত সম্বর্দ্ধনার উত্তরে হক সাহেব বলেন: "একটি দেশের রাজনৈতিক বিভাগে আমি বিশ্বাস করিনা।

প্রকৃতপক্ষে 'হিন্দুস্তান' ও 'পাকিস্তান'—এই দুটি বিভেদার্থক শব্দের সঙ্গে আমি এখনও পর্যন্ত সুপরিচিত হতে পারিনি। ভারত বলতে আমি এখনও হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান উভয় অংশকেই বুঝি। যারা আমার সোনার দেশকে দু'ভাগ করেছে তারা দেশের দুষমণ।"

হক সাহেবকে যাঁরা জানেন তাঁরাই স্বীকার করবেন যে তিনি একজন আবেগ-প্রবণ মানুষ। দুই বাংলা এক করার কথা তিনি বলেননি। যদিও সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে মনে হতে পারে যে, তিনি যেন সেই দিকেই ইঙ্গিত করছেন।

কলরব উঠল পশ্চিম পাকিস্তানী মহলে। মুসলিম লীগ পরিচালিত পত্রিকাগুলো সুরু করল হৈ চৈ। ঢাকায় ফিরে গেলে গভর্ণর খালিকুজ্জমান হক সাহেবকে ডেকে পাঠিয়ে পরামর্শ দিলেন কলকাতার বিবৃতির প্রতিবাদ করে একটি বিবৃতি দিতে। ফজলুল হক ১৯৫৪ সালের ১০ মে তারিখে ঢাকা থেকে এক বিবৃতি প্রচার করে বললেন, ভারত ও পাকিস্তানের বিভাগ একটি স্বীকৃত ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক সত্য। পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক সংহতি আমি এবং প্রত্যেক প্রকৃত পাকিস্তানীই রক্ষা করবে।

তাতেও মুসলিম লীগ পত্রিকাগুলো শান্ত হলনা। ফজলুল হক ও সমস্ত বাঙালী রাজনৈতিক নেতাদের দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দেওয়া হল। ১৯৭১ সালে ইয়াহিয়া খান যে ভাষায় মুজিবর ও আওয়ামি লীগের নেতাদের পাকিস্তানের শত্রু ও বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দিয়েছেন, ১৯৫৪ সালে ফজলুল হক ও তাঁর যুক্তফ্রণ্টের সহকর্মীদের ভাগ্যেও সেই অপবাদই জুটেছিল।

ফজলুল হক ও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের তলব পাঠান হল করাচীতে। প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আলি প্রথমে চেষ্টা করলেন যুক্তফ্রণ্টের মধ্যে ভাঙ্গন ধরাতে। তিনি ভয় দেখালেন যে ফজলুল হক যদি মুখ্যমন্ত্রীর পদ না ছাড়েন তাহলে মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করা হবে। মহম্মদ আলি চাইছিলেন দুর্বলতর আর কেউ মন্ত্রিসভা গঠন করুক। ফজলুল

হককে তাঁর উক্তির জন্য শাস্তি দেবার এইটাই ছিল পথ। কিন্তু যুক্তফ্রণ্টের শরিকরা রইলেন অটল।

মহম্মদ আলি বললেন, পূর্ব বাংলায় দাঙ্গা ও বাঙালী অবাঙালী সংকট কমিউনিষ্টদের কাজ। তাদের বিরুদ্ধে হক মন্ত্রিসভাকে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে। যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা দাঙ্গা তদন্ত কমিশন গঠন করেছিলেন। মহম্মদ আলির তর সইল না। তিনি চরমপত্র দিলেন হক সাহেবকে।

ইতিমধ্যে নিউইয়র্ক টাইমসের সংবাদ দাতা জেমস্ কালাহান, ফজলুল হকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটি বিবরণ ছাপলেন তাঁর কাগজে। তাতে বলা হল ফজলুল হক নাকি সংবাদদাতাকে বলেছেন, Independence of East Bengal will be one of the first things to be taken up by Ministry.

অর্থাৎ পূর্ববাংলার স্বাধীনতার বিষয়টিই হবে আমার মন্ত্রিসভার প্রথম কাজ।

সংবাদটি যে অতিরঞ্জিত তা বুঝতে কষ্ট হয় না। কারণ একজন বিদেশী সাংবাদিকের কাছে কোনো মুখ্যমন্ত্রী এ ধরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে পারেন না। পাকিস্তানের দিকে তখন আমেরিকার নজর। পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা মার্কিন সামরিক জোট যুক্ত হয়ে গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। পূর্ব বাংলায় যদি একটি গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল মন্ত্রিসভা থাকে তাহলে এই ষড়যন্ত্র অনেকখানি ব্যর্থ হয়ে যাবে। সুতরাং মন্ত্রিসভাকে খতম করার জন্য সব রকম হীন চক্রান্ত চলতে লাগল।

নিউইয়র্ক টাইমসের রিপোর্ট প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তান সরকার ফজলুল হককে ট্রেটর বা বিশ্বাসঘাতক রূপে ঘোষণা করলেন। ফজলুল হক বা মৌলানা ভাসানীর প্রতিবাদ কোনো কাজে এল না। যুক্তফ্রণ্টের একুশ দফা কর্মসূচীতে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের কথা ছিল। স্বাধীনতার কথা ছিল না। মুজিবরের চারদফা

দাবি ও ছিল পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসনের, স্বাধীনতার নয়। কিন্তু ১৯৫৪ সালে যে ষড়যন্ত্র ১৯৫১ সালেও সেই একই ষড়যন্ত্র। বাংলা দেশকে খতম করো। সে যেন কিছুতেই পশ্চিম পাকিস্তানের কবল থেকে মুক্ত হতে না পারে।

জেনারেল ইস্কান্দর মীর্জাকে পাঠানো হল ঢাকায়। তিনি জঙ্গী লোক। মীরজাফরের বংশধর। সুতরাং বাংলাদেশকে শায়েস্তা করার পক্ষে তাঁর চেয়ে যোগ্য আর কে?

১৯৫৪ সালের ৩০ শে মে পূর্ববাংলার প্রথম এবং একমাত্র প্রগতিশীল নির্বাচিত মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করা হল।

মহম্মদ আলি সেদিন এক বেতার ভাষণে মন্ত্রিসভা খারিজের কারণ বর্ণনা করে বললেন যে, ফজলুল একজন 'আত্ম-স্বীকৃত বিশ্বাস-ঘাতক,' বৃদ্ধ ফজলুল হককে ঢাকায় তাঁর বাসভবনে গৃহবন্দী করে রাখা হল। পরদিন সারা পূর্ব-বাংলায় সুরু হল পাকিস্তানী ফৌজের তাণ্ডব। হাজার হাজার মানুষ গ্রেপ্তার হলেন। কমিউনিষ্ট বা প্রগতিশীল বলে যাদেরই সন্দেহ করা হত তাদেরই স্থান হত জেলে। আটক বন্দীদের তালিকায় অনেকের মধ্যে সেদিন একটি নাম ছিল—শেখ মুজিবর রহমান।

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একটি পর্ব সেদিন সমাপ্ত হল। বাংলার মানুষ বুঝল, পাকিস্তানের শাসক কারা এবং কী উদ্দেশ্যে তারা পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের কুক্ষিগত করে রেখেছে।

ইস্কান্দর মীর্জা তার পাঞ্জাবি সৈন্যদের দিয়ে বাংলাদেশ তছনছ করতে লাগলেন। যুক্তফ্রণ্টের অফিস তালাবন্ধ হল। সভা মিছিল নিষিদ্ধ। সংবাদপত্রের ওপর কড়া বিধিনিষেধ। পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টিকে সরকারীভাবে নিষিদ্ধ করা হল ১৯৫৪ সালের ৫ জুলাই।

বাংলাদেশ সামরিক শাসকদের দ্বারা রাহুগ্রস্ত হল।

ভাসানী ও আওয়ামি লীগ

॥ ৮ ॥

> "বাঙালি সম্রাট অশোককে মানে নাই, মোঘল পাঠানের অনুগত হয় নাই, ইংরেজের আনুগত্য স্বীকার করে নাই, কায়েদে আজমের মুসলিম লীগকেও বরদাস্ত করে নাই।"
>
> মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

পূর্ব বাংলার মাটিতেই বিদ্রোহের পতাকা ওড়াল আওয়ামি লীগ। তার নেতা কাগমারী গ্রামের মানুষ, মুসলিম মৌলানা। নাম তাঁর আবদুল হামিদ খান ভাসানী।

দেশভাগের আগে তিনি ছিলেন আসামে। ময়মনসিংহ থেকে ভূমিহীন মুসলিম কৃষকরা যেত আসামে। সেখানে মাটিতে ওরা নিজেদের শ্রম দিয়ে ফলাত সোনার ফসল। ভাসানী ছিলেন এই মুসলিম কৃষকদের অবিসম্বাদী নেতা। তখন তিনি আসাম মুসলিম লীগের সভাপতি। মুসলিম লীগের নেতা হলেও তিনি জিন্নাহ্‌র আরাম-কেদারার রাজনীতির অনুরক্ত ছিলেন না। কৃষকদের সঙ্গে কেটেছে ওঁর জীবন। তিনি জানেন শোষিত কৃষকশ্রেণীর দুঃখ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ভাসানী চলে এলেন পূর্ব বাংলায়। পাকিস্তানের নেতাদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম বুঝতে পেরেছিলেন যে, মুসলিম লীগ নেতাদের শ্রেণীস্বার্থ পাকিস্তানের দরিদ্র শ্রমিক-কৃষকদের স্বার্থের পরিপন্থী। তারা ধর্মের দোহাই দিয়ে পাকিস্তান কায়েম করেছেন নিজেদের ক্ষমতা ও স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখার জন্য।

১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ভাসানী মুসলিম লীগের বিক্ষুব্ধ সদস্যদের একটি সম্মেলন আহ্বান করলেন নারায়ণগঞ্জে। সেই সম্মেলনেই জন্ম নিল নুতন বিরোধীদল-আওয়ামি মুসলিম লীগ। মুসলিম লীগের তরুণ সদস্যরা মহম্মদ তোহা, ওলি আহাদ প্রমুখ 'মুসলিম' নামটি বাদ দেবার দাবি জানিয়েছিলেন। কিন্তু তখনও পাকিস্তানে ধর্মান্ধতা প্রবল। তাই মৌলানা তরুণদের দাবি সেদিন মানেনি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল অবিলম্বে একটি শক্তিশালী বিরোধী দল গঠন করা। এবং যত বেশি সংখ্যক লোক তাঁর সঙ্গে থাকে মুসলিম লীগের স্বৈরাচারী জনগণ-বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করা ততই তাঁর পক্ষে সহজ। তরুণ ছাত্ররা ভাসানীর ডাকে সাড়া দিল। মুজিবর সেই সম্মেলনে যোগ দিতে পারেননি। মুসলিম লীগ সরকার তখন তাঁকে গ্রেপ্তার করে কারারুদ্ধ করে রেখেছে। আওয়ামি মুসলিম লীগ তার রাজনৈতিক কর্মধারার মধ্যদিয়ে যতই সাধারণ মানুষের কাছে আসতে লাগল, মৌলানা ভাসানীরও চিন্তাধারার পরিবর্তন হতে লাগল। মৌলানা হয়ে উঠলেন পাকিস্তানের প্রগতিশীল চিন্তাধারার একজন বলিষ্ঠ প্রবক্তা। তাঁর পার্টির নামকরণ পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়াল আওয়ামি লীগ। দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠাই হল আওয়ামি লীগের কাম্য। তরুণ মুজিবর এলেন আওয়ামি লীগে। তিনি ভাসানীর চেয়েও বেশি আকৃষ্ট ছিলেন হুসেন শহীদ সুরাওয়ার্দির প্রতি। সুরাওয়ার্দি অবিভক্ত বাংলার রাজনীতিতে একজন স্বনামধন্য পুরুষ। পাকিস্তান আদায় করার কৃতিত্ব যদি কারু থাকে তা শহীদ সুরাওয়ার্দির। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগষ্ট কলকাতায় এবং পরে নোয়াখালিতে রক্তগঙ্গা না বইলে পাকিস্তান হয়তো এভাবে আসত না। সেই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নায়ক ছিলেন বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী হুসেন শহীদ সুরাওয়ার্দি।

মেদিনীপুরের এই সুরাওয়ার্দির পরিবার বাংলাদেশে খ্যাত। বহু জ্ঞানী গুনীর জন্ম এই পরিবারে। হাসান সুরাওয়ার্দি ছিলেন

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর। শাহেদ সুরাওয়ার্দি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রখ্যাতনামা অধ্যাপক। শহীদ সুরাওয়ার্দি অক্সফোর্ডের ছাত্র। চৌখস বলিয়ে কইয়ে। রাজনীতিতে ধুরন্ধর। জিন্নাহ্‌র সঙ্গে তাঁর কোনোদিন বনিবনা হয়নি। তাই দেশ ভাগ হবার প্রস্তাব নিয়ে যখন আলোচনা চলছে তখন শহীদ তা বাধা দিতে চাইলেন। ভাঙা বাংলায় ঢাকা শহরে তাঁর স্থান হবেনা তা তিনি জানতেন। তিনি সংযুক্ত বাংলার প্রস্তাব দেন। শরৎচন্দ্র বসু প্রস্তাব দিয়েছিলেন বাংলাদেশকে অখণ্ড রেখে স্বাধীন সার্বভৌম একটি পৃথক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র করা হক। শহীদ সুরাওয়ার্দি ও সে প্রস্তাব সমর্থন করেন।

শরৎচন্দ্র বসুর প্রস্তাব সেদিন বাংলাদেশের মানুষ গ্রাহ্য করেনি। সাম্প্রদায়িক বিরোধ এমন তিক্ততা সৃষ্টি করেছিল যে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ই ভাবল ভাগ হয়ে গেলেই বুঝি সব সমস্যার সমাধান। তা যে হয়নি বাংলাদেশের মুসলিম জনগণের জীবন-পণ সংগ্রামেই তার প্রমাণ। তারা চেয়েছিলেন এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসাবে মুসলিমরা নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারবেন। পশ্চিম পাকিস্তান বাংলাদেশকে লেজুড় হিসাবে রেখে দিল। বাঙালীর মুক্তির সকল প্রচেষ্টা হল ব্যর্থ।

আওয়ামি লীগই পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের চিন্তাকে সর্বপ্রথম সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে। পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশগুলোর স্বায়ত্তশাসনের দাবিও তারা তোলেন। আওয়ামি লীগকে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠা দেন সুরাওয়ার্দি। ভাসানী সাধারণ শিক্ষিত মানুষ। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে আসামে এবং পূর্ব বাংলায়। পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁর তখনও তেমন পরিচিতি হয়নি। সুরাওয়ার্দি নিলেন পশ্চিমে পার্টি সংগঠনের দায়িত্ব। সুরাওয়ার্দির ক্ষমতা ছিল আশ্চর্য। মৌলানার সঙ্গে তাঁর কোনোদিকেই ছিল না সাদৃশ্য। মৌলানা সাধারণ গ্রামের মানুষ। ফকিরের মতো জীবন-

যাপনে অভ্যস্ত। সাধারণ মানুষের সঙ্গী, তাদের সমব্যথী। জীবনের দাবিতেই তিনি এসেছেন রাজনীতিতে। রাজনীতিক ক্ষমতায় তাঁর নেই আগ্রহ। কখনোই কোনো মন্ত্রিসভায় যাননি। দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রগতিশীল বামপন্থী। সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। জঙ্গীসাহীর সমালোচক। সামরিকজোটের প্রতিবাদী। বাংলাভাষা ও বাঙালীর প্রতি মমতাবোধসম্পন্ন একজন আদর্শ মানুষ।

সুরাওয়ার্দি ছিলেন উচ্চশিক্ষিত নাগরিক। পেশাদার রাজনীতিক। তীক্ষ্ণধী। হৃদয়ের চেয়ে বুদ্ধি নির্ভর, চতুর এবং কঠোর বাস্তববাদী। রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভে আগ্রহী এবং তাঁর জন্য যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণে অনিচ্ছা ছিল না তাঁর। বামপন্থী চিন্তা বা প্রগতিশীলতার কোনো বালাই ছিল না এই নেতার। কিন্তু তাঁর প্রধান গুণ ছিল তরুণ কর্মীদের নিজের কাছে আকর্ষণ করার ক্ষমতা। মুজিবর রহমান আকৃষ্ট হয়েছিলেন সুরাওয়ার্দির প্রতি। ভাসানীর বামপন্থী চিন্তার চেয়ে মুজিবের প্রেরণা ছিল প্রগতিশীল চিন্তা, জাতীয়তাবাদ ও গণতান্ত্রিক আদর্শ। কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্রের দিকে আকর্ষণ ছিলনা তাঁর। কিন্তু মুজিবের মতো কর্মী, অনলস সংগ্রামী ছিল দুর্লভ। তাই মতবিরোধ সত্ত্বেও ভাসানী ও মুজিব একই সঙ্গে ছিলেন দীর্ঘকাল আওয়ামি লীগে।

হক মন্ত্রিসভা পতনের পরও কিছুকাল পূর্ববাংলায় বিকল্প সরকার ছিল। আওয়ামি লীগ কৃষক শ্রমিক পার্টি ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৭ সালের মধ্যে কয়েকবারই মন্ত্রিসভা গঠন করে। এবং নিজেদের দলাদলি, করাচীর ষড়যন্ত্র ও সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে সেই মন্ত্রিসভাগুলোর পতন হয় একে একে।

পশ্চিম বাংলায় ১৯৫৭ সাল থেকে বামপন্থী মন্ত্রিসভা গঠন ও পতনের সঙ্গে একদশক আগেকার পূর্ব বাংলার পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের বিশৃংখল অবস্থার অনেকটা সাদৃশ্য আছে।

আওয়ামি লীগ স্পষ্টতই ভিতর থেকে দ্বিধা বিভক্ত হতে লাগল।

তার কারণ একদিকে ছিলেন ক্ষমতাভিলাষী সুরাওয়ার্দি, অন্যদিকে মৌলানা ভাসানী। দুজনের চিন্তাধারার ছিল আকাশ পাতাল পার্থক্য।

আওয়ামি লীগ পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি যখন ক্ষমতার শিখরে ও মুসলিম লীগ পর্যুদস্ত তখনি তার পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয় সেই যুগান্তকারী পুস্তিকা 'কেন স্বায়ত্তশাসন চাই'। আওয়ামি লীগের প্রভাব তখন পশ্চিম পাকিস্তানেও। সুতরাং শুধু বাংলাদেশের জন্যই তারা সংগ্রাম করছিলেন, একথা বলা ঠিক হবে না।

পাকিস্তানকে একটি ফেডারেল গণতন্ত্রে পরিণত করে অসাম্প্রদায়িক, জোট নিরপেক্ষ প্রগতিশীল রাষ্ট্রের রূপান্তর সাধনই ছিল আওয়ামি লীগের লক্ষ্য। ১৯৫৫ সালেই পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসন দাবি করে আওয়ামি লীগ বলল : "পাকিস্তানের বর্তমান রাষ্ট্রীয় গঠন বিবেচনা করলে সাড়ে চারকোটি বাঙালীর আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন স্বীকৃতি অপরিহার্য। পাকিস্তান রাষ্ট্র হিসাবে একটি অখণ্ড ভৌগোলিক সত্তা নয়। পাকিস্তানের দুই অংশে বিমানপথের দূরত্ব হাজার মাইল, সমুদ্র পথে তিন হাজার মাইল। বৃটেন ও কানাডার যা দূরত্ব পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দূরত্ব তার চেয়ে বেশি।"

"বাস্তব দিক দিয়ে বিচার করলে করাচী সরকারের কাছে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বক্তব্য পৌঁছয় না। তিন হাজার মাইল দূরে বসে যে সরকার সিদ্ধান্ত নেয় পূর্ব বাংলার জনমত থেকে বিচ্ছিন্ন সে সিদ্ধান্ত তার জনগণের প্রতি অবিচার করতে বাধ্য। পাকিস্তানের দুই অংশে বসবাসকারী জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বা মেলামেশার কোনো সুযোগ নেই।"

"অর্থনীতির দিক দিয়েও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি যুক্তিসঙ্গত। কারণ পাকিস্তানের দুই অংশের অর্থনীতির চরিত্র সম্পূর্ণ আলাদা। যোগাযোগের অভাব, উৎপাদন ব্যবস্থার অনড়ত্ব এবং দুই অংশের মূল্যমানের বিরাট পার্থক্য পাকিস্তানের দুই শাখার দুটি স্বতন্ত্র

অর্থনীতির অস্তিত্বই প্রমাণ করে। একটির ওপর অপরটির কোনো প্রভাব নেই।"

"পশ্চিম পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় রাজধানী থেকে পূর্ব পাকিস্তান ১৪০০ মাইল ভারতীয় ভূখণ্ড দ্বারা বিচ্ছিন্ন। স্থলপথে কোনো সংযোগ নেই দুই অংশের। বিমান ও সমুদ্রপথে যোগাযোগ অপর্যাপ্ত ও ব্যয়সাধ্য। একমাত্র মুষ্টিমেয় ধনী ব্যক্তিই পাকিস্তানের এক অংশ থেকে অন্য অংশে যাতায়াত করতে পারে। খাদ্যশস্য ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য পশ্চিম পাকিস্তানে অনেক সস্তা। অধিকাংশ বিদেশী আমদানী পণ্য করাচীতে নামানো হয় এবং পরে তা পূর্ব পাকিস্তানে আবার রপ্তানী করা হয়। তার ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের রপ্তানীকারীরা যে শুধু অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করে তা নয়—পশ্চিম পাকিস্তান থেকে মাল রপ্তানী করার জন্যও অতিরিক্ত দাম ধার্য করে। পূর্ববাংলার বাজারে বিদেশী পণ্যদ্রব্য আসে দেরীতে এবং তার দামও অত্যন্ত চড়া।"

"রাজনীতির দিক দিয়েও পূর্ব বাংলার আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। বর্তমান যুগে প্রশাসনিক কাজকর্ম বেড়েই চলেছে এবং তা জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে জড়িত। স্পষ্টতই সমুদ্রপথে তিনহাজার মাইল দূরে করাচীতে অবস্থিত একটি সরকার তাদের প্রতি প্রাথমিক দায়িত্বও পালন করতে পারে না। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে বিরাট সংখ্যক বিষয়ের দায়িত্ব অর্পিত হলেই কোনো রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতি গড়ে ওঠে না।"

"পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই দেশের সরকার পরিচালিত হচ্ছে 'এককেন্দ্রিক' বা ইউনিটারি ধরণে। তাতে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে ঐক্য কতটা সুরক্ষিত হয়েছে? ঐক্য জবরদস্তি করে বা পিস্তলের ভয় দেখিয়ে আদায় করা যায় না।"

"পূর্ব বাংলার ইতিহাস হল শোষণের ইতিহাস। জনসাধারণের

রাজস্ব থেকে আদায়-করা ও বৈদেশিক সাহায্যের শত শত কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে করাচীকে গড়ে তোলার জন্য। এই ব্যয় থেকে পূর্ব বাংলার মানুষ প্রত্যক্ষ কোনো উপকার পায়নি। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই সমস্ত সামরিক সংস্থা মিলিটারি কলেজ, প্রাক-ক্যাডেট স্কুল, অর্ডন্যান্স কারখানাসমূহ স্থাপিত হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে এবং করাচীতে। এতে পূর্ব বাংলার মানুষের কোনো উপকার হয়নি—না চাকুরীতে, না ঠিকাদারিতে।"

"প্রত্যেক বৎসর কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকার কর বাবদ পূর্ব বাংলা থেকে ৬০ থেকে ৭০ কোটি টাকা আদায় করে নিয়ে যায়। তার অধিকাংশই ব্যয় হয় করাচীতে ও পশ্চিম পাকিস্তানে। এই বিরাট শোষণের দলে পূর্ব বাংলার সর্বশ্রেণীর মানুষ চরম দারিদ্র্যে ও বঞ্চনায় পতিত হয়েছে।"

"পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান দুটি স্বতন্ত্র ও অন্য-নিরপেক্ষ ইউনিট হওয়ায় এবং একটি অর্থ নৈতিক ইউনিট না হওয়ায়, এক অংশ থেকে অপর অংশে সম্পদ বা মূলধন স্থানান্তর তাদের অর্থনীতির ওপর বিভিন্ন ধরণের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।"

"বাণিজ্য ও আমদানী ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বৈষম্য জনগণের দৈনন্দিন জীবন যাত্রাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। পূর্ব বাংলার অভিযোগ এই যে, আমদানী লাইসেন্সেয় অধিকাংশই দেওয়া হয় করাচীর ব্যবসায়ী ও জাহাজীদের। তাই অধিকাংশ আমদানীপণ্যই যায় পশ্চিম পাকিস্তানে। বর্তমান সরকারের পক্ষপাত মূলক নীতির জন্যই এটা হতে পারে অথবা করাচীর আমদানীকারকরা সরকারের কাছাকাছি থাকে বলেই এটা হচ্ছে। কারণ যাই হক, এর ফলে পূর্ববাংলায় সব সময়েই জিনিসপত্রের ঘাটতি এবং তার দামও চড়া। এখন পূর্ববাংলাকে বিদেশী পণ্যের অধিকাংশই করাচী থেকে আবার আমদানী করতে হয়। তার ফলে এই পণ্যের বিক্রয় মূল্য করাচীর বাজারের দামের চেয়ে শতকরা ৫০ ভাগ বেশী হয়ে থাকে।"

বৈষম্যের দীর্ঘ তালিকাও দিয়েছিল আওয়ামি লীগ। তারপর দীর্ঘ ষোল বছর কেটে গেছে। সে হিসাব এখন আরও বেড়েছে। ১৯৫১ সালে আওয়ামি লীগ এই নিদারুণ বৈষম্যের যে চিত্র দিয়েছে তা থেকেই বোঝা যাবে যে, শোষণ চলছে অব্যাহতভাবে। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে আওয়ামি লীগের এই পোস্টারটি দেখা যায়।

সোনার বাঙলা শশ্মান কেন?

বৈষম্য বিষয়	বাঙলাদেশ	পশ্চিম পাকিস্তান
রাজস্বখাতে ব্যয়	১৫০০ কোটি টাকা	৫০০০ কোটি টাকা
উন্নয়নখাতে ব্যয়	৩০০০ ,, ,,	৬০৩০ ,, ,,
বৈদেশিক সাহায্য	শতকরা ২০%	শতকরা ৮০%
বৈদেশিক দ্রব্য আমদানী	,, ২৫%	,, ৭৫%
কেন্দ্রীয় সরকারে চাকুরী	,, ১৫ জন	,, ৮৫ জন
সামরিক বিভাগে চাকুরী	,, ১০ জন	,, ৯০ জন
চাউল মণ প্রতি	,, ৫০ টাকা	,, ২৫ টাকা
আটা ,, ,,	,, ৩০ টাকা	,, ১৫ টাকা
সরিষার তৈল সের প্রতি	,, ৫ টাকা	,, ২·৫০ পয়সা
সোনা প্রতি ভরি	১৭০ টাকা	১৩৫ টাকা

এই বঞ্চনাই ডেকে এনেছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। কিন্তু তা পঞ্চাশের দশকেই না হয়ে সত্তরের দশকে এমনভাবে বিস্ফোরিত হল কেন?

তার কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে আমরা দেখতে পাব পূর্ববাংলার প্রগতিশীল চিন্তাধারক আওয়ামি লীগের অন্তর্দ্বন্দ্ব এই আন্দোলনকে অনেকখানি দুর্বল করে দিয়েছিল।

এই অন্তর্দ্বন্দ্ব সুস্পষ্ট হল কাগমারী সম্মেলনে। তাঁর আগের ও একটু ইতিহাস আছে।

১৯৫৬ সালে আওয়ামি লীগ—রিপাবলিকান দলের কোয়ালিশন

সরকার গঠিত হল কেন্দ্রে। তাঁর বহুদিনের স্বপ্ন সফল হল। জিন্নাহ্ তাঁকে কোনো স্বীকৃতি দেননি। যার ফলে দেশবিভাগের পরও তিনি কয়েকমাস কলকাতাতেই ছিলেন। ওথেলোর হাতে কোনো কাজ না থাকলে যা হয়। সুরাওয়ার্দির কর্মমুখর রাজনৈতিক জীবন কর্মহীন অবসাদে দিনাতিপাত করছিল সে সময়।

আওয়ামি লীগ তাঁকে এনে দিল প্রার্থিত পদ—পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলেন তিনি।

মৌলানা ভাসানী দেখলেন ক্ষমতার গদীতে বসে আওয়ামি লীগের কিছু কিছু নেতা দলের নীতি লঙ্ঘন করছেন, দলের ইস্তাহারে বর্জিত প্রতিশ্রুতি পালনে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। ভাসানীর নেতৃত্বাধীনে আওয়ামি লীগ পাকিস্তানের সামরিক জোটেযোগ দেওয়ার বিরোধিতা করে। পাকিস্তানকে সমস্ত রকম সামরিক জোট থেকে বেরিয়ে আসবার দাবি জানায়। পূর্ব বাংলায় তখন আওয়ামি লীগের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা। মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন আতাউর রহমান। শেখ মুজিবর রহমান মন্ত্রিসভার সদস্য।

এই সময়ে পূর্ববাংলার সঙ্গে ভারতের বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার সম্প্রীতির সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হয়। পূর্ববাংলার খাদ্য সামগ্রী সরবরাহের সমস্ত রকম সুযোগও ভারত সরকার তখন করে দেন। পূর্ববাংলায় খাদ্যসংকট দেখা দিলে ভারত তাড়াতাড়ি পাঁচ হাজার মণ চাউল সাহায্য হিসেবে পাঠিয়ে দেয় পূর্ববাংলায়। পরে আরও তিন হাজার মন চাউল দেয় ভারত একইভাবে।

কিন্তু কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের সামরিক জোটবদ্ধতা ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল নীতি পূর্ব বাংলার জনমনে নিদারুণ বিক্ষোভ ও হতাশা সৃষ্টি করল। মৌলানা ভামানী জানালেন তিনি জনগণের কাছ থেকে অনেক অভিযোগ পাচ্ছেন কেন্দ্রে এবং পূর্ববাংলায় আওয়ামি লীগ সরকারের বিরুদ্ধে। আওয়ামি লীগের একুশদফা কার্যসুচী কেন তারা রূপায়িত করছেন না? কেনই বা পূর্ব বাংলার

জন্য স্বায়ত্ত শাসন আদায় করছেন না তারা ? মৌলানা সমস্ত বিষয় আলোচনার জন্য একটি সম্মেলন ডাকলেন তাঁর গ্রামে ময়মনসিংহ জেলার কাগমারীতে। আওয়ামি লীগের এই সম্মেলনের পাশাপাশি তিনি আয়োজন করলেন একটি আফ্রো-এশীয় সাংস্কৃতিক সম্মলনের। ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারি।

পৃথিবীর বহু দেশের শিল্পী, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ উপস্থিত ছিলেন সে সম্মেলনে। ভারত থেকে হুমায়ুন কবিরের নেতৃত্বে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল যায় সে সম্মেলনে। এই দলে ছিলেন মাদাম সোফিয়া ওয়াদিয়া, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধারানী দেবী, প্রবোধকুমার সান্যাল, কাজী আবদুল ওদুদ প্রমুখ। মৌলানা ভাসানীর নেতৃত্বে এবং প্রেরণায় অনুষ্ঠিত এই সম্মেলন দুই বাংলার সাংস্কৃতিক মিলনের স্মারক হয়ে আছে এখনও।

কাগমারী সম্মেলনে সুসজ্জিত তোরণগুলোর নামকরণ করা হয়েছিল—কায়েদে আজম মহম্মদ আলি জিন্নাহ্, মহাত্মাগান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, হাকিম আজমল খান, লেনিন, সেক্সপীয়ার, শেখ শা'দী, সৈয়দ আহ্মেদ, আব্রাহাম লিঙ্কন ও তিতুমীরের নামে।

এই সম্মেলনেই ভাসানী ঘোষণা করেন, পাকিস্তানের সামরিক জোটবদ্ধতার পররাষ্ট্রনীতি শান্তি ও গণতন্ত্রের পরিপন্থী। এই পররাষ্ট্রনীতি আমেরিকার স্বার্থে গ্রহণ করেছিল বগুড়ার মহম্মদ আলি। সুরাওয়ার্দি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে যদি এই পররাষ্ট্রনীতি পরিবর্তন না করেন তবে তাঁকে পদত্যাগ করতে হবে। কারণ, দলের সমর্থনেই তিনি প্রধানমন্ত্রীর গদীতে বসেছেন।

সুরাওয়ার্দি হতবাক হয়ে গেলেন এই সরাসরি আক্রমণে। কিন্তু তিনি জানেন কী করে ক্ষমতা রাখতে হয়। সুরাওয়ার্দি একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি নিশ্চিতই দক্ষতার পরিচয়ও দিয়েছিলেন। পাকিস্তান ন্যাশনাল এসেম্বলিতে পৃথক নির্বাচন প্রথা রহিত করে যুক্ত নির্বাচন প্রস্তাব বিলটি তাঁর জন্যই

গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু ভাসানীর মতো উদার প্রগতিশীল ও সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর ছিলনা। তাই ভাসানীকে পর্যুদস্ত করার অন্য ফন্দী তিনি আঁটলেন। এই সময়ে শেখ মুজিবর রহমান ছিলেন সুরাওয়ার্দির পাশে। শেখ মুজিবর আওয়ামি লীগের সাধারণ সম্পাদক। ভাসানী হলেন সভাপতি। দলের ভিতর দেখা দিল দ্বন্দ্ব। দল দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেল। যে আওয়ামি লীগের ওপর এত ভরসা ছিল পাকিস্তানের মানুষের তা এক থাকতে পারলনা।

ভাসানী দুঃখ করে বললেন, ক্ষমতালাভ করে কেউকেউ আওয়ামি লীগের আদর্শ ভুলে গেছে।

পশ্চিম পাকিস্তানের ও পূর্ব বাংলার প্রগতিশীল শক্তিকে সমবেত করে ভাসানী গড়লেন নতুন দল—ন্যাশনাল আওয়ামি পার্টি। আওয়ামি লীগে রয়ে গেলেন শেখ মুজিবর রহমান। একজন প্রবীণ, একজন তরুণ। দুজনেই দেশসেবায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ। কিন্তু এক পার্টিতে দুজনের স্থান হলনা।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সকল বাঙালীই যেখানে এক। এই দুই নেতাও আজ এক। সমগ্র জাতির মুক্তির সংকল্প রূপায়িত করছেন বাংলাদেশের এই দুই মহান নেতা।

আওয়ামি লীগের এই ভাঙনের অল্পকাল পরেই গোটা পাকিস্তানে দেখা দেয় এক সামরিকচক্র। প্রথমে ইস্কান্দর মীর্জা এবং পরে আইয়ুব খান।

দশবছর চলে এই রাহুগ্রাস।

পাকিস্তানের রাজনীতির ইতিহাসে সুরু হয় এক নতুন অধ্যায়।

আইয়ুবের ক্ষমতা দখল

॥ ৯ ॥

My authority is revolution. I have no Sanction in law or Constitution.

Ayub Khan.

একই দেশকে ভেঙে দুটুকরো করে পাকিস্তান ও ভারত দুই রাষ্ট্রের সৃষ্টি। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের যন্ত্রণা একইভাবে ভোগ করেছে এই দেশের মানুষ। অথচ ভারত ও পাকিস্তান এই দুই দেশের রাজনৈতিক অগ্রগতি হল সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী।

ভারত স্বাধীন হবার তিনবৎসরের মধ্যে একটি গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের সংবিধান তৈরী করল। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি প্রবর্তিত হল এই সংবিধান। ভারত নিজেকে ঘোষণা করল একটি সাধারণতন্ত্র বা রিপাবলিক। অবশ্য নেহরুর আগ্রহে এই সাধারণতন্ত্র রয়ে গেল কমনওয়েলেথের সদস্য যার মধ্যমণি হল বৃটেন এবং শিরোমণি হলেন বৃটেনের রাজা বা রাণী। ভারতের সংবিধান হয়তো বা জগতের বৃহত্তম লিখিত সংবিধান। তার ত্রুটি বিচ্যুতি আছে এবং তা সংশোধন করার চেষ্টাও হচ্ছে গত ২৪ বছর ধরে। অন্ততপক্ষে কুড়িটি সংশোধন করা হয়েছে এই সংবিধানে। কিন্তু তা হলেও ভারত একথা বলতে পারে যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের পর তার প্রতিনিধিরা এতটুকু সময় নষ্ট করেনি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বৃটিশের আমলের আইন কানুন বদল করে নিজেদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাহায্যে একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান তৈরী করেছে।

এদিকে পাকিস্তান কী করল ?

মুসলিম লীগ নেতারা অভাবিত ভাবে পাকিস্তান পেয়ে যাবার পর সেই নবলব্ধ রাষ্ট্রক্ষমতা নিজেদের স্বার্থ পূরণের জন্য কাজে লাগাতেই রইলেন ব্যস্ত। পাকিস্তান পাবার অল্পদিনের মধ্যে তারা হানাদার পাঠিয়ে ভারতের অন্তর্ভুক্ত কাশ্মীর দখল করার এক ষড়যন্ত্র করল। হানাদাররা পর্যুদস্ত হলে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দেওয়া হল ভূস্বর্গ কাশ্মীর দখল করার জন্য। তাদের সময় কোথায় দেশের মানুষের হাতে গণতান্ত্রিক অধিকার সমর্পণের! পূর্ববাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল পাকিস্তানীদের কেন্দ্রীয় ক্ষমতার আমল থেকে অনেক দূরে। মাঝখানে ভারতের হাজার মাইলের ভূখণ্ড। দুশ্চিন্তা ছিল তাদের মনে। পাকিস্তানী শাসকরা বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমলের অগণতান্ত্রিক আইন কানুন দিয়েই দেশ শাসন করতে লাগলেন।

১৯৫০ সালের আগে খসড়া সংবিধান নিয়ে তারা আলোচনা করার সময়ই পাননি। ইতিমধ্যে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌র জীবনাবসান পাকিস্তানের রাজনীতিতে এক শূন্যতার সৃষ্টি করল যার জন্য পাকিস্তানী নেতারা মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলীখানও আততায়ীর হাতে নিহত হলেন ১৯৫১ সালের অক্টোবরে। পাকিস্তানের ওপর এটি হল দ্বিতীয় আঘাত। সংবিধান রচনার কাজে তখন হাত দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের মূলনীতি নির্দেশক কমিটিতে বলা হয়েছিল পাকিস্তানকে একটি গণতান্ত্রিক ফেডারেল রাষ্ট্রে পরিণত করা হবে যার অঙ্গরাজ্যগুলোর থাকবে সম্পুর্ণ স্বায়ত্তশাসন। কিন্তু আসল সংবিধান রচনার সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতাশালী শ্রেণী প্রতিপদে এই মূলনীতির বিরোধিতা করতে লাগল। তারা জীইয়ে তুলল মোল্লা মৌলভীদের ধর্মোন্মাদ জিগির।

পূর্ববাংলার মানুষ সংখ্যায় বেশী। বস্তুত পাকিস্তানের অধিকাংশ মানুষই হলেন বাঙালী এবং বাংলাভাষী। পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতা

প্রধানত পাঞ্জাবি ধনিক বনিক বুর্জোয়াদের হাতে। তারা কোনোদিনই বাঙালীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে ভালো চোখে দেখেনি।

পশ্চিম পাকিস্তানে সিন্ধু, সীমান্তপ্রদেশ ও বালুচিস্তানের লোকেরা এই পাঞ্জাবী ও উর্দুভাষীদের প্রাধান্যের বিরোধিতা করছিল। তাই পাঞ্জাবীদের চাপেই পশ্চিমপাকিস্তানের সমস্ত প্রদেশের অস্তিত্ব লোপ করে 'এক ইউনিট' প্রবর্তন করা হল। অর্থাৎ পশ্চিমের চারটি প্রদেশ মিলে হল এক ইউনিট পশ্চিম পাকিস্তান একটি কেন্দ্রীয় রাজ্য-সরকারের অধীন।- অন্যদিকে রইল পূর্ব বাংলা। পূর্ববাংলা নামটিতে ওদের আপত্তি। তাই ওর নাম দেওয়া হল পূর্বপাকিস্তান। বাংলাদেশের নাম বিলোপের এই চক্রান্তে মুসলিম লীগ নেতারা সায় দিলেন।

কিন্তু তাতেও সুবিধা হল না। কারণ, জনসংখ্যার অনুপাতে আসন দিতে হলে সব সময়েই পাকিস্তানের পার্লামেন্ট বা ন্যাশনাল এসেম্বলিতে বাঙালীদের প্রাধান্য থাকবে।

চার বছরের চেষ্টার ১৯৫৪ সালে পাকিস্তানের সংবিধান যখন প্রায় তৈরি, গণপরিষদে তা গৃহীত হবে তখনি গভর্ণর-জেনারেল গুলাম মহম্মদ বিশেষ ক্ষমতাবলে গণপরিষদ বাতিল করে দিলেন। আবার নতুন গণপরিষদ তৈরী হল ১৯৫৫ সালে। তাতে পূর্ববাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠতা কমিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের সমান করা হল। এই সাজানো গণপরিষদে একটি সংবিধান তৈরী করা হল। তাতে পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসনের কোনো স্বীকৃতি রইল না। পাকিস্তানকে ঘোষণা করা হল ইসলামিক প্রজাতন্ত্র। সংখ্যালঘুদের সমানাধিকার হলনা স্বীকৃত।

এই সংবিধানকে কোনো মতেই গণতান্ত্রিক বলা যায় না। কারণ এতে পূর্ববাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠতার স্বীকৃতি নেই, রাজ্যগুলোর স্বায়ত্তশাসন উপেক্ষা করে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দেওয়া হল একটি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। পূর্ববাংলার আইনসভা ১৯৫৫ সালেই যুক্ত

নির্বাচনব্যবস্থার পক্ষে প্রস্তাব নাম করেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিক্রিয়াশীলরা পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার পক্ষে রায় দেয়। বাংলা দেশের গণ আন্দোলনের চাপে একমাত্র বাংলাভাষাকে তারা অন্যতম সরকারী ভাষার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিল।

কিন্তু বাংলাদেশের জীবনমরণ সমস্যা—স্বায়ত্তশাসন, তার কোনো স্বীকৃতি হল না। এই জবরদস্তি সংবিধানও পাকিস্তানের মানুষ সইতে পারল না। পাকিস্তানের রাজনৈতিক দিগন্তে দেখা দিলেন এক নতুন নায়ক। মুর্শিদাবাদের জেনারেল ইস্কান্দর মীর্জা তখন প্রেসিডেণ্ট। তিনি সংবিধানের সমস্ত বিধান বাতিল করে পাকিস্তানে সামরিক আইন জারী করলেন ১৯৫৮ সালে ৮ অক্টোবর।

সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত হলেন জেনারেল মহম্মদ আইয়ুব খান। তিনিই হলেন পাকিস্তানের কমাণ্ডার ইন চীফ।

পূর্ববাংলায় সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত হলেন আরেকজন পাঞ্জাবি মেজর-জেনারেল উমারাও খান।

এই হল পাকিস্তানের ‘বিপ্লব’। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের সৃষ্টি। তার দশ এগারো বছর পরও দেশে না এল গণতন্ত্র, না এল সাধারণ মানুষের অধিকার।

এই বিপ্লবের স্রষ্টা নাম মাত্র ইস্কান্দার মীর্জা। তার নেপথ্য নায়ক যিনি তিনিই পরবর্তী দশবছর হলেন পাকিস্তনের ভাগ্য-বিধাতা। তার নাম জেনারেল মহম্মদ আইয়ুব খান।

আইয়ুবের ক্ষমতা দখলের পটভূমিতে আছে পাকিস্তানের রাজনীতিকদের হীন চক্রান্ত, দলাদলি এবং সম্পদ লোভ। লিয়াকৎআলীর মৃত্যুর পর থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় সরকার বারবার হাত বদল হয়েছে। গভর্ণর-জেনারেল নাজিমুদ্দিনকে করা হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী। তিনি ঢাকার লোক। তবে বাংলার প্রতি আনুগত্য ছিল না তাঁর। তিনি পশ্চিমীদের খুশি করেই থাকতে চেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী।

কিন্তু বেশিদিন সে সুখ তাঁর সইল না। মার্কিনীদের আগ্রহে পাকিস্তানের ক্ষমতাশালী গোষ্ঠি ডেকে নিয়ে এলেন বগুড়ার মহম্মদ আলীকে আমেরিকা থেকে। তিনি নিঃস্বার্থভাবে সেবা করলেন পশ্চিম পাকিস্তানী প্রভুদের। পাকিস্তানকে ভিড়িয়ে দিলেন মার্কিন সামরিক জোটে।

এরপর আওয়ামি লীগ ও যুক্তফ্রন্টের অভ্যুত্থান। হুসেন শহীদ সুরাওয়ার্দি হলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনিও ক্ষমতা পেয়ে আওয়ামি লীগের প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতিকে সামরিক জোটের সঙ্গেই যুক্ত রাখলেন। তবে শহীদ সুরাওয়ার্দিই চীনের দরজা খুলে তাদের সঙ্গে প্রথম বোঝাপড়ায় আসবার চেষ্টা করেন। তিনি পিকিং গিয়েছিলেন। সে সময় মুজিবরও গিয়েছিলেন চীনে একটি মৈত্রী-প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে। ১৯৫৬-৫৭ সাল তেরো মাস তিনি ছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী! সুরাওয়ার্দির পর প্রধানমন্ত্রী হলেন কট্টর রক্ষণশীল পাঞ্জাবি সিভিলিয়ান চৌধুরী মহম্মদ আলি। পূর্ব বাংলায় সংখ্যালঘুদের ওপর উপীৎড়ন তার সময়েই সুরু এবং পূর্ববাংলা থেকে সংখ্যালঘুদের বিতাড়নের ষড়যন্ত্রও হয় সেই সময়েই। পশ্চিম পাকিস্তানীরা চেয়েছিলেন এভাবেই পূর্ববাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠতা হ্রাস করতে।

কিন্তু পাকিস্তানের অস্থির সিংহাসনে কারো আসনই স্থায়ী হলনা। একের পর এক বদল হতে লাগল দৃশ্য চলচ্চিত্রের মতো। এলেন ইসমাইল ইব্রাহিম চুন্দ্রিগড় এবং সর্বশেষ মালিক ফিরোজ খাঁ নুন। সামরিক শাসন প্রবর্তিত হবার সময়ে পাকিস্তানের প্রধান ছিলেন নুন সাহেব।

এদিকে পূর্ববালায়ও তখন অস্থিরতা। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৮ সালের মধ্যে পূর্ববাংলায় ন'টি মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে। সামরিক শাসন জারি হবার প্রাক্কালে পূর্ববাংলায় অল্পদিনের জন্য ছিল আওয়ামি লীগের মন্ত্রিসভা। মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন আতাউর রহমান খান।

১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বরে পূর্ববালার আইনসভায় এক বিশৃঙ্খলা ও শোচনীয় পরিস্থিতিতে ডেপুটি স্পীকারে শাহেদ আলী বিরোধী দলে বিক্ষুব্ধ কোনো সদস্যের দ্বারা নিক্ষিপ্ত বস্তুর আঘাতে গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে মারা যান।

এই হল চরম পরিণতি।

প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মীর্জা এই সুযোগই খুঁজছিলেন। পূর্ববাংলার মুসলিম লীগ পড়ে আছে মুখ থুবড়ে। তার ওঠবার আর আশা নেই। বাঙালীদের চাপে বাংলাভাষার স্বীকৃতি দিতে হয়েছে। কিন্তু তারা যৌথ নির্বাচনের পক্ষপাতী। যতবারই মন্ত্রিসভা গঠিত হবে, আওয়ামি লীগেরই থাকবে প্রাধান্য। স্বায়ত্ত শাসনের দাবিতে তারা অটল।

এই অবস্থায় মীর্জা তাঁর পাঞ্জাবি সেনানায়কদের সঙ্গে পরামর্শ করে সামরিক আইনের লৌহবেষ্টনীতে বাঁধলেন সারা দেশ। মীর্জা পশ্চিম পাকিস্তানের অনুগত হলেও তিনি পাঞ্জাবি নন। বাংলাদেশে তার আদিবাস। সুতরাং মীর্জার দিনও ফুয়িয়ে এল। সামরিক শাসন প্রবর্তিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশে সুরু হল রাজনৈতিক নেতাদের নির্যাতন। বামপন্থীদের তো আগেই জেলে পোরা হল। পূর্ববাংলার জননায়ক মৌলানা ভাসানী, শেখ মুজিবর রহমান, পশ্চিম পাকিস্তানের বহু প্রগ্রতিশীল নেতা এবং আজীবন যোদ্ধা সেই নির্ভীক সত্যসন্ধানী পাঠান খান আবদুল গফ্‌ফর খান, বালুচ নেতা আবদুল সামাদ প্রমুখ সকলেই কারান্তরালে চলে গেলেন সামরিক শাসকের নির্দেশে।

সামরিক প্রেসিডেন্ট মীর্জা ও তার সহযোগী মহম্মদ আইয়ুব খাঁ বললেন, পাকিস্তানে একটি রক্তপাতহীন বিপ্লব অনুষ্ঠিত হল। কতরক্ত এই ক্ষুধার্ত নেকড়েরা পান করেছিল তার সংবাদ বাইরে বেরুতে পারল না। স্বাধীনতাকামী বালুচ, পাখতুন এবং বাঙালীদের ওপর চলল এক হৃদয়হীন অত্যাচার।

সব সামরিক শাসকরাই চান তাঁদের সম্পর্কে যেন মানুষের ধারণা

থাকে এই যে, তারা অতি দয়ালু, প্রগতিশীল এবং জনগণের রক্ষক। গণতন্ত্রের প্রতিই তাঁদের আস্থা। তবে দেশের অবস্থার জন্য বাধ্য হয়েই তাঁদের কঠোর ব্যবস্থা নিতে হয়।

ইস্কান্দার মীর্জা মুর্খের স্বর্গে বাস করছিলেন তখন। তিনি ভেবেছিলেন পাঞ্জাবিদের সঙ্গে মিলেমিশে তিনি ক্ষমতার তক্তে থাকতে পারবেন।

পাকিস্তানের-বিদেশী বন্ধুরা চাইছিল অন্যরকম। সুতরাং ১৯৫৮-র ২৪ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট মীর্জা ঘোষণা করলেন একটি আধা-সামরিক মন্ত্রিসভা গঠনের কথা। তার প্রধানমন্ত্রী হলেন জেনারেল আইয়ুব খাঁ।

২৭ অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব, পরে যিনি নিজেই নিজেকে ফিল্ড মার্শাল ঘোষণা করেন, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন। বলা হল, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের এ হল একটি ধাপ। মীর্জা প্রেসিডেন্ট, আইয়ুব তাঁর প্রধানমন্ত্রী। প্রেসিডেন্টের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিলেন প্রধানমন্ত্রী আইয়ুব। আইয়ুব শুধু প্রধানমন্ত্রী নন, তিনি সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কও। প্রতিরক্ষা এবং কাশ্মীর দফতরের ভারও নিলেন তিনি নিজে। প্রধান সামরিক প্রশাসকের দায়িত্বও হাতছাড়া করলেন না তিনি।

আইয়ুবের মন্ত্রিসভার দুই তৃতীয়াংশ হলেন অসামরিক ব্যক্তি এবং এক তৃতীয়াংশ হলেন সেনাবাহিনীর জেনারেল। বাঙালী মন্ত্রীর সংখ্যা হল এক তৃতীয়াংশ। বলা হল, পাকিস্তানের রাজনীতিকরা পরস্পরের সঙ্গে খেওখেওয়ি করে দেশকে রসাতলে দিচ্ছিলেন। তখন সব দেশপ্রেমিক সৎ ও উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করা হল দেশ বাঁচাবার জন্য।

একবার রক্তের স্বাদ পেলে বাঘ কি তার শিকার ছাড়ে? আইয়ুব প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা পাবার দুঘণ্টা পরেই প্রেসিডেন্ট মীর্জাকে চিঠি লিখে জানালেন, এক আকাশে দুই সূর্য থাকতে পারেনা। মীর্জা বুঝলেন। তাঁর আর কিছু করার ছিল না। সেনাবাহিনীর

হাতের পুতুল হয়ে তিনি পাকিস্তানের সংবিধান ধ্বংস করেছেন। এখন কী আর তিনি জনসাধারণের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারেন।

মীর্জা বিদায় হলেন। অশ্বত্থ গাছ থেকে জীর্ণতম পাতা খসে পড়লে যেমন কোনো আলোড়ন জাগে না—পাকিস্তানের রাজনীতির ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ প্রেক্ষাপট থেকে ইস্কান্দর মীর্জার উপেক্ষিত অন্তর্ধানও তেমনি কোনো চাঞ্চল্য জাগাল না দেশবাসীর মনে। মীর্জা নিজের হাতে পদত্যাগপত্র সই করে দেশবাসীকে জানালেন, দেশের স্বার্থেই তিনি সরে দাঁড়াচ্ছেন যাতে নতুন মন্ত্রিসভা দ্বিধাহীন আনুগত্য ও একাগ্রতার কাজ করতে পারে।

প্রেসিডেণ্ট মীর্জা করাচীর প্রাসাদভবন ত্যাগ করে নজরবন্দী অবস্থায় চলে গেলেন কোয়েটায়। সেখান থেকে পাড়ি জমালেন লণ্ডনে। লণ্ডনে গিয়েও একটি কথা তিনি বললেন না, আইয়ুবের বিরুদ্ধে। শোনা যায়, আইয়ুব নাকি মীর্জাকে বলেছিলেন যে, তিনি তাঁর বিরুদ্ধে কোনো কথা বললে তাঁর কীর্তিকলাপ সব ফাঁস করে দেওয়া হবে এবং তাঁর অসদুপায়ে অর্জিত সমস্ত সম্পত্তি হবে বাজেয়াপ্ত।

মীর্জা কথা রেখেছিলেন। পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেণ্ট শেষ জীবন কাটান লণ্ডনের এক বড় আন্তর্জাতিক হোটেলের ম্যানেজার রূপে। পাকিস্তানী 'বিপ্লবের' কী করুণ পরিণতি।

আইয়ুব হলেন পাকিস্তানের নয়া প্রেসিডেণ্ট। সুরু হল পাকিস্তানের রাজনীতিতে সামরিক ডিক্টেটরশিপ যাকে আইয়ুবশাহী যুগ নামে চিহ্নিত করা যায়।

পাকিস্তানের জনগণের গণতান্ত্রিক আকাঙ্খাকে ব্যর্থ করার এই চক্রান্ত শুধু মীর্জা বা আইয়ুবের জন্যই হয় নি। তাদের পিছনে ছিল অন্য শক্তি যারা পাকিস্তানকে একটি ডিক্টেটর শাসিত রাষ্ট্রে পরিণত করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে চেয়েছিল। এই ঘটনার কয়েকবছর পরে ১৯৫২ সালে পাকিস্তান ন্যাশনাল এসেম্বলিতে বিরোধী দলের সদস্য আইয়ুবের কনিষ্ঠ সহোদর সর্দার বাহাদুর খান বলেছিলেন,

মার্কিণ সরকার প্রেসিডেন্ট মীর্জাকে বাধ্য করেছিল দেশে সামরিক আইন জারী করতে।

পূর্ববাংলার জাগ্রত জনমতের সঙ্গে পাকিস্তানের পশ্চিমী শাসক-চক্রের ব্যবধান ছিল দুস্তর। পূর্ববাংলার মানুষ নিজেদের জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিল যে, পশ্চিমের সঙ্গে তার মিল নেই। পশ্চিম পাকিস্তানীদের মুখ মধ্যপ্রাচ্য বা পশ্চিম এশিয়ার দিকে ফেরানো। ইরান, তুরস্ক, সৌদী আরবকে তারা যত কাছের মনে করে দূরের পূর্ব বাংলাকে তা মনে করে না। বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলন তাই তাড়াতাড়ি নিজেকে প্রসারিত করল সমাজের সকল শ্রেণীর মধ্যে। তারা ইঙ্গ মার্কিন শক্তিগোষ্টির লেজুড় হয়ে থাকতে চাইল না। তারা চাইল জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি, শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থান, প্রতিবেশীর সঙ্গে মৈত্রী। তারা চাইল নিজেদের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রনের সম্পূর্ণ অধিকার। তারা আশা প্রকাশ করল, শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার। পশ্চিম পাকিস্তান দেখল এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে তাদের বিপদ সংকেত।

বিদেশী শক্তিরাও পাকিস্তানকে একটি সামরিক রাষ্ট্রে পরিণত করে রাখতেই আগ্রহী। কারণ, ভারতবর্ষে তারা সামরিক দিক দিয়ে পা রাখবার জায়গা পায়নি। পঞ্চাশের দশকের গোড়াতেই ভারত ঘোষণা করেছিল তার জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি। কোনো সামরিক জোটে সে যোগ দিল না। কোনো বিদেশী শক্তিকে সে তার নিজের মাটিতে ঘাঁটি বানাতে দিতে অসম্মত হল। পাক ভারত উপমহাদেশ পৃথিবীর স্নায়ুযুদ্ধের পটভূমিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক এলাকা। ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক আন্দোলন ক্রমশই এত শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে, পাশ্চাত্য বিদেশী শক্তিসমূহের পক্ষে এখানে প্রকাশ্যে দাঁত বসাবার কোনো সুযোগই পায়নি। তাই তাদের নজর পড়ল পাকিস্তানের দিকে।

তাদেরই স্বার্থে পাকিস্তানকে করা হল 'সিয়াটো (দক্ষিণ-পূর্ব

এশিয়া চুক্তি সংস্থা) এবং সেনটো-র (কেন্দ্রীয় চুক্তি সংস্থা) সদস্য। তুরস্ক থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণ ভিয়েতনাম পর্যন্ত পশ্চিমী সামরিক জোটের লৌহবাহু আলিঙ্গনাবদ্ধ করে রাখল পাকিস্তানকে। উদ্দেশ্য, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীনকে তিনদিক থেকে ঘিরে রাখা।

পাকিস্তানের সুবিধা হল এই চুক্তির দৌলতে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র পেল বিনামূল্যে। অর্থ আসতে লাগল বিস্তর। ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতিতে এই অস্ত্র এবং অর্থ তাদের কাজে লাগবে।

এই সমস্ত সামরিক চক্রান্তে পূর্ব বাংলার মানুষের কোনো হাত ছিল না। তাদের সঙ্গে কোনো পরামর্শও করা হয়নি। যাতে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে না ওঠে এবং তারা স্বায়ত্তশাসনের দাবি নিয়ে আন্দোলন না করতে পারে তার জন্যই সংবিধান বাতিল করে আইয়ুব খাঁকে বসানো হল।

আইয়ুব ক্ষমতা হাতে নিয়েই রাজনীতিকদের কারারুদ্ধ করলেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে এমন সেনানায়কদের অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য করলেন। তাঁর অন্যতম প্রধান কাজ হল করাচী থেকে রাজধানী রাওয়ালপিণ্ডি সরিয়ে নেওয়া।

এ যেন মুহম্মদ বিন তুঘলকের মতো। তবে তুঘলক ছিলেন অস্থির মস্তিস্ক। আইয়ুব ঠাণ্ডা মাথায় অনেক ভেবে চিন্তেই নিলেন এ সিদ্ধান্ত। পাঞ্জাবিদের স্বার্থ এবং তাদের আধিপত্য বজায় রাখতে হলে রাজধানীও হতে হবে পাঞ্জাবেই, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদর দফতরের কাছে-পিঠে।

একবার করাচীকে উন্নত করার জন্য বাংলাদেশ থেকে ছিনিয়ে আনা কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হল। আবার টাকা চাই রাওয়ালপিণ্ডির উপকণ্ঠে নতুন রাজধানী ইসলামাবাদ তৈরি করার জন্য।

বাংলাদেশের মানুষ প্রতিবাদ জানাল। নতুন রাজধানীই যদি

করতে হয় তবে তা সংখ্যাগরিষ্ঠ পাকিস্তানীদের বাস বাংলাদেশে ঢাকায় হবে না কেন ?

আইয়ুব তা শুনলেন না। সামরিক শাসনের ক্ষিপ্রতায় রাজধানী স্থানান্তরিত হয়ে গেল রাওয়ালপিণ্ডিতে। বাঙালীদেরও তিনি দিলেন ছিটেফোঁটা। ঢাকাকে অভিহিত করা হল বিকল্প রাজধানী হিসেবে। ওখানেও ন্যাশনাল এসেম্বলির অধিবেশন বসবে। কিন্তু বাংলাদেশের আসল দাবি, স্বায়ত্তশাসন রইল সম্পূর্ণ। আইয়ুব একটার পর একটা আইন জারি করে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করতে লাগলেন নিজের হাতে।

॥ ১০ ॥

The rest is silence.

Shakespeare, Hamlet, V, 2.

বাংলদেশের মানুষ চেয়েছিল গণতন্ত্র, তারা পেল আইয়ুবের বেসিক ডেমোক্র্যাসি বা মৌলিক গণতন্ত্র।

গণতন্ত্র কথাটা ডিক্টেটরদের মুখে খুব বেশি শোনা যায়। কারণ গণতন্ত্রের সমাধির ওপরেই তাদের অধিষ্ঠান। পাকিস্তানকে কিছুতেই তার স্বাভাবিক অবস্থায় যেতে দিল না পশ্চিম পাকিস্তানের একটি শক্তিশালী চক্র যারা কোনো না কোনো উপায়ে নিজেদের ক্ষমতার আসন, শোষনের যন্ত্র অটুট রাখবার দিকেই দৃষ্টি রাখত সব সময়।

এরা পশ্চিম পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমন করত এই বলে যে, এর ফলে পূর্ব বাংলা পাকিস্তান থেকে বিছিন্ন হয়ে যাবে। পূর্ব বাংলায় আন্দোলন দেখা দিলে তারা বলত, এ হল ভারতের গুপ্তচরদের কাজ।

আইয়ুব তো শেষ পর্যন্ত শেখ মুজিবর রহমানকে একটি মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে ফাঁসি দিতে চেয়েছিলেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে খ্যাত এই সাজানো মামলাটি আইয়ুবের অনুচররাই অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে তৈরি করেছিল। তার প্রধান আসামী বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক শেখ মুজিবর রহমান। মামলার প্রতিপাদ্য ছিল এই যে, শেখ মুজিবর ও তাঁর অনুগামীরা

ভারতের সেনাবিভাগের লোকজনদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র করছেন। এ উদ্দেশ্যে আগরতলা থেকেই সুরু হয় ষড়যন্ত্রের প্ল্যান ও প্রোগ্রাম।

১৯৫৮ সালের জানুয়ারিতে মামলাটি হয়। পাকিস্তান সরকার অভিযোগ করেন যে, দুজন সিভিলিয়ান অফিসার সহ ২৮ জন আসামী এই বিচ্ছিন্নতাকামী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তাদের কেউ কেউ নাকি ঢাকায় ভারতীয় হাই কমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি পি, এন, ওঝার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। তাঁর সঙ্গেই ওরা আগরতলা গিয়ে এই ষড়যন্ত্রের বিষয় আলোচনা করেন ভারতীয় লেফটেন্যান্ট কর্ণেল মিশ্র, মেজর মেনন ও অন্যান্যদের সঙ্গে।

শেখ মুজিবর রহমান এর আগেই আটক আইনে বন্দী ছিলেন আইয়ুবের কারাগারে। তাঁকেও জড়ানো হল এই মামলায়। আইয়ুব বিশেষ অর্ডিন্যান্স জারি করে এই মামলা বিচারের জন্য একটি স্পেশ্যাল ট্রাইবুন্যাল গঠন করেন।

এ হল আইয়ুবের জালিমসাহীর অন্তিম অধ্যায়ের ঘটনা। মুজিবরকে ফাঁসি দিয়ে এই ক্ষমতালোভী শাসক পূর্ব বাংলার গণ আন্দোলন স্তব্ধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা তিনি পারেননি। মিথ্যা মামলার ফানুস যায় ফুটো হয়ে এবং তার অল্পদিন পরেই আইয়ুবকেও সরে যেতে হয় রাজনীতির মঞ্চ থেকে তাঁর পুর্বসূরী ইস্কান্দর মীর্জার মতো। মুজিবরকে বিনা সর্তে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় পাকিস্তান সরকার।

শেষের আগেও সুরু আছে। আইয়ুবের সুরু আমরা দেখেছি। এক ক্ষমতাকাঙ্খী পাঠান, পাক-ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বৃটিশের আনুগত্য ছিল যাঁর জীবনের ধ্যানজ্ঞান, তিনি ১৯৫৮ সালে ক্ষমতা পেয়ে প্রথমে যে কাজটি করলেন তাহল পাকিস্তানের সংবিধান বাতিল করা।

দীর্ঘ দশ বছরের চেষ্টায়, অনেক বাধা বিপত্তি এড়িয়ে ১৯৫৬

সালে যদিও বা একটি সংবিধানের খসড়া তৈরি হয়েছিল, সামরিক শাসকের এক তরবারির খোঁচায় গেল সেই সংবিধান কোতল হয়ে।

আইয়ুব শক্তহাতে পাকিস্তান শাসনের ভার নিলেন। সব ডিক্টেটরই তা করে থাকেন। এই কাজে তার সহায়ক হলো পশ্চিম পাকিস্তানের বিত্তশালী জমিদার, পুঁজিপতি, নয়া বুর্জোয়া এবং সামরিক শাসনের প্রসাদপুষ্ট লোকেরা। ক্ষমতা পেয়েই আইয়ুব এক আদেশ জারি করে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক নেতাদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বিরত করে দিলেন ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত। এই আদেশ দুটির নাম পাবলিক অফিসেস্ ডিসকোয়ালিফিকেশন অর্ডার, সংক্ষেপে PODO এবং ইলেকটিভ বডিজ ডিসকোয়ালিফিকেশন অর্ডার বা EBDO। এই আদেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতার নাম ধরে ধরে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হল যে, তাঁরা ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত কোনোরকম নির্বাচনে বা নির্বাচিত সংস্থার প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন না। বেছে বেছে এমন নেতাদেরই নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল যাঁদের কাছ থেকে আইয়ুব রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ আশঙ্কা করছিলেন।

এই হল আইয়ুবী শাসনের প্রথম পরিচয়।

সংবাদপত্র, সভাসমিতি ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপর জারি হল কঠোর নিয়ন্ত্রনাদেশ। অন্যদিকে যে সমস্ত শ্রেণী আইয়ুবকে ক্ষমতা দখলে সহায়তা করেছিল তাদের জন্য তিনি 'লোক-দেখানো বৈপ্লবিক ভূমিসংস্কার ও শিল্পনীতি' প্রবর্তন করলেন।

১৯৫৯-৬০ সালে আইয়ুবী বিপ্লবের প্রথম দুই বছরে যে-ধরণের ভূমিসংস্কার নীতি কার্যকর করা হয়েছিল তাতে জমিদারী বা মধ্যস্বত্ব লোপের কোনো নামগন্ধ ছিল না। কৃষিপণ্য উৎপাদনে সহায়তার নামে পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাবি, পাঠান ও সিন্ধী জমিদার মধ্য-স্বত্বভোগীদেরই সুবিধা করে দেওয়া হল। বড় জমিদারির ওপর খানিকটা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে পুঁজিবাদী ভিত্তিতে জমিদারি পরিচালনার উৎসাহ দিল নতুন জঙ্গী আইন। এতে লাভবান হল

পূর্ব বাংলার গরীব চাষীরা নয়। কারণ তাদের অধিকাংশের হাতেই জমির মালিকানা ছিল না। লাভবান হল পশ্চিম পাকিস্তানের গ্রামীন বুর্জোয়া শ্রেণী, নব্য-ধনী সম্প্রদায়। তারাই আইয়ুবী জঙ্গী শাহীর প্রধান সমর্থক ও স্তাবকে পরিণত হল।

এই নব্য-ধনী কৃষক সম্প্রদায় থেকে আসত পাঞ্জাবি সামরিক শ্রেণীর লোকেরা। তাদের তুষ্ট রাখতে পারলে আইয়ুব তাঁর ক্ষমতার আসনে নিশ্চিন্ত।

শিল্পক্ষেত্রেও আইয়ুবী ফরমান বৃহৎ শিল্পপতি, পুঁজিপতিদের প্রচুর সুযোগ সুবিধা এনে দিল। সরকারী শিল্পোদ্যোগ হল সংকুচিত। সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হল রাওয়ালপিণ্ডির হাতে। প্রাদেশিক সরকারের কোনো ক্ষমতাই রইল না।

পূর্ব বাংলার মানুষ কিছুই পেল না। বরং আইয়ুবের নাম চিরস্থায়ী করবার জন্য ঢাকা শহরের পাশে নতুন এক শহরের পত্তন করলেন, যার নাম হবে আইয়ুব-নগর। প্রবল প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল সেদিন গোটা পূর্ব বাংলায়।

পূর্ব বাংলার কৃষকরা বঞ্চিতের জীবনই যাপন করতে লাগল আগেকার মতোই। অবিভক্ত বাংলায় পূর্ববঙ্গের জমিদার অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু। বিশাল সম্পত্তি নিয়ে এই জমিদাররা রাজসিক স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে আসছিলেন কর্ণওয়ালিশের আমল থেকে। দেশভাগের পর এই জমিদাররা সম্পত্তি ফেলে চলে এলেন ভারতে। এই পরিত্যক্ত সম্পত্তি সরকারের হাতে গেল। আইয়ুবী নির্দেশে পুঁজিবাদী ধারায় কৃষিউন্নয়নের কর্মসূচীতে নিঃস্ব বাঙালী কৃষক এগিয়ে আসতে পারল না। পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজিপতিরা এসে সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে লাগল।

পূর্ব বাংলার ভূমি-সমস্যার সমাধান উপেক্ষিতেই রয়ে গেল। মুসলিম কৃষকের দুঃখ যেমন ছিল তেমনই রইল। আইয়ুব অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠলেন। রাজনীতিক দলগুলোর কার্যকলাপ বন্ধ। রাজনৈতিক

নেতাদের ওপর নিষেধাজ্ঞার খড়্গ দোদুল্যমান। তিনি ঘোষণা করলেন, পাকিস্তানকে তিনি একটি নতুন ধরণের গণতন্ত্র দেবেন। তার নাম হল বেসিক ডেমোক্র্যাসি। সীমিত ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হবে এই গণতন্ত্রের প্রতিনিধিরা। গোটা দেশকে ভাগ করা হল দশ থেকে পনেরো হাজার লোকসংখ্যার ভিত্তিতে এক একটি নির্বাচন কেন্দ্রে। এদের বলা হল ইউনিয়ন কাউনন্সিল। বৃটিশ আমলের ইউনিয়ন বোর্ডের মতো। প্রত্যেক কাউন্সিলে দশ থেকে বারোজন সদস্য নির্বাচিত হবেন। ইউনিয়ন কাউন্সিলেও শতকরা ৩০ ভাগ সদস্য থাকবেন সরকার মনোনীত। এর পরে থাকবে তহ্‌শীল কাউন্সিল, জেলা কাউন্সিল এবং ডিভিশন্যাল কাউন্সিল। এদের থেকে আবার নির্বাচিত হবে প্রাদেশিক কাউন্সিল এবং প্রাদেশিক কাউন্সিল নির্বাচন করবেন কেন্দ্রীয় সরকার। এতে সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রয়োগের কোনো ব্যবস্থা ছিলনা। পাকিস্তানের দুই অংশে পরোক্ষভাবে, কোনো রাজনৈতিক দলের লেবেল না নিয়ে, নির্বাচিত ৪০ হাজার করে ৮০ হাজার বেসিক ডেমোক্র্যাটই হলেন আইয়ুবী গণতন্ত্রের ভোটার। তখন পাকিস্তানের লোকসংখ্যা প্রায় দশ কোটি।

আইয়ুবের এই সংবিধান তৈরী হল ১৯৫৬ সালে। ১৯৫৬-র ডিসেম্বরে হল প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। এই পকেট গণতন্ত্রের ভোটে আইয়ুব হলেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সমস্ত বিরোধী দলের মনোনীত প্রার্থী মিস ফতিমা জিন্নাহ্‌ নির্বাচনে পরাজিত হলেন। মিস জিন্নাহ্‌র প্রধান সমর্থন এসেছিল পূর্ব বাংলা থেকে। জঙ্গী শাসনকে একটা ভুয়া গণতন্ত্রের পোষাক পরিয়ে হাজির করা হল দুনিয়ার সামনে।

ততদিনে ভারতে তিনটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং বিভিন্ন রাজ্যে প্রতি নির্বাচনেই গঠিত হয়েছে নতুন নির্বাচিত মন্ত্রিসভা। ভোটারের সংখ্যা প্রতিবারেই বেড়েছে এবং এই নির্বাচন

পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের প্রধান মুখ্য নির্বাচন কমিশনার।

পাকিস্তান সৃষ্টির ১৫ বছর পরে তার জনগণের ভাগ্যে জুটল এক আজব গণতন্ত্র, আজব সংবিধান—বেসিক ডেমোক্র্যাসি। একটার পর একটা ব্যর্থতা ও হতাশা পূর্ববাংলার জনমানসকে আচ্ছন্ন করে রাখল। প্রতিবাদ উঠল—পশ্চিম পাকিস্তানেও। কারণ সেখানেও প্রদেশগুলোর অস্তিত্ব বিলোপের পর সিন্ধী পাখতুন ও বালুচরা মর্মে মর্মে অনুভব করছিল যে, ইংরেজদের তাড়িয়ে তারা নয়া স্বদেশী প্রভুদের দাসত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। এই প্রভু হল পাঞ্জাবের ধনিক-বণিক পুঁজিপতি বুর্জোয়ারা।

হাতে-তৈরি গণতন্ত্র এবং নিয়ন্ত্রিত নির্বাচনের মাধ্যমে আইয়ুব ক্ষমতায় আরও জাঁকিয়ে বললেন। ন্যাশনাল এসেম্বলি বা প্রাদেশিক আইনসভার ক্ষমতা হল অনেকটা বিতর্ক সভার মতো। প্রেসিডেন্টের সম্মতি ছাড়া এই দুই পরিষদে গৃহীত কোনো বিলই আইনের স্বীকৃতি পাবেনা। এবং যেহেতু বেসিক ডেমোক্র্যাসিতে প্রেসিডেন্ট ঠুঁটো জগন্নাথ নন, তিনি তাঁর মন্ত্রিসভার পরামর্শ বিনা দ্বিধায় মানতে বাধ্য নন।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতাও খর্বিত হল আইয়ুবী সংবিধানে। আইনসভায় গৃহীত কোনো আইনের যৌক্তিকতা বা তার অধিকার সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার ক্ষমতা থাকল না বিচার বিভাগের।

পূর্ববাংলার আইনসভা যাতে এই সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও কোনোরূপ আইন পাশ করে তার স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলে ধরতে না পারে তার ব্যবস্থা আইয়ুব করে রেখেছিলেন তাঁর সংবিধানে। সংবিধানে বলা ছিল যে, কোনো কেন্দ্রীয় আইনের সঙ্গে প্রাদশিক আইনের উদ্দেশ্যমত বিরোধ বা অসঙ্গতি দেখা দিলে কেন্দ্রীয় আইনই থাকবে বলবৎ, প্রাদেশিক আইন হবে বাতিল।

এ এক আশ্চর্য সংবিধান। ষাটের দশকে একটি রাষ্ট্রে যে এমন

এক একনায়কতন্ত্রী শাসন চালু হতে পারে। পাকিস্তানে আইয়ুবের কাণ্ডকারখানা না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত হত।

প্রেসিডেন্টের ভাষণ নিয়ে কোনো বিতর্ক ন্যাশনাল এসেম্বলিতে নিষিদ্ধ করলেন তিনি। ন্যাশনাল এসেম্বলির হাত পা বেঁধে শুধু একটি আলোচনা সভায় পরিণত করে আইয়ুব দুনিয়ার মানুষকে ধোঁকা দিলেন—পাকিস্তানে গনতন্ত্রই কাজ করছে। সামরিক শাসন নয়।

এই ভাবে দোর্দণ্ড প্রতাপেই তিনি রাজত্ব করছিলেন। তাঁর আমলে পশ্চিম পাকিস্তানে তেরোটি পুঁজিপতি পরিবার ফুলে ফেঁপে গোটা পাকিস্তানের অর্থনীতির নিয়ন্তা হয়ে উঠল।

নিশ্চিন্তই হয়েছিলেন আইয়ুব। পাঁচ বছরের জন্য তিনি প্রেসিডেন্ট হলেন মিস ফতেমা জিন্নাহ্‌র মতো প্রার্থীকে হারিয়ে। এই নির্বাচনে মিস্‌ জিন্নাহ্‌ পূর্ব বাংলায় সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানে ও করাচীতে তিনি ছিলেন অগ্রবর্তী। কিন্তু শাসক ডিক্টেটরের সঙ্গে নির্বাচনে লড়ে জয়লাভ কেউ কোনোদিন করতে পারেনি। কারণ, নির্বাচনের ফলকে কীভাবে নিজের দিকে টানতে হয় এ-কৌশল তাদের নখদর্পণে।

পূর্ববাংলার মানুষ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন গণতান্ত্রিক মানুষ মিস্‌ জিন্নাহ্‌কে ভোট দিয়েছিলেন গণতন্ত্রের জন্য। মিস্‌ জিন্নাহ্‌ আশ্বাস দিয়েছিলেন, তিনি গণতন্ত্রের সঙ্গে থাকবেন, একনায়কতন্ত্রের সঙ্গে নয়।

তাঁর পরাজয় পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক আশাকে বিষাদ লিপ্ত করে দিল। কত দীর্ঘদিন তারা সংগ্রাম করছেন। বৃটিশ আমল থেকেই সুরু এই সংগ্রামের। পূর্ব বাংলার মানুষ যদি সমর্থন না করত তাহলে বাংলাদেশ ভাগও হত না, জিন্নাহ্‌র পাকিস্তানও হত না। ১৯৪৬ সালেও মহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌ জানতেন না পাকিস্তানের চেহারা কী রকম হবে। বাংলাদেশে মুসলিম লীগ সরকার এবং তার প্রধান

সুরাওয়ার্দি চেষ্টা না করলে পাকিস্তান বর্তমান চেহারা নিয়ে কোনোদিনই দেখা দিত না।

সেই বাংলাদেশের মানুষ, তার মুসলিম জনসাধারণ ও প্রায় এককোটি সংখ্যালঘু হিন্দু, পশ্চিম পাকিস্তানের চক্রান্তে দাস হয়ে রইল পাকিস্তান সৃষ্টির ২৩ বছর পরও।

এই দুর্দশা শুধু পূর্ব বাংলার মানুষের নয়, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাখতুন ও বালুচিস্তানের বালুচদেরও। একথা মনে করলে ভুল হবে যে, পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বত্র এদের একই ব্যবহার। বালুচ, পাখতুনদের ওপর পাকিস্তান সরকার অনেক আগেই বোমা ফেলেছে, মেশিনগান চালিয়েছে, ঘরবাড়ি দিয়েছে পুড়িয়ে। ওদের অপরাধ, ওরাও চেয়েছিল স্বায়ত্তশাসন।

আইয়ুবের বড় গর্ব ছিল যে তিনি ক্ষমতা দখল করেছেন বিনা রক্তপাতে। একথা সত্য ইস্কান্দর মীর্জার রক্তপাত তিনি ঘটান নি। কিন্তু তাঁর শাসনকালে বিক্ষুব্ধ পাকিস্তানী সাধারণ মানুষের কত রক্ত সেই দেশের মাটি রঞ্জিত করেছে তার হিসেব তিনি দেননি। সংবাদপত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞার মুখোস পরিয়ে তিনি সামরিক কায়দায় বালুচিস্তানে, পাখতুনদের বাসভূমিতে এবং বাংলাদেশে গণতন্ত্রকামীদের হত্যা করেছেন।

অবিভক্ত ভারতের স্বাধীনতা যোদ্ধা খান আবদুল গফফর-খাঁর জায়গা হল না কেন পাকিস্তানে ? আইয়ুব ও তাঁর পূর্বসূরী সকলেই এই বৃদ্ধ মানুষটিকে বিনাবিচারে কারাগারে নিক্ষেপ করে চালিয়েছেন শাসন। গফফর খাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডঃ খান সাহেব পাখতুন আন্দোলন ত্যাগ করে পাকিস্তানের রাজনীতিতে অবশ্য একটা স্থান করে নিয়েছিলেন। তিনি এক ইউনিট পশ্চিম পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রীও হয়েছিলেন এক সময়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকেও প্রাণ দিতে হয়েছিল আততায়ীর হাতে। গফফর খাঁ আইয়ুবী অত্যাচারে ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে আফগানিস্তানে নির্বাসিত জীবন যাপনে বাধ্য হলেন।

এমন ব্যক্তিই মিস্ ফতিমা জিন্নাহ্‌কে হারিয়ে ১৯৫৬ সালে আবার পাঁচ বছরের জন্য প্রেসিডেণ্ট হয়ে যখন বসলেন তখন বাংলাদেশের ও পশ্চিম পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা সম্পন্ন মানুষ তাদের মুক্তির আশা সম্পর্কে ভগ্নোৎসাহ হলেন স্বাভাবিক কারণেই।

কিন্তু ডিক্টেটরদেরও সুসময় আর দুঃসময় আছে। আইয়ুব তাঁর শাসনের দশবছর পূর্তি মহোৎসাহে পালন করলেন ১৯৫৮ সালে। তাঁর প্রচারবিদরা বোঝালেন, এমন সুদিন আর আসেনি পাকিস্তানে। খাইবার থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত পাকিস্তানের জনগণ এই প্রেসিডেণ্টের শাসনে সুখ, সমৃদ্ধি এবং মৌলিক গনতন্ত্রের আস্বাদ পেয়ে তৃপ্ত।

প্রচার করেছিল গোয়েবলস্‌ও। কিন্তু নাৎসীরা ইতিহাসের বিস্মৃতির অতলে গেছে তলিয়ে। আইয়ুব ১৯৫০ সালে তাঁর পুনর্নির্বাচনের জন্য জমি প্রস্তুত করছিলেন। এদিকে এবডো-র মেয়াদ ফুরিয়ে যাবার পর রাজনীতিকরা আবার এলেন আসরে। পূর্ব বাংলায় আওয়ামি লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামি পার্টি প্রমুখ গণতান্ত্রিক দল স্বায়ত্ত শাসন, পার্লামেণ্টারি প্রথায় প্রত্যাবর্তন, সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলতে লাগলেন।

আইয়ুবের পকেট গনতন্ত্রের বিরুদ্ধে ছাত্রশক্তি রুখে দাঁড়াল। এই ছাত্র অধিকাংশই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর জন্ম গ্রহণ করেছিল। সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা বা ভারত-বিদ্বেষের জিগির তুলে এদের বিভ্রান্ত করা আর সহজ হচ্ছিল না পাকিস্তানী নেতাদের পক্ষে। পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক মুক্তি যদি আসে তবে তার পুরোভাগে আমরা নিশ্চিতই দেখতে পাব নতুন যুগের এই তরুণদলকে। এই তরুণরাই বহু ত্যাগ স্বীকার করে বাংলাদেশে পাকিস্তানী শাসনের ভিত্তি টলিয়ে দিয়েছিল।

আইয়ুব দেখলেন, যত শক্তিশালী তিনি নিজেকে মনে করেছিলেন তত শক্তি তাঁর আর নেই। পূর্ব্ব বাংলায় দিনের পর দিন গড়ে উঠছে বিশাল গণতান্ত্রিক আন্দোলন। শ্রমিক কৃষকরাও সংগঠিত হচ্ছে

বামপন্থী দলগুলোর নেতৃত্বে। আয়ুবের প্রসাদপুষ্ট মুসলিম লীগের নেতারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন। তাঁর অতি প্রিয় ও বিশ্বস্ত পূর্ব্ব বাংলার গভর্নর মোনেম খাঁ পুলিশ, মিলিটারি দিয়ে বাঙ্গালীদের শায়েস্তা করতে পারছেন না।

'এবডো'-র নিষেধাজ্ঞা মুক্ত রাজনীতিকরা ১৯৫৭ সালে ঢাকায় একটি সম্মেলনে মিলিত হয়ে পাঁচপার্টির পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক মুভমেণ্ট নামে একটি আন্দোলন গড়লেন। তার পুরোধা ছিল আওয়ামি লীগ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামাত-ই-ইসলাম, নিজাম-ই-ইসলাম এবং ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রণ্ট। আটদফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে এরা একসঙ্গে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তনের দাবিতে কাজ করতে প্রতিশ্রুতি নিল।

আওয়ামি লীগ তার স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে অটল। তার ছ'দফা থেকে একচুলও নড়ল না। তাই ঠিক হল যে, প্রত্যেক দল তার নিজস্ব বক্তব্য অনুযায়ী কাজ করবে তবে ন্যূনতম কার্যসূচীর ভিত্তিতে তারা আইয়ুবী শাসনের বিরুদ্ধে এক। এই কার্যসূচী হল, পার্লামেণ্টারি পদ্ধতির সরকার চাই এবং সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে চাই নির্বাচন।

স্পষ্টতই আইয়ুবের সংবিধানের ভিত্তিতে আবার নির্বাচনের বিরুদ্ধে ছিলেন এঁরা। এই সময়েই পশ্চিম পাকিস্তানে আইয়ুবের প্রাক্তন 'গ্ল্যামার বয়' প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিন্ধুর লারকানার জমিদার তনয় জুলফিকার আলি ভুট্টো ঘোষণা করলেন তাঁর নতুন পার্টির জন্ম —পাকিস্তান্ পিপলস্ পার্টি। ১৯৫৭ সালের নভেম্বর। তিনশো প্রতিনিধির উপস্থিতিতে এই নতুন পার্টির নেতা ঘোষণা করলেন, ইসলাম, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র এই তিনটি হল তাঁর দলের মূল আদর্শ। ইসলাম আমাদের ধর্মবিশ্বাস, গণতন্ত্র আমাদের নীতি, সমাজতন্ত্র আমাদের অর্থনীতি এবং আমরা জনগণের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী।

কে বলবে এই সেই ভুট্টো যিনি বাংলাদেশকে ঘাতকের মুখে ঠেলে দিয়ে ইসলাম ও গণতন্ত্রের গৌরব বৃদ্ধি করছেন। ভুট্টো বললেন, তাঁর পার্টিই একমাত্র পাকিস্তানকে রক্ষা করতে এবং জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের হাত থেকে ছিনিয়ে আনতে সক্ষম। পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসনের তিনি ঘোর বিরোধী। পাকিস্তানের ঐক্যের নামে তিনি চান একটি শক্ত কেন্দ্রীয় সরকার যার ক্ষমতা চিরকালই থাকবে তাঁর এবং তাঁর মত পশ্চিম পাকিস্তানী ক্ষমতালিপ্সুদের হাতে।

ভুট্টো যদি সত্যকারের সমাজতন্ত্রী ও গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার অনুগামী হতেন তাহলে তিনি এটা স্বীকার করতেন যে, পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যে অঞ্চলে থাকে তারা যদি স্বায়ত্তশাসন চায় তবে তার বিরোধিতা সংখ্যালঘু পশ্চিম পাকিস্তান করে কোন যুক্তিতে। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতই গণতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি। তবে তাতে সংখ্যালঘুর থাকবে সর্বপ্রকার মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং তার রক্ষার দায়িত্ব সংখ্যাগরিষ্ঠের।

পাকিস্তান সৃষ্টি হবার পর সংখ্যাগরিষ্ঠের মত কোনোদিনই যাচাই করে দেখা হয়নি। একবার মাত্র ১৯৫৪ সালে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে পূর্ববাংলায় একটি জনপ্রতিনিধিত্বমূলক মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল। তাকেও পশ্চিম পাকিস্তানী সরকার নাকচ করে দিয়েছিল। কারণ এই সরকার চেয়েছিল বাংলাদেশের জন্য স্বায়ত্তশাসন এবং যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থা।

ভুট্টোর চিন্তাধারার মধ্যে যে এক প্রকাণ্ড গোঁজামিলের জট আছে তা তাঁর কার্যকলাপ ও বক্তব্যেই বোঝা যায়। তিনি তাঁর The Myth of Independence বইয়ে পাক-ভারত সম্পর্কের এক আশ্চর্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: ভারতের সঙ্গে আমাদের কলহ কি চিরন্তন? চিরন্তন কলহ বলে কিছু নেই, আছে চিরন্তন স্বার্থ। পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ রক্ষার উপায় হল যতদিন পর্যন্ত ন্যায়সঙ্গতভাবে সমস্ত বিরোধ-মীমাংসা না হয় ততদিন ভারতের

বিরুদ্ধে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা (কনফ্রনটেশন)। আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হিসেবেই এই কনফ্রনটেশন চালিয়ে যেতে হবে যতদিন না ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে সমস্ত বিরোধ স্বীকৃত আন্তর্জাতিক উপায়ে এবং সমতার মনোভাব নিয়ে মীমাংসার উপযোগিতা উপলব্ধি করে। ভারত একটি বৃহৎ শক্তি নয়। পাকিস্তানের সঙ্গে তার আঞ্চলিক ও অন্যান্য বিরোধ আছে এবং সে চায় পাকিস্তানের ধ্বংস সাধন।”

বিরোধের মীমাংসা নিশ্চয়ই কাম্য। কিন্তু বিরোধ মীমাংসার নামে সামরিক প্রস্তুতি ও কনফ্রনটেশনের নীতির যিনি সমর্থন করেন তাঁর কাছ থেকে পাকিস্তানের মানুষ সত্যিকারের শান্তি, সমৃদ্ধি বা গণতান্ত্রিক অগ্রগতি কী ভাবে আশা করতে পারেন। আরও লক্ষ্যনীয় যে, এই বইয়ে তিনি কাশ্মীরের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার নিয়ে বিস্তর লিখেছেন, কিন্তু পূর্ববাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ন্যায়সঙ্গত দাবি সম্পর্কে একটি কথাও নেই। সুতরাং তাঁর কাছ থেকে মুজিবর রহমান ও বাংলাদেশের মানুষ গণতান্ত্রিক সহযোগিতা প্রত্যাশা করতে পারেন কী ভাবে ?

জুলফিকার আলি ভুট্টো যদি বিরোধিতা না করতেন এবং গণতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী আওয়ামি লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা স্বীকার করে নিতেন তাহলে বাংলাদেশে এই হত্যার তাণ্ডব বাঁধাতে পারত না পাকিস্তানী সেনাবাহিনী।

আইয়ুব তাঁর মন্ত্রিসভায় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দফতরটি দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে ভুট্টোর উচ্চকাঙ্ক্ষা ও ক্ষমতালিপ্সার মধ্যে আইয়ুব নিজের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আশঙ্কা করে তাঁকে সরিয়ে দেন মন্ত্রিত্ব থেকে। তখন থেকেই তিনি আইয়ুব বিরোধী। পূর্ববাংলার গণবিক্ষোভ শান্ত করতে আইয়ুব তাদের খানিকটা সুবিধা দিতে চাইলেন। সংবিধান সংশোধন করে বেসিক ডেমোক্র্যাটের সংখ্যা ৮০ হাজার থেকে বাড়িয়ে করা হল ১ লক্ষ ২০ হাজার।

কিন্তু দুধের স্বাদ পিটুলি গোলা জলে পাওয়া যায় না। পূর্ব-

বাংলার মানুষ ও আইয়ুবের এই দাক্ষিণ্যে বিভ্রান্ত হল না। আইয়ুব দেখলেন, গণবিক্ষোভ বাড়ছে পাকিস্তানের দুই অংশেই। তিনি তখন খুব ভালো মানুষের মতো বললেন যে সংবিধান পরিবর্তন সম্পর্কে তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করতে রাজী। আইয়ুব বুঝতে পেরেছিলেন যে, জনতা থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন। দশবছরের শাসনে জনতার শক্তি তিনি বিনষ্ট করলেও তা একেবারে বিলুপ্ত করতে পারেননি।

ডেমোক্র্যাটিক অ্যাকশন কমিটি গঠিত হল শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন বিষয়ে আইয়ুবের সঙ্গে কথা বলতে। তাদের দাবি হল আওয়ামি লীগের উপস্থিতি ছাড়া এ আলোচনা অর্থহীন। কারণ, পূর্ব বাংলায় আওয়ামি লীগই প্রধান রাজনৈতিক দল। আওয়ামি লীগের নেতা শেখ মুজিবর রহমান তখন জেলে আইয়ুবেরই সাজানো 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'র আসামীরূপে। আলোচনার দিন পিছুতে লাগল। জনতার দাবিও তখন প্রবল। আইয়ুব চাইছিলেন মুজিবরকে প্যারোলে মুক্তি দিয়ে আলোচনা বৈঠকে আনতে। মুজিবর অস্বীকার করলেন।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার উদ্দেশ্যই ছিল পূর্ববাংলার স্বায়ত্ত-শাসনের দাবিকে জাতি-স্বার্থের বিরোধী বিদেশীরাষ্ট্রের চক্রান্তরূপে জনসমক্ষে প্রচার করা। মুজিবর সেই মিথ্যা মামলায় অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছিলেন 'আমাকে এই তথা-কথিত ষড়যন্ত্র মামলায় মিথ্যাভাবে জড়ানো হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল আমাকে নির্যাতন করা, অপদস্থ করা এবং আমাকে এবং পার্টিকে বদনাম দিয়ে পূর্ব বাংলার ন্যায্য দাবি অর্থাৎ ছয়দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দমন করা।

তিনি বললেন, আমি কখনো পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে আলাদা করার জন্য কিছু করিনি। আমাকে নির্যাতন করছে শাসক-চক্র এবং কায়েমীস্বার্থের দল যারা আমাকে এবং আমার পার্টিকে

দমন করে পাকিস্তানী জনগণের বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানীদের ওপর শোষণ বজায় রাখতে চায়।

এই মামলার আসামীকে মুক্তি দেওয়া কিংবা মামলা প্রত্যাহার করার পরিণতি কী তা আইয়ুব জানতেন। কিন্তু ইতিহাসের চাকা অন্য দিকে ঘূর্ণায়মান। আইয়ুবের ডিক্টেটর জীবনের অবসান আসন্ন। তাঁর পদধ্বনি তিনি শুনতে পেলেন কোয়েটা থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত জনতার বিক্ষোভে।

আইয়ুব শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করলেন। প্রত্যাহৃত হল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। মুক্তি পেলেন মুজিবর রহমান ও অন্যান্য অভিযুক্তরা। আইয়ুব একথাও ঘোষণা করলেন, স্বাস্থ্যের কারণে তিনি ১৯৫৮ সালের নির্বাচনে আর দাঁড়াচ্ছেন না।

তবে কি সত্যি সত্যিই যে-জনগণের কাছ থেকে ক্ষমতা অপহরণ করেছিলেন তিনি ১৯৫৮ সালে তা সেই জনগণের হাতে তিনি প্রত্যর্পণ করবেন?

জনগণের, বিশেষ করে পাকিস্তানের জনগণের কি সেই সৌভাগ্য হবে? আইয়ুব ক্ষমতাপহারক। দশ বছরে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছেন তিনি, আর পুত্র গওহর আইয়ুব এবং তার আশ্রিত বহু লোক। জনগণের হাতে ক্ষমতা ফিরে গেলে জনতার আদালতে কি তাঁকে জবাব দিহি করতে হবে না?

না, মহম্মদ আইয়ুবখান এত নির্বোধ নন। জনগণ রইল দূরে কাঁটাতারের সীমানার বাইরে।

আইয়ুব ক্ষমতা ফিরিয়ে দিলেন তাঁরই জাতভাই আরেক পাঠান সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আগা মহম্মদ ইয়াহিয়া খানের হাতে।

১৯৫৯ সালের ২৫ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খান সারা দেশের ক্ষমতা হাতে নিলেন প্রধান মার্শাল ল অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর রূপে।

পাকিস্তানে আবার সামরিক শাসন। শুধু হাত বদল ও নাম

বদল। একই পাঞ্জাবি সামরিকচক্র পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে লাগল।

কিন্তু আরও ভয়াবহ পরিণতি তখনও ভবিষ্যতের অন্ধকারে ছিল নিহিত। জেনারেল ইয়াহিয়াই হলেন সেই পরিণতির খল নায়ক।

॥ ১১ ॥

Laws are dumb in the midest of arms

Cicero.

ইতিহাস কি পুনবাবৃত্তি করে ?

পাকিস্তানের ইতিহাসের দিকে তাকালে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। তার ইতিহাস একই ভঙ্গিতে পুনরাবৃত্তি করে চলেছে। ১৯৫৮ সালের পর ১৯৫৯ সালে ইতিহাসের একই দৃশ্য পুনরভিনীত হল পাকিস্তানে।

আইয়ুবের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে ইয়াহিয়া খান হলেন পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট। তিনিও আইয়ুবের মতোই আশ্বাসবাণী শোনালেন, নতুন সংবিধান না হওয়া পর্যন্তই তিনি থাকবেন প্রেসিডেণ্ট। সংবিধানের ভিত্তিতে নির্বাচিত সরকার গঠিত হলেই তাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে তিনি ফিরে যাবেন সৈনিকের ছাউনিতে।

আইয়ুবও তাই বলেছিলেন। তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করতে লাগল দশবছর। কিন্তু নিজের ক্ষমতা চলে যাবার আগে তিনি সেই ক্ষমতা কঠোরতর হস্তে ন্যস্ত করে অন্তর্হিত হলেন। জনগণ নাগাল পেলনা. তাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত গণতান্ত্রিক অধিকারের।

কিন্তু ইয়াহিয়া জানতেন, কী অবস্থায় তিনি ক্ষমতা অধিকার করেছেন। সামরিক আইনের শৃংখল দিয়ে একটি জাতিকে চিরকাল বেঁধে রাখা সম্ভব হলে, আইয়ুব খাঁই আজীবন ক্ষমতায় থাকতেন।

গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য আন্দোলন পূর্ববাংলায় এবং পশ্চিম পাকিস্তানে দুর্বার হয়ে উঠেছিল, আইয়ুবের পতনের পাঁচমাস আগে থেকেই। দেশের নিরাপত্তা ও ঐক্য সংহতির নামে সামরিক আইন রক্ষা করা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতাদের ওপর অত্যাচার ও নিপীড়ন সুরু করলেও এত ব্যাপক গণ-আন্দোলন স্তব্ধ করার মতো ক্ষমতা ইয়াহিয়া খানের ছিল না। তাছাড়া তিনি দেখাতে চাইলেন, আইয়ুবের মতো ক্ষমতাভিলাষী তিনি নন। দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলেই তিনি ক্ষমতা ত্যাগ করবেন।

পূর্ব বাংলায় মৌলানা ভাসানী তাঁর দাবির পুনরুক্তি করে বললেন, পাকিস্তানের মানুষকে গণতন্ত্র ফিরিয়ে দিতে হবে। তাঁর জন্য চাই ব্যাপকতর ভিত্তিতে দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের প্রতিনিধি নিয়ে সম্মেলন। ইয়াহিয়া খান যদি সত্যই দেশের জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চান তাহলে ছাত্র, কৃষক ও শ্রমিকদের সহ দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের প্রতিনিধিদের নিয়ে সংবিধানের ক্ষমতা তৈরী করতে হবে। পরে তা গণভোটের সাহায্যে গৃহীত হবে সংবিধানরূপে। তিনি তখনও সুস্পষ্টভাবে এই কথা ব্যক্ত করেন যে, ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে যে ফেডারেল রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করা হয়েছিল তাই হবে পাকিস্তানের নতুন সাংবিধানিক কাঠামের ভিত্তি।

মুজিবরও তাঁর ছ'দফা দাবিই তুলে ধরলেন পূর্ববাংলার মানুষের মুক্তির একমাত্র পথ বলে। ইয়াহিয়া সব দেখে শুনে পাকিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে রাজী হলেন সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে। তিনি প্রাপ্তবয়স্কের সার্বজনীন ভোটাধিকারও স্বীকার করে নিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের বহুনিন্দিত এক ইউনিট ভেঙে দিয়ে চারিটি প্রদেশের পুনর্জন্ম ঘোষণা করলেন।

১৯৫০ সালের ৫ অক্টোবর সাধারণ নির্বাচনের দিন ঘোষিত হল। ইতিমধ্যে পূর্ববাংলায় বিধ্বংসী ঝঞ্ঝাবাত্যায় কয়েকলক্ষ লোক নিহত এবং আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে ৭ ডিসেম্বর, ১৯৫০ করা হয়।

এই নির্বাচনকে একেবারে নিরঙ্কুশ করলেন না তিনি। নির্বাচনের পর গণপরিষদ কীভাবে কাজ করবে তার একটি লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক বা আইনানুগ কাঠামো তৈরী করে আদেশ জারী করলেন ইয়াহিয়া খান। তাতে বলা হল, পাকিস্তানের ঐক্য বা সংহতি নষ্ট হতে পারে এমন কোনো সংবিধান তৈরি করা চলবেনা। জাতীয় পরিষদ আহবানের ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান তৈরি করতে হবে। তা না হলে প্রেসিডেণ্ট জাতীয় পরিষদ বাতিল করে দিতে পারবেন। জাতীয় পরিষদে গৃহীত সংবিধান প্রেসিডেণ্টের অনুমোদন সাপেক্ষ। তাঁর পছন্দ না হলে সংবিধান তিনি বাতিল করে দিতে পারবেন।

সবই তিনি বললেন। শুধু বললেন না, সামরিক শাসনের অবসান হবে কবে। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা কি সামরিক শাসনের খড়্গ মাথার উপর ঝুলিয়ে সংবিধান রচনা করবেন, না অন্তর্বর্তীকালে এই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে?

এই সব প্রশ্নের কোনো উত্তর পাওয়া গেলনা।

তবুও পাকিস্তানের জনগণ দুটি বিষয়ে জয়ী হল: ১। প্রাপ্তবয়স্কের সার্বজনীন ভোটাধিকার ২। সাধারণ নির্বাচনের অনুষ্ঠান। পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট বাতিল ও জনগণের একটি বিরাট জয়ই সূচিত করে। কারণ এক ইউনিটের সূত্র ধরেই আসে পাকিস্তানের দুই অংশে আসন-সমতা বা প্যারিটি। এমন আজব গণতন্ত্র কেউ কোথাও দেখেনি। পূর্ববাংলায় পাকিস্তানের ৫৬ শতাংশ লোকের বাস। কিন্তু আসনের বেলায় সংখ্যালঘু পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব বাংলার সমান। পূর্ববাংলা যাতে তার সংখ্যাধিক্যের জোরে

কোনদিন পাকিস্তানের ন্যাশনাল এসেম্বলিতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা না পায়, এ ব্যবস্থা করা হয়েছিল তারই উদ্দেশ্যে।

এই নির্বাচনে পাকিস্তান ন্যাশনাল এসেম্বলি, যা গণপরিষদ হিসেবেও কাজ করার কথা ছিল, তার নির্বাচিত আসন সংখ্যা ৩০০। এর সঙ্গে যুক্ত হবে মহিলাদের জন্য ১৩টি আসন। এর ৭টি পূর্ব বাংলার এবং ৬টি পশ্চিমের। নির্বাচিত আসনের মধ্যে পূর্ব বাংলার আসন মোট ১৬২। তার মধ্যে ঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত এলাকায় ৯টি আসনে নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়। নির্বাচন বয়কট করেন মৌলানা ভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামি পার্টি। আতাউর রহমান খানের দলও নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান।

মুজিবরের আওয়ামি লীগ ১৫৩ টি আসনের মধ্যে ১৫১টি আসনে জয়ী হয়ে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে এক আশ্চর্য সাফল্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নুরুল আমিন পরে একটি আসন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে রাজা ত্রিদিব রায় নির্দল প্রার্থী হিসেবে জয়ী হন।

ন্যাশনাল এসেম্বলির নির্বাচনের ফলাফল ছিল এই রকম :

পূর্ব বাংলা

আওয়ামি লীগ	:	১৫১
পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি	:	১
নির্দল	:	১
মুসলীম লীগ (কাইয়ুম গোষ্ঠি)	:	০
জামাত-ই-ইসলামী	:	০
কাউন্সিল মুসলিম লীগ	:	০
কনভেনশন মুসলিম লীগ	:	০

পশ্চিম পাকিস্তান

পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি	:	৮১
মুসলিম লীগ (কাইয়ুম গোষ্ঠি)	:	৯
কাউন্সিল মুসলিম লীগ	:	৭
জামাত-ই-উলেমা-ই পাকিস্তান	:	৭
ন্যাশনাল আওয়ামি পার্টি (ওয়ালি খান গোষ্ঠি)	:	৫
জামাত-ই-ইসলামি	:	৪
কনভেনশন মুসলিম লীগ	:	২
নির্দল	:	১৫

১৯৫০ সালের সাধারণ নির্বাচনে পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক চিন্তার দিক থেকে সম্পূর্ণ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেল। আওয়ামি লীগ পূর্ব বাংলায় হল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। পশ্চিম পাকিস্তানে এই দলের কোনো প্রার্থী জয়ী হতে পারলনা। অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো পার্টি ও পূর্ব বাংলায় পেল না একটিও আসন।

দুই প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন আওয়ামি লীগের শেখ মুজিবর রহমান এবং পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির জুলফিকার আলি ভূট্টো। এই দুইজন পাকিস্তানের দুই অংশের নেতা প্রতিপন্ন হলেন। কিন্তু গাণিতিক হিসাবে শেখ মুজিবর রহমান ন্যাশনাল এসেম্বলিতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ। পাকিস্তানের ভৌগোলিক সংস্থানে এই বৈচিত্র্য না থাকলে নিশ্চিতই শেখ মুজিবর রহমানই হতেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী এবং গণপরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা।

কিন্তু তা হলনা। পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এত সহজে জনতার প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা তুলে দেবেন, একথা যারা বিশ্বাস করতেন তারা ভুল করেছিলেন। কোনো ডিক্টেটরই স্বেচ্ছায় জনতার হাতে ক্ষমতা দেয় না। এ দেওয়ার অর্থ নিজের মৃত্যু পরোয়ানায় স্বাক্ষর করা।

ইয়াহিয়া খান তাঁর লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডারের ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর নির্দেশের ২০ (৪) ধারায় বলা ছিল যে, প্রস্তাবিত সংবিধানে সমস্ত আইনগত, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা ফেডারেল সরকার ও প্রদেশগুলোর মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে। প্রদেশগুলোর সর্বোচ্চ পরিমাণ স্বায়ত্তশাসন থাকবে। কিন্তু ফেডারেল সরকারেরও ক্ষমতা থাকবে দেশের স্বাধীনতা ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বনের।

ফ্রেমওয়ার্কের অর্ডারের ২৪ ধারায় বলা ছিল যে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবার ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান তৈরী করতে হবে। সংবিধান বিল জাতীয় গরিষদে গৃহীত হবার পর তা অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে প্রেসিডেন্টের কাছে। প্রেসিডেন্ট যদি তা অনুমোদন না করেন তাহলে জাতীয় পরিষদ বাতিল হয়ে যাবে।

এই বিধিনিষেধ সত্ত্বেও মুজিবর আশা করেছিলেন যে, তিনি হয়তো এর মধ্যেই বাংলাদেশের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন আদায় করে নিতে পারিবেন। তিনি অনেক আশাবাদী। বারবার পাকিস্তানীদের হাতে তিনি নিপীড়িত ও নিগৃহীত হয়েছেন। তবু তিনি আশা রেখেছেন, একদিন জনতার জাগরণ ও তার সমবেত শক্তির জোরেই বাংলাদেশ তার অধিকার পুনরুদ্ধার করে নিতে পারবে।

জুলফিকার আলিভুট্টো একজন চৌখস রাজনীতিবিদ। আইয়ুবের আমলে তিনি ছিলেন তাঁর পররাষ্ট্র সচিব। অল্পবয়সেই এতটা প্রাধান্য পেয়ে ভুট্টো ক্ষমতাভিলাষী হয়ে ওঠেন। আইয়ুব তাঁকে সরিয়ে দেন মন্ত্রিসভা থেকে। ক্ষমতাচ্যুত জুলফিকার গঠন করলেন পিপলস্ পার্টি অব পাকিস্তান। ইসলামিক সমাজতন্ত্রের নামে তিনি নির্বাচনে অবতীর্ণ হন। অনেক প্রগতিশীল কথাও তিনি উচ্চারণ করেন। কিন্তু মুজিবরের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মৌল পার্থক্য প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন নিয়ে।

মুজিবর ছ'দফা দাবি নিয়ে বাংলাদেশের সমর্থন পেয়েছেন। এই দাবি থেকে একচুলও তিনি নড়তে পারেন না। কারণ, এই দাবির কোনো একটা নিয়ে আপোষের অর্থ আওয়ামি লীগের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিভঙ্গ। অন্যান্য বামপন্থী দল অনেক আগেই এ বিষয়ে সাবধান বাণী উচ্চারণ করে রেখেছিল যে, বাংলাদেশের পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসনের বিনিময়ে অন্য কোনো ভিত্তিতেই সংবিধান রচনা চলবে না।

জুলফিকারের পেছনে ছাত্র ও যুব সম্প্রদায় যেমন ছিল তেমনি ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের আসল শক্তি পাঞ্জাবি বিত্তবান সম্প্রদায়। তাদের স্বার্থেই তিনি ধুয়া তুললেন, শক্তিশালী কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকার চাই। কারণ, পাকিস্তান শত্রুপরিবেষ্টিত। দুর্বল ফেডারেশন হলে পাকিস্তানের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। এ নিয়ে ভুট্টোর সামিল হলেন পশ্চিম পাকিস্তানের গোঁড়া রক্ষণশীল ইসলামী দলগুলো। পাঞ্জাবি সামরিক বাহিনী, পুঁজিপতি শিল্পপতিরাও শক্তিশালী কেন্দ্রের দলে। কারণ, তাদের প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্র সংকুচিত হলে সর্বনাশ।

ভুট্টো তুললেন কাশ্মীর মুক্তির প্রশ্ন এবং ফরাক্কা বাঁধের প্রসঙ্গ। মুজিবর ফারাক্কা সম্পর্কে একটি ন্যায্য সমাধান দাবি করলেও কাশ্মীর নিয়ে ভুট্টোর মতো রণং দেহি মনোভাব দেখাননি। তিনি রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাবাদির ভিত্তিতে কাশ্মীর সমস্যার মীমাংসার কথা উচ্চারণ করেছেন। অথচ ভুট্টোর কাছে কাশ্মীর ছাড়া পাকিস্তান হল মুণ্ডহীন দেহ'।

নির্বাচনের পর আরও একটি প্রশ্ন দেখা দিল। নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ কি সামরিক শাসনের আওতায় স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে? জাতীয় পরিষদের হাতেই বা অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠনের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হবে না কেন?

একটি নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ হবে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। কারণ প্রাপ্তবয়স্কের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত এই পরিষদ দেশের সংবিধান রচনা করবে। তাঁকে মিলিটারি

শাসকের নির্দেশে চলতে হলে তার সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হয়। এমন বিচিত্র ব্যবস্থা কোথায় হয়েছে বলে নজীর নেই।

এ বিষয়ে গোড়ার দিকে মুজিবর ও ভুট্টো ছিলেন একমত। দুই সংখ্যগরিষ্ঠ পার্টির নেতা মত প্রকাশ করেন যে, ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান তৈরি করে দিতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা জাতীয় পরিষদ মানতে পারে না।

ভুট্টো বললেন, প্রেসিডেন্ট যখন নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তখনি তাঁর বোঝা উচিত ছিল যে সামরিক ডিক্টেটরশিপ এবং জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সহ অবস্থান করতে পারেন না। কিন্তু যখনি বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন আসে তখনি ভুট্টোর আঞ্চলিকতা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। মুজিবরের ছ'দফা তো ছিল বাংলা দেশের ন্যূনতম দাবি। তাতে অর্থ নৈতিক বিপ্লবের কোনো কথা ছিল না। যা ছিল মৌলানা ভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামি পার্টির ১৪ দফা দাবিতে কিংবা ১৯৫৭ সালে ছাত্রদের ১১ দফা কর্মসূচীতে। এই ছ'দফা হল ন্যূনতম ভিত্তি যার ওপর পাকিস্তানের ঐক্য রক্ষা করে পূর্ব বাংলাকে পশ্চিম পাকিস্তান পেত সহকারী হিসাবে।

ভুট্টোর অনমনীয়তা সৃষ্টি করল এক অচল অবস্থা। তিনি হুমকী দিলেন বিরোধীদলে বসবার জন্য পিপলস্ পার্টিকে জনসাধারণ ভোট দেয়নি। আশ্চর্য কথা। পাকিস্তানকে যদি একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র হিসাবে রাখতে হয় তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে আওয়ামি লীগকে ক্ষমতা দিতে হয়। পশ্চিম পাকিস্তানী প্রতিক্রিয়াশীল চক্র তা দিলনা।

ইয়াহিয়া এক পা এগোন দু পা পিছিয়ে যান। তিনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতুবী রাখলেন। পূর্ব বাংলার মানুষ বুঝতে পারল, ক্ষমতা সামরিক শাসকরা হস্তান্তর করবে না। সুরু হল গণবিক্ষোভ। ১৯৫৭ সালের মার্চ মাস বাংলাদেশের ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়ের সূচনা করল।

ভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামি পার্টি ঘোষণা করল, স্বাধীন

সার্বভৌম বাংলাদেশ ছাড়া বাঙালীর শোষণমুক্তির অন্য কোনো পথ নেই। মৌলানা ভাসানী দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "ইয়াহিয়া বাংলার দুশমন। তাঁর সাথে আবার আলাপ কীসের? ইয়হিয়াকে মুজিবের নেতৃত্বে বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। তিনি যদি তা প্রত্যাখ্যানের সাহস দেখান তাহলে আমি তাঁকে বুঝিয়ে দিতে চাই যে আমি এমন এক মুক্তিযুদ্ধ শুরু করব যা হবে ভিয়েতনামের যুদ্ধের চেয়ে ভয়ঙ্কর।" [ফ্রন্টিয়ার, ১০ এপ্রিল তারিখে উদ্ধৃত]

ঢাকায় তখন আলোচনা চলছে প্রেসিডেণ্ট ভবনে। মুজিব তখনও আশা করে আছেন, মীমাংসার একটা সূত্র পাওয়া যাবে।

একদিকে আলোচনা অন্যদিকে নিরস্ত্র জনতার ওপর পাকিস্তানী বাহিনীর হামলা। ঢাকার রাজরথ রক্তে লাল হয়ে গেল।

মুজিবর বুঝলেন, স্বাধীনতা আলোচনার টেবিলের বিষয় নয়। তা ছিনিয়ে নিতে হয়, অর্জন করতে হয়। ডিক্টেটরের হাতে পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্র হল খেলার পুতুল।

৭ মার্চ ১৯৩০ ঢাকার রমনার রেসকোর্স ময়দানে এক জনসমাবেশে মুজিবর রহমান ঘোষণা করলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম।

তিনি বললেন, শহীদের রক্তের ওপর পা দিয়ে আমি এসেম্বলিতে যেতে চাই না। যত রক্ত দিতে হয় দেব, কার্পণ্য করবনা। কেননা এ আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।

জনতাকে সংগ্রামে প্রস্তুত করার জন্য তিনি ডাক দিলেন অসহযোগ আন্দোলনের।

তিনি বললেন, "আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না, আমার মানুষের অধিকার চাই। আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট, কাছারি, আদালত, অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরীব যাতে কষ্ট না পায়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না পায়, সে জন্য রিকসা চলবে, ট্রেন চলবে, টেলিগ্রাফ টেলিফোন চলবে, বিদেশের সঙ্গে পূর্ব বাংলার বাণিজ্য চলবে। কিন্তু সুপ্রীম কোর্ট, জজকোর্ট, সরকারী

আধা সরকারী সব প্রতিষ্ঠান চলবে না।" "আর যদি গুলি চলে, যদি আমার লোকদের হত্যা করা হয়, তাহলে আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ প্রত্যেক ঘরে, প্রত্যেক পাড়ায় দুর্গ গড়ে তুলুন। যা কিছু আছে তা দিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করুন।"

"আমরা ওদের ভাতে মারব, আমরা পানিতে মারব। সৈন্যদের বলি, তোমরা আমাদের ভাই, তোমরা ব্যারাকে ফিরে যাও। তোমাদের কেউ কিছু বলবেনা। কিন্তু আমাদের ওপর গুলি চালাবার চেষ্টা হলে ফল ভাল হবে না। সাতকোটি মানুষকে চাপা রাখতে পারবে না। আমরা মরতে শিখেছি, কেউ আমাদের রুখতে পারবে না।"

২৫ মার্চ ১৯৩০ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকা হয়েছিল। সেদিনই মধ্যরাত্রে পূর্ববাংলার বুকে সুরু হয় ইয়াহিয়া বাহিনীর আক্রমণ। মুজিবর জাতীর পরিষদে যোগদানের জন্য যে ক'টি শর্ত উল্লেখ করেছিলেন তার মধ্যে ছিল ঃ

(১) সামরিক আইন প্রত্যাহার।
(২) নির্বাচিত গণ প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর।
(৩) সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া।
(৪) অসামরিক লোকদের ওপর গুলি নিক্ষেপ বন্ধ করা।
(৫) পূর্ব বাংলায় নিজস্ব সামরিক শক্তি বৃদ্ধি এবং পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য আমদানী বন্ধ করা।
(৬) বাংলাদেশে বিভিন্ন সরকারী বিভাগের কাজে ফৌজের হস্তক্ষেপ বন্ধ করা
(৭) আইন ও শৃংখলা রক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বাংলা দেশের পুলিশ ও বাঙালী পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল বাহিনীর ওপর অর্পণ করা।

এর কোনোটাই ইয়াহিয়া খান মানেনি। পশ্চিম পাকিস্তানের অনেক গণতান্ত্রিক নেতা (ভুট্টো বাদে) মুজিবরকে সমর্থন করেছিলেন।

খান ওয়ালি খান গোড়া থেকেই বলছিলেন যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে মুজিবরকে ক্ষমতা দেওয়া হক। সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষে ভুট্টোর কথা বলার অধিকারকে তিনি চ্যালেঞ্জ জানান। এয়ার মার্শাল আসগর খাঁ দাবি জানান, সামরিক শাসন প্রত্যাহার করে সংখ্যাগরিষ্ঠদের হাতে গণতান্ত্রিক অধিকার অর্পণের।

পাকিস্তানের পশ্চিমাংশেও পূর্ববাংলার ন্যায়সঙ্গত দাবির প্রতি ছিল সমর্থন ও সহানুভূতি। পূর্ববাংলা পাকিস্তানের একটি অংশ তার প্রতি বঞ্চনা ও শোষণ পশ্চিম পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন মানুষের দৃষ্টি নিশ্চিতই আকর্ষণ করেছিল। এটা মনে করলে ভুল হবে যে গোটা পশ্চিম পাকিস্তানই পূর্ব বাংলার বিরোধী। গত ২৪ বছর ধরে পাকিস্তানের উভয় অংশে ব্যাপক গণ-আন্দোলন হয়েছে। পাকিস্তান সরকার জনমত অগ্রাহ্য করে পাকিস্তানকে মার্কিন সামরিক জোটের লেজুড়ে পরিণত করে রেখেছে। এর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ উঠেছিল শুধু পূর্ব বাংলায় নয়, পশ্চিম পাকিস্তানেও।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পাকিস্তানী ছাত্র নেতা তারিক আলি পশ্চিম পাকিস্তানের সন্তান। তিনি আইয়ুব-ইয়াহিয়ার সামরিক চক্রের বিরুদ্ধে আপোষ হীন সংগ্রাম চালিয়েছেন। পূর্ব বাংলার ওপর ইয়াহিয়ার এই বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর শোনা গেছে তাঁর।

তারিক আলি তাঁর সদ্য প্রকাশিত 'পাকিস্তান মিলিটারি রুল অর্ পিপলস্ পাওয়ার' বইয়ে পূর্ববাংলার গণ-আন্দোলন ও ছাত্র আন্দোলন বিষয়ে যে বিশ্লেষণ করেছেন তাতে তিনি স্বীকার করেছেন যে পাকিস্তানের গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব এসেছে বাংলা দেশ থেকে।

তিনি লিখেছেন,

It was clear that East Pakistan was in the vanguard of the struggle, and that it was giving the lead to the entire nation; and in East Pakistan itself the students dominated the Political Scene.

অর্থাৎ এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে পূর্ব পাকিস্তানই ছিল সংগ্রামে অগ্রবর্তী এবং গোটা জাতিকে তা নেতৃত্ব দিতে যাচ্ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে আবার রাজনৈতিক মঞ্চে প্রাধান্য নিয়েছিল ছাত্ররা।

পাকিস্তানকে ধ্বংস করার কৃতিত্ব যদি কারো থাকে তবে সে কৃতিত্ব ইয়াহিয়া খা, জুলফিকার আলি ভুট্টো এবং তাঁদের অনুগামীদের। যে-রাষ্ট্রের দুই অংশে কোনো ভৌগোলিক সন্নিহিতি নেই, দুই অংশে দুটি সুস্পষ্টভাবে স্বতন্ত্র জাতিগোষ্ঠি বা ন্যাশনালিটির বাস, ভাষার দিক দিয়ে এবং সংস্কৃতির দিক দিয়ে পৃথক, তাকে কীভাবে একসঙ্গে একই উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ রাখতে হয় তা পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকরা কোনোদিন উপলব্ধি করেন নি।

গ্রেট বৃটেন ও আয়ারল্যাণ্ড কত কাছাকাছি দুই দ্বীপ। কিন্তু ভাষা ও সংস্কৃতিগত পার্থক্যের দরুণ এই দুই জাতিগোষ্ঠি এক থাকতে পারেনি। আয়ারল্যাণ্ড তার স্বাধীনতা ইংরেজদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। গ্রেট বৃটেনেও স্কটরা ঐতিহাসিক কারণেই ইংরেজদের চেয়ে স্বতন্ত্র। ইংরেজরা স্কটল্যাণ্ডের জন্য একটি বিশেষ ধরণের স্বায়ত্তশাসনাধিকার স্বীকার করে নিয়েছে।

পাকিস্তানের শাসকরা এই গণতান্ত্রিক অধিকার পূর্ব বাংলার জনগণকে দিতে চায়নি বলেই এই ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থান। একটি দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয়নি, এই নজীরও তৈরি করলেন পাকিস্তানের শাসকরা।

বাংলাদেশের মানুষের এ ছাড়া অন্য কোনো পথ ছিল না। মুজিবর রহমান একজন দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী নেতা। তিনি সরল এবং বিশ্বাসপ্রবণ। বারবার পাকিস্তানী শাসকরা তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, মুজিব তবু এই বিশ্বাস রেখেছেন যে, জনগণ যখন তাঁর পেছনে আছেন, বাংলার জন্য স্বায়ত্তশাসন তিনি অর্জন করে আনবেনই।

এই বিশ্বাসেই তিনি মার্চ মাসের গণবিক্ষোভে তরঙ্গউত্তাল দিনগুলিতে, শহীদের রক্তে ঢাকার রাজপথ যখন লাল, তরুণসমাজে বিক্ষোভ টগবগ করে ফুটছে তখনও তিনি শেষচেষ্টার জন্য গেছেন ঢাকার প্রেসিডেণ্ট ভবনে ইয়াহিয়াখানের সঙ্গে কথা বলতে।

২৩ মার্চ তারিখে ঢাকার 'নতুন দেশ' (ভাসানীপন্থী) সম্পাদকীয়তে লিখল: ঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত নিপীড়িৎ মানুষ যখন খাদ্যের আশায় হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তখন পশ্চিম পাকিস্তানের কুকুররা তাদের ওপর গুলীবর্ষণ করছে।

"ক্ষুধার্ত মানুষ যখন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে তখন পশ্চিম পাকিস্তানের এই বেজন্মার দল তাদের দোষারোপ করছে বিদ্রোহী বলে। শেখ মুজিবর রহমান, আমরা তোমাকে বলি পাকিস্তানের ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়তে। তুমি জেলখানায় গেলে এখনও দেখতে পাবে সেই জায়গাগুলো যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের ডালকুত্তারা আমাদের মেয়ে ইলা মিত্রকে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে রেখেছিল।"

"রাজশাহী জেলে আনওয়ারের হত্যাকাণ্ড কেউ ভুলতে পারেনা। বেয়নেটের আঘাতে শামসুজ্জোহার মৃত্যু কেউ বিস্মৃত হতে পারেনা। সার্জেণ্ট জহরের স্মৃতিও অবিস্মরণীর। তুমি কি তাঁদের ভুলতে পারো—মুজিব, জবাব দাও।"

"আমরা যখন ঝড় ও বন্যায় দুঃখ লাঞ্ছনা পেয়েছি তখন কি পাঞ্জাবিরা আমাদের সাহায্যে এসেছিল? গত ঝড়ে যখন আমাদের লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গেল তখন তারা কি করেছিল সে কথা কি তুমি ভুলে গেছো?"

যখন তুমি এই বেজন্মাদের সঙ্গে এক রহস্যজনক বৈঠকে ব্যস্ত, তখনি তারা জয়দেবপুরে নিরপরাধ বাঙালিদের হত্যা করেছে। এই কি তোমার চোখ খোলার পক্ষে যথেষ্ট নয়? এখনও কি তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার উপযুক্ত সময় নয়? শেখ মুজিব, আমরা এখনও

তোমার অপেক্ষায় আছি। এসো, আমাদের সঙ্গে যোগ দাও। আমরা পশ্চিমের বেজন্মাদের ধ্বংস করব।"

(ফ্রন্টিয়ারে উদ্ধৃত ইংরেজি থেকে তর্জমা)

খুবই চড়া সুরে লেখা। কিন্তু এতেই বোঝা যায় কী অসহনীয় অবস্থায় চলছিল আলোচনা। ইয়াহিয়ার দল আলোচনার আড়ালে সামরিক অভিযানের ব্লু প্রিণ্ট তৈরি করছিল।

বাঙালী গভর্ণর ভাইস-এডমিয়াল আহসানকে বরখাস্ত করে এনে বসানো হল পাঞ্জাবি লেফ্‌টেনাণ্ট জেনারেল টিক্কা খানকে।

এল সেই কাল রাত্রি। ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ। বাংলাদেশে সুরু হল পাঠান অভিযান।

বাঙালীর রক্তে লাল হয়ে সাগরের দিকে ভেসে চলল পদ্মার স্রোত।

পৃথিবীর চরম বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনীর ঘৃণ্যতম অধ্যায় উন্মোচিত হল পূর্ব বাংলায়।

বাংলাদেশ সেই অসম প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধজাতি হিসেবে জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত হল।

বাংলাদেশের এ হল মুক্তি যুদ্ধ। গ্রামে গ্রামে গঠিত হল মুক্তি ফৌজ। হয় মুক্তি, নয় মৃত্যু—এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। বাংলার মুক্তিযুদ্ধ চমকিত করে দিল গোটা দুনিয়াকে। মুজিবর আলোচনার টেবিল থেকে চলে এলেন মুক্তির রণাঙ্গণে।

বর্বর আক্রমণ

॥ ১২ ॥

জাগো অনশন-বন্দী ওঠোরে যত
জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত!
যত অত্যাচারে আজি বজ্র হানি
হাঁকে নিপীড়িত জন-মন-মথিত বাণী,
নব জনম লভি অভিনব ধরণী
ওরে ঐ আগত ॥

নজরুল ইসলাম

এমনি এক বিশ্বাসঘাতক আক্রমণ করেছিল নাৎসী জার্মানী গত মহাযুদ্ধের সময় অকস্মাৎ সোভিয়েট ইউনিয়নের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে।

এমনি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল ফ্যাসিস্ত জাপান আকস্মিকভাবে পার্ল হারবারের ওপর বোমারু বিমান দলের আক্রমণ চালিয়ে।

ইতিহাস তার সাক্ষী। হিটলারের নাৎসী জার্মানীর কবর রচিত হয়েছিল স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধে। এমন অত্যাশ্চর্য প্রতিরোধ যুদ্ধ পৃথিবীর মানুষ আর দেখেনি। প্রতিটি ঘর হয়ে উঠেছিল দুর্গ। নাৎসী বাহিনীর শিরদাঁড়া ভেঙে দিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের জনগণ পৃথিবীতে সমাজতান্ত্রিক শক্তির বিজয় পতাকা উত্তোলন করেছিল।

তারপর আমরা দেখলাম আরেক মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম—ভিয়েৎনামের যুদ্ধ। ভিয়েতনামের নেতা হো চি মিনও প্রতিবার সাম্রাজ্যবাদী ফরাসীদের কথা বিশ্বাস করে তাদের সঙ্গে আলোচনায়

বসেছেন। বিনা রক্তপাতে যতদূর যাওয়া যায় তিনি তার জন্য সব সময়েই থাকতেন প্রস্তুত। প্রতিবারই সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁকে বঞ্চনা করেছে, প্রতারিত করেছে। তখন তাঁর অস্ত্র ধরা ছাড়া অন্য কোনো পথ ছিলনা। তিনি ভিয়েতনামকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী দুর্গে পরিণত করলেন। পৃথিবীর মহাশক্তিধর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সমরসম্ভার ভিয়েতনামের জনগণের প্রতিরোধ সংগ্রামে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত।

ভিয়েতনাম পৃথিবীর কাছে এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত। ভিয়েতনাম শুধু নিজের দেশের স্বাধীনতার জন্যই লড়াই করছে না, পৃথিবীর যেখানে যত নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষ আছে তাদের সকলের হয়ে লড়াই করছে ভিয়েতনাম।

বাংলাদেশকেও যেন সেই ভিয়েতনামের পথেই ঠেলে দিয়েছে ইয়াহিয়া খান ও তাঁর নেকড়ে বাহিনী।

মুজিবর রহমান বলেছিলেন, শহীদের রক্তের ওপর পা দিয়ে আমি এ্যাসেম্বলিতে যাব না। ইয়াহিয়ার দল ঢাকার প্রেসিডেণ্ট ভবনে বসে, বাংলাদেশের আতিথ্য নিয়ে বাংলার মানুষকে হত্যা করার এক জঘন্য ষড়যন্ত্রে তখন লিপ্ত। মুজিবর তা জানতেন কি না আমরা জানি না। তবে তিনি পল্টন ময়দানের সভায় সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন যে, শত্রুর আঘাত আসছে। আপনারা প্রত্যেক ঘরকে দুর্গে পরিণত করুন। যার যা আছে তা দিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করুন। বাংলার মুক্তি সংগ্রাম, স্বাধীনতা সংগ্রাম সুরু হল।

২৫ মার্চ মধ্যরাত্রিতেই বাংলাদেশ আক্রান্ত হল। ইয়াহিয়া ও ভুট্টো বিমানযোগে পাড়ি জমিয়েছেন করাচির পথে। ঢাকা শহর থমথমে। একটা আশঙ্কার ভাব সর্বত্র। আলোচনা কিন্তু তখনো শেষ হয়নি। মুজিবর সে রাত্রেও প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার জন্য একবার চেষ্টা করেছিলেন।

টেলিফোন ধরল প্রেসিডেণ্টের কোনো পার্ষদ। বলে দিলেন, প্রেসিডেণ্ট শুয়ে পড়েছেন। তাঁকে এখন ডাকা বারণ।

মুজিবর বুঝলেন, আলোচনার পর্ব শেষ। এবার অন্য পালা।

সুরু হল বাংলাদেশে এক অন্ধকার যুগ। একটা গোটা জাতির ওপর সশস্ত্র বাহিনীর হিংস্র আক্রমণ। একটি দখলদার বাহিনী যেভাবে বিজিত দেশের ওপর অত্যাচার ও আক্রমণ চালায় ইয়াহিয়া খানের পাঞ্জাবি সেনাবাহিনী বাংলাদেশে সেই বীভৎসতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল নিরস্ত্র জনসাধারণের ওপর।

সারা দুনিয়া স্তম্ভিত, বিস্মিত ও মর্মাহত। কী ঘটছে তা যাতে বাইরের পৃথিবীর মানুষ জানতে না পারে তার জন্য প্রথমেই পশ্চিম পাকিস্তানী সরকার সমগ্র পূর্ব বাংলায় লৌহ যবনিকা টেনে দিলেন। মুজিবর—ইয়াহিয়া আলোচনার সংবাদ পাঠাবার জন্য ঢাকায় তখন প্রায় ৩৫ জন বিদেশী সাংবাদিক জড় হয়েছিলেন। এদের মধ্যে মার্কিন, বৃটিশ, ফরাসি, ডাচ, জাপানী প্রভৃতি নানান দেশের সাংবাদিকরাই ছিলেন। সামরিক শাসকরা দেখলেন, এই বিদেশী সাংবাদিকরা যদি ঢাকায় থাকেন তাহলে বিপদ, সমস্ত খবর পৃথিবীর মানুষ জেনে যাবে। সুতরাং নির্দেশ এল, প্রথমেই সাংবাদিক হঠাও, সংবাদপত্রের ওপর বসাও সেন্সরশিপ।

ঢাকার ইণ্টার কন্টিনেণ্টাল হোটেল থেকে সব বিদেশী সাংবাদিকদের নিয়ে যাওয়া হল করাচীগামী বিমানে। বিমান ওঠবার আগে তাদের ক্যামেরার ফিল্ম, ফটো, নোট বই সমস্ত কিছু করা হল বাজেয়াপ্ত। তারপরই সুরু হল সেই বীভৎস গণহত্যা।

প্রতিরোধের ডাক দিয়েছিলেন মুজিবর, মৌলানা ভাসানী ও অন্যান্য বামপন্থী নেতারা। কিন্তু একটি সুসজ্জিত আধুনিক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কী শক্তি নিয়ে লড়াই করবে গণমুক্তিফৌজ? গেরিলা যুদ্ধে আধুনিক অস্ত্রের ওপর জোর দেওয়া হয়নি। যার কাছে যেমন অস্ত্র আছে তাই দিয়েই সুরু করতে হয় লড়াই। ভিয়েতনামেও তাই করা হয়েছিল। গোরিলারা কখনো অস্ত্রসজ্জিত সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে আসে না। গেরিলারা যুদ্ধ করে তাদের সুবিধা

ও সুযোগ অনুসারে। সেনাবাহিনীকে পেছন থেকে আক্রমণ করে, তাকে বিব্রত করে পর্যুদস্ত করাই গেরিলা রণকৌশল।

বাংলাদেশে ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনী তখন কত ছিল, তার একটা আনুমানিক হিসাব ভারতের সংবাদপত্রগুলোতে প্রকাশিত হয়েছিল। পূর্ববাংলায় এই মুক্তিযুদ্ধ সুরু হবার আগে পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের সাত ব্রিগেড সৈন্য অথবা ৩৫,০০০ হাজার সৈন্য ছিল। এদের অধিকাংশই ছিল পাঞ্জাবি বা পাঠান। ঢাকায় এগারোদিন ধরে আলোচনাকালে ইয়াহিয়া আরও সৈন্য তলব করেন বাংলাদেশের জন্য। ভারতের বিমান ছিনতাইয়ের জন্য ভারতের আকাশপথ দিয়ে পাকিস্তানী বিমান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তাই ইয়াহিয়া বাহিনী জাহাজ ও বিমান ভর্তি করে সিংহল দিয়ে ঘুরে চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরে ও বিমান ঘাঁটিতে নামতে লাগল। নতুন আমদানি এই সৈন্যের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০,০০০ হাজার। মোট ৬৫ হাজার সুশিক্ষিত এবং মার্কিণ অস্ত্রে সুসজিত পাঞ্জাবি সৈন্য ব্যারাকে একেবারে তৈরিই ছিল।

এ ছাড়া ছিল ১৮,০০০ ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস্। তাদের মধ্যে, একটি হিসেবে জানা যায়, ১২,০০০ ছিল বাঙালী। আধা-মিলিটারি মুজাহিদ ও আনসার বাহিনীর সংখ্যা ছিল ২০,০০০। এর ৪০ শতাংশ বাঙালী ছিল। যাই হক, পশ্চিম পাকিস্তানী বাহিনীর সঙ্গে আরও ১৫,০০০ হাজার সশস্ত্র ব্যক্তি ছিল ইয়াহিয়ার পাশে। অর্থাৎ গণহত্যা অভিযান মোট ৭৫,০০০ হাজার সশস্ত্র সৈন্য অংশ গ্রহণ করল।

সে তুলনায় বাংলাদেশের মুক্তিফৌজে ছিল ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের বাঙালীরা, ৪০ হাজার পুলিশ এবং মুজাহিদ ও আনসার দলভুক্ত বাঙালীরা। এ এক অসম যুদ্ধ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সব মুক্তিযুদ্ধই এমনি অসম শক্তি নিয়েই সুরু হয়। পাকিস্তান সরকার গত তেইশ বছর ধরে সেন্টো ও সিয়াটো সামরিক চুক্তি

জোটের মারফৎ প্রচুর অস্ত্রসস্ত্র সংগ্রহ করেছেন। সম্প্রতি রাশিয়া এবং চীনের কাছ থেকেও কিছু হাল্কা ধরণের অস্ত্র সংগ্রহ করেছিল পাকিস্তান। সামরিক বাহিনীকে চাঙ্গা রাখার দুটি উদ্দেশ্য। একটি হল, এর ফলে পাঞ্জাবিদের সুবিধা। কারণ, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অধিকাংশই হল পাঞ্জাবি পাঠান। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল, হাজার মাইল দূরবর্তী পূর্ব বাংলায় বিদ্রোহ দেখা দিলে তা দমন করা।

মুক্তি সংগ্রাম সুরু হতে না হতেই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও সমর সম্ভার আনতে সাড়া পড়ে গেল। অথচ ১৯৪০ সালের নভেম্বরে নোয়াখালি, বরিশাল, সন্দ্বীপ, হাতিয়ার যে-বিধ্বংসী ঝঞ্ঝা-বাত্যায় কয়েকলক্ষ লোকের প্রাণহানি ঘটে তখন দুর্গত এলাকায় ত্রাণকার্যের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের পাওয়া যায়নি। আমেরিকা থেকে পাওয়া হেলিকপ্টারগুলো পেশোয়ারে বসে রইল। একটিকেও পাঠানো হল না পূর্ব বাংলায়। বৃটিশ ও মার্কিন সৈন্যরা গিয়ে মৃতদেহের স্তুপ পরিষ্কার করল বাংলাদেশে। বাংলাদেশ যে পাকিস্তানের কলোনিমাত্র তা বুঝতে আর শিশুরও বাকী রইলনা।

ইয়াহিয়া বাহিনীর প্রথম লক্ষ্যস্থল ছিল শহরগুলো। বাংলাদেশে ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোহরও রাজশাহী শহরে পাকিস্তানী বাহিনীর ক্যাণ্টনমেণ্ট। প্রধান দুটি বন্দর হল চট্টগ্রাম ও চালনা। বন্দর দুটো খোলা রাখা এবং ক্যাণ্টনমেণ্টগুলোকে সুরক্ষিত রেখে পাকিস্তানী বাহিনী চালাল এক বর্বর আক্রমণ। ইয়াহিয়া খান একবার বলেছিলেন, তিনি নাকি নাদির শাহের বংশধর ঃ বাংলাদেশের মানুষ তার এই বংশ গরিমার স্বাদ পেয়েছিল আক্রমণের প্রথম কয়েকদিনেই।

রাজধানী শহর ঢাকা। এখানেই পূর্ববাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি। শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের বাস, এখানেই শ্রমিক মধ্যবিত্তের সুদৃঢ় সংগঠন। নির্বাচনের ফলাফল প্রমাণ করেছিল যে গোটা দেশই স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে। ইয়াহিয়া বা

পশ্চিম পাকিস্তানীরা যে দলগুলোর উপর ভরসা করেছিল সেই মুসলিম লীগ, জামাতে-ইসলামি ইত্যাদি একটি ভোটও পায়নি বাংলাদেশে। তাই গোটা বাঙালী জাতীকেই শায়েস্তাকরার জন্য পাকিস্তানী বাহিনীকে মেলিয়ে দেওয়া হল।

আশ্চর্য এই যে ভিয়েতনামে যেমন মার্কিনীরা একটি তাঁবেদার গোষ্ঠি পেয়েছিল যাদের সামনে রেখে একটা পুতুল সরকার দাঁড় করাতে পেরেছিল বাংলাদেশে পাকিস্তানীরা তা পায়নি। নুরুল আমিনকে দিয়ে ঢাকা বেতারে একবার তিন মিনিটের ভাষণে ভারতের হস্তক্ষেপের নিন্দা করা হয়েছিল। কিন্তু তা করা হয়েছিল, যতদূর জানা গেছে, বন্দুকের ভয় দেখিয়ে। তারপর সব চুপচাপ। বাংলা দেশ মুক্তিযুদ্ধে একমন একপ্রাণ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুজিবর বলেছিলেন আমরা মরতে শিখেছি। আমাদের কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না। কোনো সেনাবাহিনীর সাধ্য নেই সাড়ে সাতকোটি মানুষকে মারে।

তাঁর কথার সত্যতা প্রমাণ করেছে বাংলাদেশের মানুষ। তারা প্রাণ দিয়েছে হাজারে হাজারে, কিন্তু পাকিস্তানীদের কাছে নতি স্বীকার করেনি। এমন আশ্চর্য আত্মত্যাগ, সাহসিকতা এবং দেশপ্রেম আমাদের কাছে অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। পাক-ভারত উপমহাদেশে বৃটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু এমন সর্বাত্মক সংগ্রাম কোনোদিন হয়নি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশের সকল মানুষ এমনভাবে কোনোদিনই যোগ দেয়নি। দেশের আমলাতন্ত্র, তার পুলিশ, সেনাবাহিনী বৃটিশরাজের আজ্ঞাবহ ছিল। অনেক গুপ্তচর বিশ্বাসঘাতক আমাদের দেশ প্রেমিকদের ধরিয়ে দিয়েছিল বৃটিশদের কাছে।

বাংলাদেশে সকলে এক। সাড়ে সাতকোটি মানুষই আত্মাহুতি দেবার জন্য কৃতসংকল্প। সরকারী কর্মচারী, আমলা, বিচারপতি, পুলিশ, বাঙালী সেনানী, নাবিক কাউকেই পাকিস্তানীরা সঙ্গে

পায়নি। ইতিহাসে এমন আশ্চর্য অভ্যুত্থান আমরা কমই দেখেছি।

সর্বাত্মক মুক্তিযুদ্ধ একেই বলে।

এই যুদ্ধ বাঙালীর জীবন মরণের যুদ্ধ। বাংলাদেশের ওপর পাকিস্তান সরকার যে আক্রমণ চালিয়েছে তার কারণ হিসাবে ইয়াহিয়া বলেছেন, আইনত পূর্ববাংলা পাকিস্তানের। সুতরাং সেখানে বিদ্রোহ দমনের অধিকার তার আছে।

এই আইন হল্ল বৃটিশের তৈরি ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অ্যাক্ট। যে আইনের বলে ভারত উপমহাদেশ ভেঙে পাকিস্তান সৃষ্টি করা হয়েছিল। বাংলাদেশের মানুষের কাছে এই আইন আজ একটি ছেঁড়া কাগজে পরিণত। কারণ, পাকিস্তানের কোনো নৈতিক অধিকার নেই ব্যাপক গণহত্যার পর বাংলা দেশকে তার রাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি রাজ্যরূপে অভিহিত করার।

যুদ্ধের কতকগুলো নিয়মকানুন থাকে। বাংলাদেশের যুদ্ধে পাকিস্তানী বাহিনীর আচরণ হানাদারদের মতো। একটি শৃংখলা পরায়ণ সেনাবাহিনীর সামরিক শিক্ষার কোনো প্রমাণ তারা রাখেনি। এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানের গণতান্ত্রিত চিন্তাধারাকেও কোনোরূপ মর্যাদা দেয়নি ইয়াহিয়া খার সৈন্যরা।

বাংলাদেশের গণঅভ্যুত্থানের সমর্থনে পৃথিবীর বিবেকবান মানুষের পক্ষে এসে দাঁড়ায় পশ্চিম পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবীরাও। ২৮ মার্চ তারিখে পশ্চিম পাকিস্তানের শতাধিক শিল্পী সাহিত্যিক, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা এবং ছাত্র বাংলাদেশের মানুষের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের সমর্থনে এক বিবৃতি দিয়ে দাবি জানান অবিলম্বে গণতন্ত্র ও জনগণের সার্বভৌম অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠার। বিবৃতিতে বলা হয়ঃ আমরা বাংলাদেশের জনগণকে অভিবাদন জানাই। তার শহীদের আত্মদানের মধ্যে আমরা গোটা জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সংকেত দেখতে পাচ্ছি। আমার পূর্ব বাংলার

মানুষকে এই আশ্বাস দিই যে, তাদের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের পাশে আমরা আছি।

বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন : প্রবীণ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা মীর্জা মোহাম্মদ ইব্রাহিম, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক এরিক সাইপ্রিয়ান, আবতুল্লা মালিক, ইসরাত রহমান, হামিদ আখতার, কবি হাবিব জালিব, ন্যাশনাল আওয়ামি পার্টির শামিন আশরফ মালিক ও মাসুদ মুনওয়ার, আওয়ামি আদাবি আঞ্জুমানের আহমেদ সলিম এবং বেগম তাহিরা মুজাহর আলি খান।

ন্যাশনাল আওয়ামি পার্টির নেতা খান ওয়ালি খান আগেই মুজিবরের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন।

ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনীর আক্রমণ আরম্ভ হবার এক সপ্তাহ পর লণ্ডনের বিখ্যাত টাইমস্ পত্রিকায় লুইস হেরেন একটি মর্মন্তুদ বিবরণ প্রকাশ করেন বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় পাকিস্তানী বাহিনীর গণ্যহত্যা সম্পর্কে। পত্রিকাটি বৃটিশ এবং তার মতামত সর্বত্র বিশেষ মূল্য দিয়ে বিবেচনা করা হয়। বৃটিশ পত্রিকা এ সম্পর্কে কোনো অতিরঞ্জন করবে, একথা কেউ বলবেন না।

এই বিবরণটি উদ্ধারযোগ্য :

লণ্ডন, ৩ এপ্রিল : পাকিস্তান সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে 'জেনোসাইড' বা গণহত্যার যুদ্ধাভিযান সুরু করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তাদের লক্ষ্য হল, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিজীবী নেতৃত্বের উৎপাদন। এই উদ্দেশ্য ভালভাবেই সাধিত হয়েছে বলা চলে।

চিরাচরিত ধর্মীয় বৈরিতাও জীইয়ে তোলা হয়েছে। সৈন্যরা হাজার হাজার হিন্দুকে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ। এই অভিযোগগুলো করেছেন একজন তরুণ যিনি তুবৎসর কাল ঢাকা থাকবার পর এই সপ্তাহে এখানে এসে পৌঁছেছেন। নানাকারণে তাঁর নাম প্রকাশ করা যাচ্ছে না। কিন্তু তাঁকে আমি একজন স্থিরবুদ্ধি এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তি রূপেই জানি।

তিনি বলেছেন যে, শেখ মুজিবর রহমান ঘাতকদের হাত এড়াতে পেরেছেন। কিন্তু তাঁর এগারোজন দেহরক্ষীই নিহত হয়েছেন।···এই সংবাদদাতার মতে ২৫ মার্চ রাত্রিতে আক্রমণের প্রথম দিকেই দৈহিক ও মানসিক ধ্বংস সাধনের একটি সুপরিকল্পিত প্যাটার্ন সুস্পষ্ট ভাবে দেখা দেয়। অল্পক্ষণ পরেই এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে কয়েকটি গোষ্ঠিকে বেছে নেওয়া হয়েছে সীমাহীন বর্বরতার শিকার রূপে। এদের মধ্যে ছিল আওয়ামি লীগ নেতৃবৃন্দ, লীগের বিপ্লবী ছাত্রবৃন্দ, অধ্যাপকবৃন্দ ও তাদের পরিবারবর্গ এবং হিন্দুরা।

ফৌজী কমাণ্ডাররা স্পষ্টতই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে ছাত্ররাই হল ভবিষ্যতে বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের অংকুর। অধ্যাপকরা হলেন পূর্ব পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিধি—ভবিষ্যতে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রশাসনের পক্ষে যাঁরা ছিলেন অপরিহার্য।

আওয়ামি লীগ নেতাদের হত্যার কারণ সহজেই বোঝা যায়। হিন্দুদের সম্পর্কে আমার সংবাদদাতার নিশ্চিত ধারণা, সৈন্যদের বোঝানো হয়েছিল তারাই হল বিচ্ছিন্নতা-আন্দোলনের অপশক্তি।··· প্রথম পাঁচদিনের যুদ্ধে কী ঘটেছিল তা কোনো একজনের পক্ষে দেখা হয়তো সম্ভব ছিল না। কিন্তু নিচের ঘটনাবলী প্রত্যক্ষদর্শীরই বিবরণ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জগন্নাথ হল হিন্দু ছাত্রাবাস। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ট্যাঙ্ক নিয়ে যাওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচিল গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের বাইরে দেখা গেল একটি সদ্য-খনিত গণ-কবর।

ভবনের ভেতরে প্রত্যেক ঘর থেকে রক্তের ধারা চুঁইয়ে আসছিল। প্রত্যেক ঘরই লুণ্ঠিত। নিকটবর্তী চাকরদের কোয়ার্টারে ছটি বীভৎস ভাবে নিহত মৃতদেহ। অধ্যাপকদের ফ্ল্যাটগুলোতে বিছানায়

গুলিবিদ্ধ শিশুদের মৃতদেহ পড়েছিল। অন্য একটি ফ্ল্যাটে একজন প্রবীণ অধ্যাপকের গোটা পরিবারকে নিহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়।

বাইরে ছাত্রদের মৃতদেহ তাদের হাতে তখন ধরা ছিল লাঠি। বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের সিঁড়িতে রক্তাক্ত পদচিহ্ন, দেয়ালে চাপ চাপ রক্তের দাগ। শহরের পুরনো এলাকার দুটি বৃহত্তম বাজারে, একটি সম্পূর্ণ হিন্দুদের এবং অপরটিতেও তাদেরই সংখ্যাধিক্য, স্তূপীকৃত শব এবং অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহের গন্ধ এমন উৎকট যে জীবিতদের নাকে কাপড় গুঁজে চলাফেরা করতে দেখা যায়। বিধ্বস্ত বাড়িতে অথবা জঞ্জালের স্তূপের মধ্যে অন্তত সাত-আটটি মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। একটি বাড়িতে আমার সংবাদদাতা দেখলেন একটি মৃতদেহকে ঘিরে তাঁর স্ত্রী বিলাপ করছেন। লোকটিকে কয়েক মিনিট আগে হত্যা করা হয়েছে।

পাঁচটি অন্ধকার দিন

এ হল প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। নিচে দেওয়া হল প্রথম পাঁচদিনের যুদ্ধে যা ঘটেছিল। এর খানিক অংশ আমার সংবাদদাতা সংগ্রহ করেছিলেন বন্ধুদের কাছ থেকে ঢাকা থেকে চলে আসবার আগে।

২৫ মার্চ মধ্যরাত্রির অল্প আগে সেনাবাহিনী দলে দলে বেরিয়ে পড়ল শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো দখল করতে। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া খান করাচী রওনা হয়ে গেছেন। ধারণা করা হয় যে, সেনাবাহিনী তাঁর ব্যক্তিগত নির্দেশেই কাজ করেছিল।

একজন সরকারী মুখপাত্র বলেন যে, প্রেসিডেণ্ট চলে গেলেই সেনাবাহিনীর ক্যাণ্টনমেণ্টের সমস্ত রাস্তা ব্যারিকেড করা হবে এ সম্পর্কে আগেই হুঁসিয়ারি ছিল। শহরের সর্বত্র ব্যারিকেড তোলা হয়েছিল। মধ্যরাত্রি থেকে পরদিন দুপুর পর্যন্ত তা চলে। ঢাকা

শহর ভারী কামান, মেসিনগান ও অন্যান্য স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গুলিবর্ষণে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

সারারাত্রি ধরে জ্বলতে থাকে আগুনের শিখা এবং ট্রেসার বুলেটের ঝিলিক। ভোরবেলা শহরের অধিকাংশ জায়গা থেকে বিরাট ধোয়ার কুণ্ডলী উঠে উত্তরদিকে ধনাঢ্য উপকণ্ঠ গুলসানের দিকে ধীরে ধীরে ছড়াতে থাকে। বিহারী এলাকা'তও দেখা যায় আগুন। মাসের গোড়ার দিকে এখানে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হয়েছিল।

২৬ মার্চ সান্ধ্য আইন ও 'দেখামাত্র গুলি করার' আদেশ জারী করা হয়। সৈন্যদের দেখা গেল স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র থেকে অবসর প্রাপ্ত বাঙালী আর্মি অফিসার কর্ণেল ওসমানির বাড়ির দিকে তাগ্ করে গুলি করতে। সারারাত ধরে গুলি চলে। শনিবার ২৬ মার্চ পাঁচ ঘণ্টার জন্য কার্ফু শিথিল করা হয়।

শহরের নতুন এলাকাগুলোতে হাঁটবার সময় বিধ্বস্ত ব্যারিকেড ও ভাঙা কুড়েঘর সর্বত্র চোখে পড়ে।

শহরের পুরনো এলাকায়, পুলিশ লাইনের কাছে, সব কিছুই সম্পুর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। এখানেই নাকি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ করা হয়েছিল পুলিশ ও পূর্বপাকিস্তান রাইফেলসের সাহায্যে। তাদের সকলকে নাকি এই ঔদ্ধত্যের জন্য হত্যা করা হয়। বাস্তুহারা মানুষ ইতিমধ্যে শহর ছেড়ে চলে যেতে সুরু করেছে। তাদের সঙ্গে ছোট একটি করে কাপড়ের পুঁটলি ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

রবিবার কার্ফু আবার প্রত্যাহার করা হয় জীবিতদের খাদ্য সংগ্রহের জন্য। নিউ মার্কেট সম্পুর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। রমনা রেসকোর্সে দুটি ছোট গ্রাম এবং হিন্দুদের একটি মন্দির আগুনে ভস্মীভূত। ধ্বংসস্তূপে অনেক মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। যে কজন গ্রামবাসী তখনও জীবিত তারা ভীত ও আতঙ্কগ্রস্ত।

হাইকোর্ট ভবনের সামনে একটি মৃতদেহ। সবচেয়ে নির্মম ধ্বংসকাণ্ড সংগঠিত হয় শহরের পুরনো এলাকায়। সর্বত্রই মৃতদেহ।

বাজারটির ওপর গোলন্দাজরা কামান থেকে সরাসরি গোলা ছুঁড়েছিল।

সৈন্যরা যখন সন্ত্রাসের পথ নিল তখনই শহর ছেড়ে শরনার্থীরা পালাতে থাকল। সর্বত্রই সৈন্যদের দেখা যেতে লাগল—তাদের হাতে বাজুকা, মেশিনগান ও রাইফেল।

বহু ধ্বংসকাণ্ডই ছিল অর্থহীন। বাংলাভাষার শহীদদের স্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত চমৎকার শহীদ মিনারটিকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে।—মৃতের সংখ্যা কত তার হিসাব দিতে আমার সংবাদদাতা অসম্মত হন। তবে তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে মৃতের সংখ্যা হাজার হাজার। নিহতদের মধ্যে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের ডীন ডঃ ইন্নাস আলি। আওয়ামি লীগের একজন প্রথম সারির নেতা ডঃ কামাল হুসেনও সৈন্যদের হাতে নিহত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

সামরিক গভর্ণর লেফটেনান্ট জেনারেল টিক্কা খানকে শপথ গ্রহণ করাতে অসম্মত হওয়ার ঢাকা হাইকোর্টের একজন বিচারপতিকে হত্যা করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ নুরুল হুদাকে নিদারুণভাবে প্রহার করা হয়।

এ থেকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে, পূর্ব পাকিস্তান অন্তত এক দশক এবং সম্ভবত এক প্রজন্মের জন্য রাজনৈতিক ও বুদ্ধিজীবী নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত থাকবে।"

একমাত্র অভিযানকারী হানাদার বাহিনীর হাতেই একটি বিজিত দেশ এমনভাবে লাঞ্ছিত হতে পারে। ঢাকায় ইয়াহিয়ার পাঠান সৈন্যরা যা করেছে তার নজীর হয়তো বা একমাত্র নাৎসী জার্মানীতে মিলবে। তাহলেও জার্মাণরা নিজের দেশের লোককে এমনভাবে ব্যাপক গণহত্যা করেনি। তাদের শিকার ছিল ইহুদী এবং পরাজিত দেশগুলোর অধিবাসী। ইয়াহিয়া দাবি করছেন পূর্ববাংলা পাকিস্তানের অংশ। সুতরাং এ বিষয়ে কারু হস্তক্ষেপ তিনি বরদাস্ত করবেন না।

কিন্তু নিজের দেশের এবং একই ধর্মাবলম্বীদের ওপর কোনো রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী এমন বর্বর অত্যাচার করতে পারে তা বাংলাদেশের ঘটনা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন হত।

কেন এই বর্বরতা ? তার কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে আলোচনা বৈঠক অকস্মাৎ ভেঙে দিয়ে তিনি যখন চলে গেলেন করাচীতে তখনকার ঘোষণায়। তিনি করাচী গিয়ে এক ঘোষণায় জানালেন, শেখ মুজিবর রহমান ও তাঁর দল পাকিস্তানের শত্রু, পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে তারা বিচ্ছিন্ন করে নিতে চেয়েছিল।

মুজিবরের অপরাধ, তিনি আলোচনার সময়ে নাকি বলেছিলেন যে, মার্শাল ল তুলে নিয়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া হক। এবং পাকিস্তানের দুই অংশে ন্যাশনাল এসেম্বলি ভাগ করে দেওয়া হক মীমাংসার সূত্র হিসাবে।

এ কথা ইয়াহিয়ার জবানীতে আমরা জানতে পাই। মার্শাল ল তুলে দেবার দাবি মুজিবর আগেও করেছিলেন। এ দাবি তো ভুট্টোরও ছিল। এই দাবি অযৌক্তিক হবে কেন ? সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করে জনপ্রতিনিধি যখন নির্বাচিত হল তখন সামরিক শাসন থাকার আর যুক্তি কি ? ইয়াহিয়া বললেন, এ হল মুজিবরের একটি কৌশল। সামরিক আইন তুলে নিলেই তিনি যা খুশি তাই করতে পারতেন।

ইয়াহিয়া খান কোন্ আইনের বলে পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করেছিলেন, এ প্রশ্নও তো সঙ্গতভাবেই করা যায়। তিনি ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিলেন আইয়ুবের হাত থেকে। পাকিস্তানের জনগণের সঙ্গে কোনো পরামর্শ তখন করা হয়নি। মুজিবর ও তাঁর পার্টি জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত। তিনি নিশ্চিতই এ দাবি করতে পারেন যে, সামরিক আইন প্রত্যাহার করে নিয়ে তাঁদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হক।

এতেই খাপ্পা হয়ে ইয়াহিয়া খান তাঁর সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিলেন, বাঙালীদের শায়েস্তা করতে যাতে কোনোদিন তারা স্বায়ত্ত

শাসনের নাম আর মুখে না আনে। ইয়াহিয়া বলেছিলেন, বাঙালীদের এই অপরাধের শাস্তি পেতেই হবে।

কী শাস্তি ইয়াহিয়ার সৈন্যরা বাংলাদেশের মানুষকে দিয়েছিল তার বিবরণ সাংবাদিকরা দিয়েছেন। ২৫ মার্চ সমস্ত বিদেশী সাংবাদিকদের ঢাকা থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়। ঢাকায় কী ঘটছে তার খবর পাবার কোনো উপায় ছিল না। মুক্তিযুদ্ধ সুরু হবার পর পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত দিয়ে এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদদাতা ডেনিস নিলড্ এবং ফটোগ্রাফার মাইকেল লরেণ্ট পায়ে হেঁটে, নৌকায়, যখন যেমন যানবাহন পেয়েছেন তাতে করেই ঢাকায় গিয়ে পৌঁছান। আবার সেভাবেই ওরা ফিরে আসেন চুয়াডাঙা হয়ে কলকাতায়।

১৩ এপ্রিল ১৯৭০ ঢাকা ডেট লাইনে তাঁদের খবর সারা দুনিয়াকে চমকে দেয়।

ডেনিস নিলড্ লিখলেন : ঢাকায় এখন গেষ্টাপোর রাজত্ব। একথা আমাদের বলেছেন একজন পশ্চিমী কূটনীতিবিদ। ব্যাপক গণহত্যার পর ঢাকা এখন একটি আতঙ্কগ্রস্ত পদানত নগরী। দগ্ধ শহরের সর্বত্র পাকিস্তানের পতাকা উড়ছে। বাংলাদেশের পতাকা কোথাও দেখা গেলেই তৎক্ষণাৎ মৃত্যু।

রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে ইয়াহিয়ার পাঠান সৈন্য জীপে ও ট্রাকে। হাতে তাদের রাইফেল ও সাব মেসিন গান। বাঁশ ও কাঠের তৈরি শ্রমিকদের হাজার হাজার বাড়ির শুধু দগ্ধাবশেষ রয়েছে।

আওয়ামি লীগ কর্মী ও বুদ্ধিজীবীদের ধরে এনে সৈন্যরা একসঙ্গে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে গুলি করেছে। সুপরিকল্পিত এই আক্রমণে, ঢাকার কূটনীতিবিদরা মনে করেন, ছয় হাজার লোকের প্রাণ যায়। এখনও রাত্রি বেলা রাইফেলের গুলির আওয়াজ শোনা যায়।

পশ্চিম পাকিস্তানী অবাঙালীরা ব্যাপক লুঠতরাজ করছে। হাজার হাজার পরিবার সৈন্যদের অত্যাচার এড়াবার জন্য পালিয়ে যাচ্ছে গ্রামের দিকে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। ছাত্রাবাসগুলোর সর্বত্র হিংস্রতার চিহ্ন ছড়ানো, বুলেটের ঘায়ে শত ছিদ্র দরজা ও দেয়াল। নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকদের মতে, সৈন্যদের আক্রমণে ৩০০ থেকে ৫০০ ছাত্র নিহত হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, অনেককে দেয়ালের সামনে সারিবন্দী দাঁড় করিয়ে মেশিনগানের গুলিতে হত্যা করা হয়। অন্তত আটজন প্রখ্যাতনামা অধ্যাপককে হত্যা করা হয় গুলি করে।

পূর্ব পাকিস্তান পুলিশকে নিরস্ত্র করা হয়েছে। ইস্টবেঙ্গল রেজিমেণ্ট ও ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলসের হতাবশিষ্টদেরও নিরস্ত্র করে বন্দী করা হয়েছে। ঢাকায় রাত নটা থেকে ভোর পাঁচটা কার্ফু। পাকিস্তানী সৈন্য ও অবাঙালী লুঠেরাদের দৃষ্টি এড়াতে বহু পরিবার রাত্রে আলো নিভিয়ে বাড়িতে বসে থাকে।

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিমানে ক্রমাগত সৈন্য আসছে। যুদ্ধ সুরু হবার পর ১০,০০০ সৈন্য এসেছে বলে অনুমান। মোট সৈন্য হবে ৩৫,০০০। পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যের সংখ্যা ৭০,০০০ বলে আগে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল তা অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়।

বাংলাদেশের কথা জোরে কেউ বলে না। একজন বাঙালী চাষী আমাকে বলেন, বন্দুকের ভয়ে পাকিস্তানী পতাকা উড়িয়েছি। বাংলাদেশ রয়েছে আমাদের বুকে।

গত দুসপ্তাহের রক্তাক্ত হিংস্রতা হয় তো বা একটি নতুন জাতির জন্মযন্ত্রণা। কিন্তু এই স্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে অবশ্যই তাড়াতাড়ি যুদ্ধের কৌশল শিখতে হবে।"

যুদ্ধের কৌশল কী ভাবে কতটা আয়ত্ত করবে বাংলাদেশের মানুষ তার পরিচয় দেবে আগামী দিনের ইতিহাস। কিন্তু পৃথিবীর মানুষ স্তব্ধ বিস্ময়ে এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের বিবরণ শুনে যে প্রশ্ন করছে তা হল—এর নাম কি যুদ্ধ?

এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, পূর্ববাংলায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে

আনতে কোনো আগ্রহ নেই পশ্চিম পাকিস্তানের। তারা জানে গোটা কয় বিশ্বাঘাতক ছাড়া বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষই তাদের বিরুদ্ধে। এবং নিরস্ত্র, অসহায় এবং শান্তিপ্রিয়। এদের হত্যা করে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে পদানত করাই এদের উদ্দেশ্য।

যাতে কোনো সংবাদ পৃথিবীর মানুষ জানতে না পারে তার জন্য পাকিস্তান সরকার আন্তর্জাতিক রেড ক্রসকেও বাংলাদেশে যেতে দেয়নি। রেড ক্রস দুর্গত মানবতার সাহায্যের জন্য ঢাকায় যাবার অনুমতি চেয়েছিল। করাচীতে আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের প্রতিনিধিরা এলে ইয়াহিয়া খানের সরকার তাঁদের জানিয়ে দেয় যে, সাহায্যের কোনো প্রয়োজন নেই। পাকিস্তান সরকার নিজেরাই নাকি সাহায্য করছেন যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলার মানুষকে।

অথচ আক্রমণের পর থেকে যত সংবাদ এসেছে সীমান্তের এপারে তাতে দেখা যায় পাকিস্তানী বাহিনী যেখানে শক্তিশালী সেখানে সব কিছু ধ্বংস করে দিয়েছে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে, নির্বিচারে হত্যা করেছে সকলকে। নারীদের বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করেছে, শিশুদেরও রেহাই নেই। বাঙালী যুবক সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়াই তাদের উদ্দেশ্য।

কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ এই অত্যাচারের সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়ায়নি। কেউ হানাদারদের কাছে প্রাণভিক্ষা করেন নি। মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য আত্মদানই তারা মনে করেছেন শ্রেয়। শহরে, গঞ্জে, গ্রামে গড়ে উঠেছে এক আশ্চর্য প্রতিরোধ—সংগঠিত হয়েছে গণফৌজ। যার হাতে যেমন অস্ত্র ছিল, যে যেখানে ছিল সেখানেই গড়ে তোলা হল প্রতিরোধ বাহিনী। হানাদারদের বাংলাদেশ থেকে নিশ্চিহ্ন না করা পর্যন্ত এ সংগ্রামের শেষ নেই।

এই যুদ্ধ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। প্রত্যেক মুক্তিযুদ্ধই ন্যায় যুদ্ধ। এই মুক্তিযুদ্ধের আশ্চর্য গৌরবময় বিবরণ পেয়েছি আমরা রণাঙ্গণ থেকে ফেরা সাংবাদিকের রিপোর্ট।

এখানে একটি রিপোর্ট আমি উদ্ধৃত করছি। এই রিপোর্টটি দিয়েছিলেন যুগান্তর পত্রিকার সহকারী সম্পাদক শ্রীবরুণ রায়। রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় যুগান্তরে ৬ এপ্রিল, ১৯৪০।

কুষ্টিয়া—একটি যুদ্ধের কাহিনী

ছাব্বিশে মার্চ। ভোরের কিছু আগে কুষ্টিয়ার এস-ডি-ওকে সৈন্যরা গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল।

কারফিউ জারী করা হলো ভোর ছ'টা থেকে।

কিন্তু ততক্ষণে শহরের রূপ পাল্টে গেছে। স্বেচ্ছাসেবকদের ছুটোছুটি চলছে রাস্তায়। তাদের হাতে লাঠি, সড়কি, কুড়োল ও কোদাল। কারো সঙ্গে রাইফেল কিংবা সিভিল গান।

বিরাট এক জনতা ষ্টেশনে হানা দিয়ে চোখের নিমেষে উপড়ে ফেলল ট্রেনের লাইন। ততক্ষণে ওদিকে আরেকটি দল কেটে দুফালা করে দিল কুষ্টিয়া-মেহেরপুর সড়কের অনেকটা অংশ।

দেখতে দেখতে সমগ্র শহরে রাস্তায় তৈরী হয়ে গেল ব্যারিকেড। গাছ, পাথর, আলকাতরার ড্রাম, হাতের কাছে যা পাওয়া গেল তাই দিয়েই ওরা তৈরী করল দুর্ভেদ্য অবরোধ।

থানাপাড়ায় এক জায়গায় রাস্তা সারানোর জন্যে জড়ো করা ছিল কিছু ইঁট। সেগুলি রাস্তায় নামিয়ে এনে ওরা গেঁথে তুলল মাথা সমান উঁচু একটা দেয়াল।

দিনের আলো ভালো করে ফোটবার আগেই শহর কুষ্টিয়া জেলার অন্যান্য জায়গা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

প্রায় একই সঙ্গে কুষ্টিয়া জেলা বিচ্ছিন্ন হলো বাংলা দেশের অন্যান্য

স্থান থেকে। বিনা সংঘর্ষে ও রক্তপাতে বাইরে থেকে কোনো নতুন হানাদারের আর কুষ্টিয়ায় প্রবেশ করার উপায় রইল না।

তার পরেই আরম্ভ হলো ব্যারিকেডের লড়াই।

মাঝে মাঝে এক-একটা মিলিটারীর জীপ আসে—সঙ্গে উদ্যত মেশিনগান—আর ব্যারিকেডগুলি ভেঙ্গে দিয়ে যায়। দেখতে দেখতে সেগুলি আবার নিজের জায়গায় ফিরে আসে।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সুরু হলো গুলী। প্রথমে বিক্ষিপ্ত তার পর ঘন ঘন। রাস্তায় লোক দেখামাত্র ওরা গুলী করতে লাগলো। লুটপাট করতে লাগলো দোকান। কোথাও কোথাও জ্বালিয়ে দিল আগুন। কোনো বাড়ির কোনো জানালা হয়ত কিছুটা ফাঁক ছিল, সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে দিয়ে ছিটিয়ে দিল গুলী।

এবং শেষে ওরা বাড়ি বাড়ি চড়াও হতে লাগলো। বহু লোককে ওরা বাড়ি থেকে রাস্তায় টেনে এনে হত্যা করল। বর্ব্বরেরা মেয়েদের অপমানিত অসম্মানিত করে ধরে নিয়ে গেল দলে দলে। এমন কি সাধারণ ডাকাতের দলের মতো সোনা-দানা, টাকা পয়সা যা পেল তা-ও লুট করে সঙ্গে নিয়ে গেল।

পরে পুলিশ লাইনের পতনের পর যে সব সৈন্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তাদের অনেকেরই পকেট থেকে সোনার হার ইত্যাদি পাওয়া যায়।

এইভাবে সারা শহরে একটা সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করার পর হানাদারেরা ঘাঁটিতে ফিরে এসে সুরক্ষিত করল নিজেদের।

ঐ সময় জনতা সাধারণভাবে নিজেদের হাত গুটিয়েই রেখেছিল। নেতৃত্বের নির্দেশ ছিল সেই রকম।

হানাদারেরা ভাবলো তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। জনতা ভয় পেয়ে গুটিয়ে গেছে। তাই তারা আর নতুন কোনো জায়গায় ছড়িয়ে পড়বার কোনো চেষ্টাই করল না।

ভয় পেয়ে যে গুটিয়ে যাবে, গোড়া থেকে এটাই তাদের ধারনা।

তাই যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে রওনা হবার সময় তার খুব সামান্য রসদই সঙ্গে নিয়েছিল। ভেবেছিল, যশোরের সঙ্গে সরবরাহের রাস্তাটা খোলাই থাকবে।

কিন্তু তারা জানতো না বাংলা দেশের মুক্তি বাহিনী অপেক্ষা করছিল উপযুক্ত সময়ের জন্যে। তারা বুঝতে পারেনি জনতা প্রস্তুত হচ্ছিল নিছক সংখ্যার জলোচ্ছ্বাসে তাদের ভাসিয়ে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে।

তাদের ধারনা ছিল না যে, তাদের রসদের অবস্থার সংবাদ মুক্তি বাহিনীর নেতৃবৃন্দের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গেই।

পুলিশ লাইনে এবং অন্যান্য কয়েকটি জায়গায় কায়েম হয়ে বসে থেকে হানাদারেরা যখন নিশ্চিন্ত বোধ করছিল তখন মুক্তি বাহিনী প্রস্তুত হচ্ছিল একটি চূড়ান্ত আঘাত হানবার জন্যে।

ছাব্বিশ, সাতাশ আর আঠাশে মার্চ, এই তিনদিন কুষ্টিয়ার রণাঙ্গন ছিল আশ্চার্য রকমের স্তব্ধ। এই তিন দিন মুক্তি বাহিনী হানাদারদের সঙ্গে কোনো সংঘর্ষে লিপ্ত হয় নি। বিনিময় হয় নি কোনো গুলী। গুলী যা ছুটছে তা হানাদারদের রাইফেলের মুখ থেকে।

মুক্তি বাহিনী তার বদলা নেয়নি গুলী দিয়ে তার বদলা ওরা নিচ্ছিল অন্যভাবে।

এই তিনদিন ধরে হানাদারেরা যখন পথচারীদের নির্বিচারে হত্যা করছিল, বাড়ি বাড়ি চড়াও হয়ে একটা সন্ত্রাসের আবহাওয়া কায়েম করে রাখছিল, তখন ওরা উপদ্রুত এলাকা থেকে সরিয়ে নিচ্ছিল নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের। শহর এলাকা থেকে দূরে, গ্রামাঞ্চলে।

এই তিনদিন ধরে সাইকেলে, মোটর সাইকেলে এবং লোকের হাতে হাতে অস্ত্রশস্ত্র সমানে বাহিত হচ্ছিল অগ্রবর্তী এলাকায়, মোটামুটি অবিচ্ছিন্ন ধারায়।

মেহেরপুরে ও চুয়াডাঙ্গায়, গোপন ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল রেখে তৈরী হচ্ছিল বোমা। সরকারী অফিসারেরা, এমন

কি অনেক উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসারও ব্যক্তিগত ভাবে বোমা বাঁধার এই কাজের তদারক করতে লাগলেন। তাঁদের অফিসগুলি দেখতে দেখতে এক একটি অস্ত্রাগারে পরিণত হলো।

চুয়াডাঙ্গার ট্রেজারীতে ছিল চোদ্দশ'র মতো বন্দুক। সেগুলি আনসার আর ছাত্র স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হলো। যেখানে যত থানা ছিল সেখানকার অধিকাংশ বন্দুক আর গুলী তুলে দেওয়া হলো জনতার হাতে। কিছু অস্ত্র সংগৃহীত হলো অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র থেকে।

এবং এই তিনদিন ধরে ওরা দিনের ও রাতের প্রতিটি মুহূর্তে ধীরে ধীরে কিন্তু অব্যাহত ধারায় গড়ে তুলছিল এক তীব্র, উত্তাল, দুর্ভেদ্য প্রতিরোধের দেয়াল।

মেহেরপুর থেকে রওনা হয়েছিল যে ফৌজ, কিংবা চুয়াডাঙ্গা থেকে রওনা হয়েছিল যে বাহিনী, তার সঙ্গে চারদিক থেকে রওনা হয়েছিল মুক্তি সেনার আরো অসংখ্য মিছিল।

আনসার, মুজাহিদ, ছাত্র স্বেচ্ছাসেবক, সাধারণ গ্রামবাসী। তাদের কারো হাতে রাইফেল, কোমরে ম্যাগাজিন। কারো হাতে বাঁশের লাঠি, সড়কি, দা, রামদা। কারো কাঁধ থেকে ঝোলানো থলেতে হ্যাণ্ড-গ্রেনেড। কারো হাতে তীর ধনুক। কারো গা খালি, কোমরে একটা ময়লা কাপড় আব্রু রক্ষা করছে। কারো গায়ে খাকি ইউনিফর্ম, মাথায় টুপি। কারো গায়ে খাকি ট্রাউজার্সের সঙ্গে ছাই রংয়ের খদ্দরের শার্ট। কারো পরনে পায়জামা আর পাঞ্জাবী। কারো পরনে সবুজ লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি। কারো মুখ ভাঙ্গা, চোখ কোটরগত, শরীরে স্বল্পাহারের ন্যুব্জতা। কারো তরুণ সলজ্জ মুখে উজ্জ্বল স্বপ্নের আভাস। কারো পায়ে চামড়ার বা কাপড়ের বুট, কারো পায়ে হাওয়াই চপ্পল, কারো কারো বা একেবারেই খালি পা। কারো পিঠের সঙ্গে বাঁধা আছে কিছু রেশন, কারো কোঁচরে শুধুই কিছু শুকনো চিঁড়ে আর গুড়।

তাদের লক্ষ্য ছিল শুধু একটাই ঃ শহর কুষ্টিয়া।

তারা প্রথমে আসছিল একটা মৃদু ধারায়, তারপর স্রোতের মতো, শেষে জলোচ্ছ্বাসের বেগে। আঠাশে তারিখ রাত্রে কমপক্ষে তিরিশ হাজার মুক্তি ফৌজ জড়ো হয়েছিল কুষ্ঠিয়া শহরের আশেপাশে।

যে কারণেই হোক, হানাদারেরা ঐ সময় নিজেদের আবদ্ধ রেখেছিল তাদের দখল করা চার-পাঁচটি ঘাঁটির মধ্যেই।

আক্রমণ সুরু হলো উনত্রিশে মার্চ, মধ্যরাত্রে।

তার আগে শহরটিকে তিনদিক থেকে সম্পূর্ণ ঘিরে ফেলা হলো। তিরিশ হাজার মানুষের ঐ দেয়াল ভেদ করে কারো পক্ষে বেরোনো সম্ভব ছিল না।

আরেক দিকে ছিল গড়াই নদী। প্রকৃতি নিজেই সেদিকটি রক্ষার ভার গ্রহণ করেছিল।

রাত আটটার কিছু পরে ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস, পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ ও স্বেচ্ছাসেবকদের এক বিরাট বাহিনী এগিয়ে গিয়ে সমগ্র পুলিশ লাইন এলাকাটিকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল। সেই সঙ্গে আরেকটি দল গিয়ে অবরোধ সৃষ্টি করল অন্য ঘাঁটিগুলির চারপাশে।

পুলিশ লাইনের কাঁটাতারের ওপারে তখন প্রস্তুত হচ্ছিল হানাদারের দলও।

পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের ঐ দলটির সঙ্গে যেসব বাঙালী সৈন্য ছিল, তাদের রাখা হলো একেবারে সামনে। সেই সঙ্গে পাঠান সৈন্যদেরও। পাঞ্জাবী সেনারা থাকলো সবার পেছনে। প্রত্যেকটি প্রবেশ পথে বসানো হলো মেসিনগান। মেসিনগান বসানো হলো দোতালার ব্যারাকসের বারান্দায়।

তারপর তারা অপেক্ষা করতে লাগলো আক্রমণের। অন্ধকার রাত্রে, কাঁটাতারের এপারে ওপারে সে এক অস্বস্তিকর নীরবতা।

ঘড়ির কাঁটায় মধ্যরাত্রির শেষ মুহূর্তটুকু ধ্বনিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ নীরবতার আবরণকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়ে আওয়াজ

উঠল, "জয় বাংলা !" সে আওয়াজ হাজার কণ্ঠে ছড়িয়ে পড়ল ঃ 'জয় বাংলা !"

শুধু একট সংকীর্ণ মুহূর্তের অপেক্ষা। তারপরেই নরক উন্মুক্ত হলো যেন।

এক সঙ্গে অনেকগুলি হ্যাণ্ড-গ্রেনেডের বিস্ফোরণ পুলিশ লাইনকে বিদীর্ণ করল। সেই সঙ্গে সুরু হলো গুলি। তারই মধ্যে মুক্তি ফৌজের কয়েকটি সুইসাইড স্কোয়াড গ্রেনেড ছুঁড়তে ছুঁড়তে ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রবেশ পথের মেশিনগানগুলির ওপর। ভালো করে গর্জে ওঠবার আগেই সেগুলি স্তব্ধ হলো।

পুলিশ লাইনের মধ্যে এখানে ওখানে ততক্ষণে অনেকগুলি আগুন জ্বলছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে অন্তত শ' তিনেক হ্যাণ্ড-গ্রেনেড নিক্ষিপ্ত হয়েছিল সেখানে। তার ধোঁয়ায় ভারী হয়ে আছে পুলিশ লাইনের আকাশ।

বুম ! বুম ! বুম ! গুলি আসতে সুরু করছে ওপাশ থেকেও। বৃষ্টির ধারার মতো গোলা। কিন্তু তার আগেই গুলি করতে করতে মুক্তি ফৌজ ঢুকে পড়েছে পুলিশ লাইনের ব্যারাকগুলির একতলায়।

চোখের সামনে দলে দলে সহযোদ্ধাদের ওরা মাটিতে লুটিয়ে পড়তে দেখল। ওরা দাঁড়ায়নি তবু। থেমে যায়নি। তাদের রক্তে পা ভিজিয়ে, তাদের শরীরের ওপরে পা রেখে ওরা এগিয়ে গিয়েছিল।

"আমরা ভ্রুক্ষেপ করিনি। সে সময় আমাদের ছিল না। আমাদের কোনো আর্তনাদ ছিল না। যে ভাইদের গা মাড়িয়ে আমরা এগিয়ে গিয়েছিলাম তাদের জন্যে শোক করবার ফুরসৎ আমরা পাইনি।" কুষ্ঠিয়ার সেই রক্তাক্ত রাত্রির স্মৃতি ফিরে মনে করার সময় আমাকে বলেছিলেন মুক্তি বাহিনীর একজন আনসার।

মহকুমা শহর মেহেরপুরে একটি ঘরে বসে তাঁর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। চারটি বিনিদ্র দিন ও রাত্রির সমস্ত ক্লান্তির ছাপ ছিল তাঁর চোখেমুখে। কিন্তু তাঁর উৎসাহে ও উদ্দীপনায় কোনো ভাঁটা ছিল না। ময়লা

একটা ধুতির ওপরে ততোধিক ময়লা একটা শার্ট পরা নেহাৎই একজন দরিদ্র ঐ কৃষক সন্তানকে দেখে কে বলবে যে সাত-আটজন হানাদার সৈন্যকে একা খতম করেছেন ?

"সেই মুহূর্তের কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারব না", তিনি বলছিলেন। "কত লোক যে মরেছে ঠিক নেই। কিন্তু আমরা ঠেলেঠুলে ঢুকে পড়েছি ভেতরে। একটা পাকিস্তানী সৈন্য আমার দিকে এল-এম-জি [লাইট মেশিনগান] মারল। লাগল না। আমি, এবং আমার সঙ্গে আরো কয়েকজন, আমাদের রাইফেল থেকে গুলি করলাম। লোকটা ছিটকে পড়ে গেল একটা কামানের ওপর।

"ঐ সময় হঠাৎ দেখি একজন বাঙালী সৈন্য ছুটতে ছুটতে সামনে এলেন। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'জয় বাংলা !' আমি বললাম : 'ভাই সাব, তুমি ঐ এল-এম-জিটাকে কবজা কর, আমি এই কামানটা দেখছি।

দুটোই ও'রা শেষ পর্য্যন্ত হস্তগত করেছিলেন। মুক্তিফৌজের একজন হয়ে সেদিন লড়েছিলেন পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ঐ বাঙালী সৈনিকটি। তাঁর মতো আরো অনেকে। মুক্তিফৌজের প্রবল ধাক্কায় প্রথম চোটেই ভেঙে পড়েছিল হানাদারদের অগ্রভাগ। গুলী করতে অস্বীকার করেছিল বাঙালী সৈন্যরা। তাদের অধিকাংশকেই সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করা হয়। কেউ কেউ পালাতে পেরেছিলেন। তাঁরা যোগ দেন মুক্তিফৌজের সঙ্গে।

যেসব পাঠান সৈন্য ছিলেন তাঁরা 'জয় বাংলা' ধ্বনি তুলে প্রথম সুযোগেই আত্মসমর্পণ করেন মুক্তিফৌজের কাছে।

পুলিশ লাইনের একতলায় মুক্তিফৌজকে প্রবেশ করতে দেখে হানাদারেরা ঘাবড়ে যায়। তারা পশ্চাদপদসরণ করে দোতালায় উঠে যায়। সেখানকার অনুকুল অবস্থান থেকে তারা মরীয়া হয়ে গুলী চালাতে থাকে।

কিন্তু মুক্তিফৌজকে তারা স্থানচ্যুত করতে পারেনি। তারা মরেছে

শ'য়ে শ'য়ে কিন্তু তবু তারা পুলিশ লাইনের দুর্গমূলে ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়েছে। সেই জলোচ্ছ্বাসের মুখে হানাদারেরা ছিল একেবারেই অসহায়।

তিরিশে মার্চ সকালে সৈন্যরা পুলিশ লাইনের মূলখাঁটি ছেড়ে দিয়ে সারকিট হাউসে, জেলা স্কুলে ও লাগোয়া আরো কয়েকটা বাড়িতে সরে আসতে বাধ্য হয়। ততক্ষণে তাদের মধ্যে অন্তত ৭০ জন নিহত এবং শ'খানেক আহত হয়ে ক্যাম্পের মধ্যেই ধরা পড়েছে।

তাদের রসদ গিয়েছিল প্রায় ফুরিয়ে, তাদের মনোবল ঠেকেছিল একেবারে তলায় এসে। সাহায্যের আবেদন করে ঘনঘন এস-ও-এস গিয়েছিল যশোরে। কিন্তু কোনো সাহায্য এসে পৌঁছতে পারেনি।

যশোর-ঝিনাইদহ রোডের ওপর বাংলাদেশের মুক্তি বাহিনী প্রতিরোধের একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যূহ গড়ে তুলেছিল। আজ পর্যন্ত হানাদারদের সামর্থ হয়নি সেই ব্যূহ ভেদ করে কুষ্টিয়ার সাহায্যে এগিয়ে আসার।

তার পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত।

তিরিশে মার্চ সারদিন ওরা তাদের নতুন অবস্থানগুলিতে অবরুদ্ধ হয়েছিল। গুলি করার সাহসটুকু পর্যন্ত তাদের হয়নি। খুব কম করেও কুড়ি হাজার মানুষ তাদের চূড়ান্তভাবে ঘিরে রেখেছিল প্রতিটি মুহূর্ত। সঙ্গের খাবার ফুরিয়ে গিয়েছিল অনেকেরই, কিন্তু অভুক্ত থাকতে হয়নি কাউকেই। এই হাজার হাজার মুক্তি সংগ্রামীর মুখের খাবার জোগাবার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে ছিল এক বিরাট মহিলা ব্রিগেড যারা নেপথ্যে ঘড়ির কাঁটাকে অনুসরণ করে কাজ করে যাচ্ছিল।

একত্রিশে মার্চ ভোর ৪টা বেজে ২৫ মিনিটের সময় মুক্তি বাহিনী কুষ্টিয়ায় তাদের দ্বিতীয় দফার আক্রমণ সুরু করে। সেই আক্রমণেই তাদের প্রতিরোধের শেষ চিহ্নটুকু নিঃশেষে মুছে গেল। মারা গেল

অন্তত আরো ষাটজন। বাকি যারা তাদের অনেকেই আত্মসমর্পণ করে।

অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দিয়ে কয়েকজন পালিয়ে গিয়েছিল কোনোরকমে। যশোরের দিকে। গ্রামবাসীরা তাদের প্রতিটি লোককে ধরে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে।

সেদিন সকালে ১১টা নাগাদ একটি পাকিস্তানী বিমান এসেছিল কুষ্টিয়ায় বোমা ফেলতে। সাকুল্যে পাঁচটা বোমা ফেলেছিল ওরা। তার মধ্যে একটা পড়ে হাসপাতালের বাড়িতে, একটা জেলা স্কুলের ছাদে। বাকি তিনটি ফাটেই নি।

কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গিয়েছে।"

এমনি ধরণের প্রতিরোধ সংগ্রামের কাহিনী মানুষের মুখে মুখে চলে এসেছে সীমান্তের এপারে এবং এখান থেকে তা গেছে বাইরের দুনিয়ায়। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই গড়ে উঠেছিল এই ফৌজ। বাংলাদেশের মানুষ এই যুদ্ধ কোনো দিন করেনি, কোনোদিন দেখেনি এমন যুদ্ধ। তবু বীরত্বপূর্ণ 'পার্টিজান ওয়ার' তারা সুরু করেছে দখলদার পাঠানদের বিরুদ্ধে। বাংলার মেয়েরা কাঁধে তুলে নিয়েছে বন্দুক বীরাঙ্গনার মতো। রোশেনারার মতো মেয়েরা আত্মঘাতী হয়েও ঢাকার বুকে হানাদারদের ট্যাঙ্ক ধ্বংস করেছেন। এই মৃত্যুঞ্জয়ী স্পর্ধা কোথা থেকে পেল পূর্ব বাংলার মেয়েরা ?

তরুণ ছাত্ররাই হল এই মুক্তি সংগ্রামের অগ্রণী। আওয়ামি লীগের অভূতপূর্ব নির্বাচনী বিজয়ের উৎসও ছিল তরুণ সমাজ। তারাই মধ্যবিত্ত-প্রভাবিত এই রাজনৈতিক দলটিকে নিয়ে গেছে সংগ্রামের দিকে।

তরুণরা জানে, সংগ্রাম ছাড়া বাংলার মুক্তির কোনো পথ নেই। ইয়াহিয়া খান এবং তার অনুচররা পূর্ববাংলায় তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই এমন মরিয়া হয়ে আক্রমণ সুরু করেছে। বাংলাদেশ বা বাঙালীর

স্বার্থ কোনোদিনই তাদের কাছে বিবেচ্য নয়। পাকিস্তানের পতাকার অপমান বা পাঞ্জাবি সৈন্যদের ঠাট্টা বিদ্রুপের অপরাধে লক্ষ লক্ষ বাঙালীর প্রাণ নিতেও কুণ্ঠিত হলেন না ইয়াহিয়া খান। অথচ 'বাংলার ন্যায্য দাবি—স্বায়ত্তশাসন স্বীকৃতিতে তাদের প্রবল বিরোধিতা।

কেন এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম? এর একমাত্র উত্তর—স্বাধীনতা।

ইংলণ্ডের গার্ডিয়ান পত্রিকা ১৪ এপ্রিল' ৭০ এক সম্পাদকীয়তে এই কথাটি স্পষ্ট করে লিখল, "বাংলাদেশের বিষয় দ্বিতীয় বিয়াফ্রা কিংবা দিল্লী ও রাওয়ালপিণ্ডির মধ্যে অন্তহীন মন কষাকষির ফল নয়। এই ঘটনার উদ্ভব হল তখনি যখন সুষ্ঠুভাবে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে অনুষ্ঠিত একটি নির্বাচনের ফল সেনাবাহিনী বরদাস্ত করতে পারল না। শেখ মুজিব নিজে নিশ্চিতই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি। যে কর্মসূচীর ভিত্তিতে বৈধভাবে নির্বাচন লড়ে তিনি জয়ী হয়েছিলেন তার চেয়ে বেশি তিনি কিছু চাননি। প্রভাবশালী ও বুদ্ধিমান পশ্চিম পাকিস্তানীরা ইচ্ছা করলে আগামীকালই এই হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে পারেন যদি তারা জমাখরচের হিসাব করে সৈন্যদের অর্থনৈতিক শিকলে আবদ্ধ করেন।

এটা চীন সোভিয়েটের মার্ক্সীয় তত্ত্বের চুলচেরা লড়াই নয়। এর মূলে আছে স্বাধীনতা, নৈতিকতা এবং মানবতার সরল প্রশ্ন।"

॥ ১৩ ॥

Freedom in the recognition of Necessity.

Engels.

পূর্ববাংলার এই অভ্যুত্থানের জন্য পৃথিবীর মানুষ প্রস্তুত ছিলনা। বাংলাদেশে কী ঘটছে তা নিয়ে পাশ্চাত্য দুনিয়ার মানুষের খুব একটা মাথা ঘামাবার কথা নয়। তারা জানত, এটা হল পাকিস্তানেরই অংশ। ক্ষমতার জন্য সেখানকার মধ্যবিত্ত শ্রেণী হয়তো বা একটু চাঞ্চল্য দেখাচ্ছে।

স্তম্ভিত হয়ে গেল পৃথিবী যখন বাংলাদেশে ঘোষণা করল নিজেকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম জনগণতন্ত্রী রাষ্ট্র। বাংলার মানুষের বন্ধুরা আনন্দিত হলেন। অন্যরা হলেন শঙ্কিত। একটি স্বাধীন জাতির জন্ম হল রক্তস্নানের মধ্য দিয়ে। ১২ এপ্রিল, ১৯৪০ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষিত হল ৬ জন সদস্য বিশিষ্ট যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভার নাম।

প্রেসিডেন্ট : শেখ মুজিবর রহমান
ভাইস প্রেসিডেন্ট : সৈয়দ নজরুল ইসলাম
প্রধানমন্ত্রী : তাজউদ্দিন আহমেদ
অন্যান্যমন্ত্রী : খোন্দকার মুস্তাফ আহমেদ
ক্যাপ্টেন মনসুর আলি
এ, এইচ, কামারুজ্জমান

৩রা বৈশাখ ১৮ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে মন্ত্রিসভা প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করল। এই সরকার কোনো নির্বাসিত সরকার নয়। বাংলাদেশের তিন চতুর্থাংশ অঞ্চলে মুক্তিফৌজের অধিকার। মুক্ত অঞ্চলেই গঠিত হল স্বাধীন বাংলাদেশের মন্ত্রিসভা। মন্ত্রিসভা গঠিত হবার পর স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চলগুলো নিজের চোখে দেখে যাবার জন্য পৃথিবীর সাংবাদিক, কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের আমন্ত্রণ জানান।

মন্ত্রিসভা সাতদফা কার্যসূচীর পরিকল্পনা অনুমোদন করে। এই কার্যসূচী হল ঃ

(১) মুক্তাঞ্চলগুলোকে শত্রুর আক্রমণ থেকে মুক্ত রাখা।

(২) মুক্ত অঞ্চলে অসামরিক শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ; শিল্প ও কৃষি উন্নয়ন কর্মে সহায়তা।

(৩) স্বাভাবিক জীবনযাত্রা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সহায়তা। স্কুল, অফিস, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি খোলার ব্যবস্থা করা।

(৪) দখলদার বাহিনীর অধিকৃত এলাকায় যুদ্ধাভিযান পরিচালনা।

(৫) মিত্রভাবাপন্ন প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্য সুরু করা।

(৬) স্বর্ণমানের অভাবে কোনো প্রকার বিনিময় ব্যবস্থায় অবাধ বাণিজ্য চালানো হবে। তবে এই বাণিজ্য সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে যাতে জনসাধারণ উপযুক্তভাবে জিনিষপত্র পায়।

(৭) বিনিময় ব্যবস্থা প্রচলনের জন্য প্রতিবেশী বন্ধুভাবাপন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনার সূত্রপাত।

স্বাধীন বাংলা সরকার যুদ্ধপরিচালনার জন্য সৈনাধ্যক্ষদের নামও ঘোষণা করে। প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয় কর্ণেল এম, ওসমানির ওপর।

বাংলাদেশ সরকার প্রথমেই যা বিশ্ববাসীর কাছে দাবি করেছে

তা হল এই গণতান্ত্রিক সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি। সাধারণ নির্বাচনে প্রশ্নাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, সমস্ত মানুষ মুজিবর ও তাঁর দলের প্রার্থীদের সমর্থন করে। সুতরাং, এ দাবি তাঁরা নিশ্চয়ই করতে পারেন যে, বাংলাদেশের প্রকৃত প্রতিনিধি তাঁরাই, ইয়হিয়া খান নন।

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অবশ্য সব সময় তাড়াতাড়ি আসে না। পাকিস্তানের মিত্র পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলোর মনোভাবের ওপর এই স্বীকৃতি অনেকাংশে নির্ভর করছে। আমেরিকা ও বৃটেন পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠ মিত্র। চীনের সঙ্গেও পাকিস্তানের মিত্রতা আছে। সোভিয়েট ইউনিয়নও পাকিস্তানের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্কে আগ্রহী।

পূর্ববাংলায় গণহত্যার প্রতিক্রিয়ায় ভারতের পার্লামেণ্টই সর্বপ্রথম নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করে ৩১ মার্চ '৭০। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী লোকসভায় ও রাজ্যসভায় প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন ; সর্বসম্মতিতে গৃহীত হয় প্রস্তাব। প্রস্তাব উত্থাপন করে প্রধানমন্ত্রী সেদিন বলেছিলেন, 'পূর্ববাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের এই ঐতিহাসিক অভ্যুত্থানের 'জয় হবেই।'

তিনি বলেন, পূর্ববাংলার জনগণের নির্বাচনের জয়ের পরেই আমাদের বীর প্রতিবেশীদের যে মর্মান্তিক দুঃসময় এসেছে তা তাদের দুঃখ-দুর্দশার সঙ্গে আমাদেরও একাত্ম করেছে।

প্রস্তাবে বলা হয় : পূর্ববঙ্গের সমগ্র জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে দমনের জন্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আমদানি করা সশস্ত্র বাহিনীকে সেখানে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনের মাধ্যমে সেখানকার জনগণ নিভুলভাবে যে বাসনা ব্যক্ত করেছেন, পাকিস্তান সরকার তা মেনে না নিয়ে জনগণের সেই রায়কে অমান্য করার নীতি বেছে নিয়েছেন।

পাকিস্তান সরকার আইনসম্মতভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে শুধু অস্বীকারই করেনি, জাতীয় পরিষদকে

তাদের ন্যায্য ও সার্বভৌম ভূমিকা নিতে একতরফাভাবে বাধাও দিয়েছেন। বন্দুক, কামান, ট্যাংক, বিমান ও গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্যে নগ্ন বলপ্রয়োগের মাধমে পূর্ববঙ্গের মানুষের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে।

ভারত সরকার ও ভারতের জনগণ সব সময়েই পাকিস্তানের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ, স্বাভাবিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করে এসেছে, একই উপমহাদেশের অধিবাসী হিসাবে ভারতের সঙ্গে ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যের দিক দিয়ে তাদের বন্ধন যুগ যুগ পুরাতন। এই অবস্থায় আমাদের সীমান্তের এত কাছে যে মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড চলছে তাতে সভা উদাসীন থাকতে পারে না। নির্দোষ নিরীহ মানুষের উপর এই যে অভূতপূর্ব ভয়াবহ অত্যাচার চলছে, আমাদের দেশের সব অঞ্চলের মানুষ সুস্পষ্ট ও দ্বিধাহীন ভাষায় তার নিন্দা করছে।

এই সভা পূর্ববাংলার জনগণের প্রতি সহানুভূতি এবং তাদের গণতান্ত্রিক জীবনযাত্রার জন্য সংগ্রামের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করছে। এই সভা পৃথিবীর সকল দেশের মানুষ ও তাদের সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছে, পূর্ববাংলায় পাকিস্তান সরকার কর্তৃক সুপরিকল্পিত লোকক্ষয় যা গণহত্যারই সামিল তা বন্ধ করার জন্য জরুরী ও গঠনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে।

এই সভা এই সুদৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত করছে যে, পূর্ববাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ঐতিহাসিক অভ্যুত্থানের জয় হবেই।"

৪ এপ্রিল-সোভিয়েট প্রেসিডেণ্ট নিকোলাই পোডগর্ণি একটি শিষ্ট অথচ সুস্পষ্টভাষায় রচিত পত্রে পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া খানকে জানান, পূর্ববাংলায় যে বিপুল লোকক্ষয় হচ্ছে তার প্রতি মানবিক কারণেই সোভিয়েট ইউনিয়ন উদাসীন থাকতে পারে না। তিনি অবিলম্বে এই হত্যা বন্ধের ব্যবস্থা করার জন্য ইয়াহিয়া খানকে অনুরোধ করেন।

তিনি আরও বলেন যে, শেখ মুজিবর এবং আওয়ামি লীগের নেতাদের নিরাপত্তার প্রতি পাকিস্তান সরকার দৃষ্টি রাখবেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন তা আশা করে।

পাকিস্তান সরকার এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। সোভিয়েট ইউনিয়নকে তাঁরা জবাব দেন, পূর্ববাংলায় যা ঘটছে তা হল পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। এ বিষয়ে কিছু বলা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ।

কিন্তু বিশ্বের জনমত এতে স্তব্ধ হয়ে থাকেনি।

মার্কিন সেনেটের এডোয়ার্ড কেনেডি ২ এপ্রিল তারিখে মার্কিন সেনেটে প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর তুললেন।

কেনেডি পরিবারের সন্তান এডোযার্ড বিশ্বের রাজনৈতিক মহলে সুপরিচিত। তিনি দাবি জানালেন, বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবীদের হত্যার বিরুদ্ধে মার্কিন সরকার ধিক্কার দিক এবং এই হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে সমস্ত ক্ষমতা ব্যবহার করুক।

তিনি বললেন, এ বিষয়ে আমেরিকান হিসাবে আমাদের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। কারণ আমাদের সমর সম্ভার, বন্দুক, কামান, বিমান দিয়েই বাংলাদেশের জনগণের এই দুর্দশা সৃষ্টি করা হচ্ছে। আমাদের সঙ্গে এই অস্ত্রব্যবহারের যে-চুক্তি ছিল এ কাজ তার সম্পূর্ণ বিরোধী।

আন্তর্জাতিক রেডক্রস সোসাইটি আহতদের ও দুর্গতদের সেবার জন্য যেতে চেয়েছিল ঢাকায়। তাদের যাবার অনুমতি দেওয়া হয়নি। পূর্ববাংলার হত্যাকাণ্ড পৃথিবীর সভ্যমানুষ যাতে না জানতে পারে তার জন্যই এই কঠোরতা। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের আর্তচিৎকার গিয়ে পৌঁছেছিল পৃথিবীর মানুষের কাছে। নিরস্ত্র, অসামরিক জনসাধারণের ওপর এই আক্রমণ বিচলিত করল পৃথিবীর বিবেক।

কপটতা দেখাল বৃটেন। তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সার এলেক ডগলাস হিউম অনেক ভাবনা চিন্তার পর কমনসে এক বিবৃতি দিয়ে বললেন, পূর্ব বাংলায় যা ঘটছে সে ব্যাপারে পাকিস্তান সরকার যদি আমাদের

অনুরোধ করেন তাহলে আমরা মানবিক কারণে সেখানকার মানুষের দুঃখ লাঘবের জন্য আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করব।

সবাই জানেন যে, পাকিস্তান সরকার বিদেশের কাছে যদি অনুরোধ করে তবে সে অনুরোধ যাবে আরও ট্যাঙ্ক। আরও অস্ত্র এবং আরও বিমানের জন্য। বিয়াফ্রাতে যখন আন্দোলন হয়ে ছিল (সেটা ছিল সংখ্যাগুরু নাইজেরিয়া থেকে সংখ্যালঘু একটি অংশের বিচ্ছিন্নতার দাবি) তখনও ইয়োরোপীয় শক্তিগুলো মানুষের দুর্দশায় নিজেদের খেলাই খেলেছিল।

পূর্ববাংলাকে কি তারা দ্বিতীয় বিয়াফ্রা করতে চায়? পাকিস্তানীদের ষড়যন্ত্র হল তাই। কিন্তু পূর্ববাংলা বিয়াফ্রা নয়। পুর্ব বাংলাকে দমন করতে পাকিস্তানকে হাজার মাইলেরও বেশি দূরত্ব থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্য জোগান দিতে হয়। পূর্ববাংলার অধিবাসীরা হল সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং একটি সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে তারা প্রমাণ দিয়েছেন যে তাদের দাবি মুষ্টিমেয় ক্ষমতাকাঙ্ক্ষী রাজনীতিকের মুখের কথা নয়। এ দাবির পিছনে আছে গোটা দেশ।

বাংলাদেশের স্বাধীন সরকারের মন্ত্রিসভা মুজিবনগরে (কুষ্টিয়া জেলার বৈদ্যনাথতলা) যে দিন আত্মপ্রকাশ করেন সেদিনই অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম দশহাজার মানুষের সমাবেশে আত্মপ্রত্যয়ী সংকল্প ঘোষণা করেন, পলাশীর আম্রকাননের যুদ্ধে ১৭৫৭ সালে বাংলাদেশ তার স্বাধীনতা হারিয়েছিল। আজ সেই প্রাচীন জেলারই আর এক আম্রকাননের নিচে ১৯৫৭ সালে সেই স্বাধীনতা ফিরে পেল জন্ম নিল স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র।

এই দিনই জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রকাশ হয়। ঘোষণাপত্রটি পাঠ করেন জাতীয় পরিষদে আওয়ামি লীগের অন্যতম হুইপ ইউসুফ আলি। ১০ এপ্রিল ৭১ এই ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। ১৯৫৭ সালের ২৬ মার্চ থেকেই এটি কার্যকর বলে গণ্য হবে। এই ঘোষণাপত্র একটি জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার দলিল। কে ভেবেছিল

যে, ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে ক্ষমতা হস্তান্তর হয়েছিল তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনসমষ্টিকে এমন মরণপণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে। ইতিহাসের গতিপথ জটিল। বাংলার মানুষের শপথ ছিল ইতিহাসের গতিপথ পরিবর্তন করা। বহুমানুষের আত্মত্যাগের বিনিময়ে সেই সংকল্প তারা পূর্ণ করেছেন।

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি নিম্নরূপ ঃ

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

"যেহেতু ১৯৫৭ সনের ৭ ডিসেম্বর হইতে ১৯৫৯ সনের ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলা দেশে অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হইয়াছিল এবং যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলা দেশের জনগণ ১৬৯ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ দলীয় ১৬৭ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত করিয়াছিলেন। এবং যেহেতু জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৫৯ সনের ৩ মারচ তারিখে শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিবেশন আহ্বান করেন এবং যেহেতু আহুত এই পরিষদ স্বেচ্ছাচার এবং বেআইনী-ভাবে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন এবং যেহেতু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ তাহাদের প্রতিশ্রুতি পালন করিবার পরিবর্তে বাংলা দেশের গণপ্রতিনিধিদের সহিত পারস্পরিক আলোচনা চলাকালে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ হঠাৎ ন্যায়নীতি বর্হিভূত এবং বিশ্বাসঘাতকতা মূলক যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং যেহেতু উল্লিখিত বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজের জন্যে উদ্ভুত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসম্বাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৫৯ সালের ২৬ মারচ ঢাকায় যথাযথ ভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন

এবং বাংলাদেশের অখণ্ডতা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য বাংলা দেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান এবং যেহেতু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছে এবং এখনও বাংলা দেশের বেসামরিক ও নিরস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধে নজীরবিহীন গণহত্যা ও নির্যাতন চালাইতেছে এবং যেহেতু পাকিস্তান সরকার অন্যায় যুদ্ধ ও গণহত্যা ও নানাবিধ নৃশংস অত্যাচার পরিচালনা দ্বারা বাংলা দেশের গণপ্রতিনিধিদের একত্রিত হইয়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিয়া জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। এবং যেহেতু বাংলা দেশের জনগণ তাহাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলা দেশের উপর তাহাদের কার্যকরী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বাংলা দেশের জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতি যে ম্যাণ্ডেট দিয়াছেন সেই ম্যাণ্ডেট মোতাবেক আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আমাদের সমবায়ে গণপরিষদ গঠন করিয়া পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বাংলা দেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য সেইহেতু আমরা বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণ প্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি এবং উহার দ্বারা পূর্বাহ্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা অনুমোদন করিতেছি।

এতদ্বারা আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

রাষ্ট্রপ্রধান প্রজাতন্ত্রের সশস্ত্র বাহিনী সমূহের সর্বাধিনায়ক পদেও অধিষ্ঠিত থাকিবেন। রাষ্ট্র প্রধানই সর্বপ্রকার প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অধিকারী।

রাষ্ট্রপ্রধানের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়োগের ক্ষমতা

থাকিবে। তাঁহার কর ধার্য ও অর্থব্যয়ের ক্ষমতা থাকিবে, তাঁহার গণপরিষদের অধিবেশন আহ্বান ও উহার অধিবেশন মুলতুবী ঘোষণার ক্ষমতা থাকিবে। উহা ছাড়া বাংলাদেশের জনসাধারণের জন্য আইনানুগ ও নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল ক্ষমতারও তিনি অধিকারী হইবেন। বাংলা দেশের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে কোন কারণে রাষ্ট্রপ্রধান না থাকেন অথবা রাষ্ট্রপ্রধান যদি কাজে যোগদান করিতে না পারেন অথবা তাহার কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে যদি অক্ষম হন তাহা হইলে রাষ্ট্র প্রধানকে প্রদত্ত সকল ক্ষমতা ও দায়িত্ব উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পালন করিবেন।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে বিশ্বের একটি জাতি হিসাবে এবং জাতি সংঘের সনদ মোতাবেক আমাদের উপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তাইয়াছে উহা যথাযথভাবে আমরা পালন করিব।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে আমাদের এই স্বাধীনতার ঘোষণা ১৯৫৯ সনের ২৬ মারচ হইতে কার্যকরী বলিয়া গণ্য হইবে।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে আমাদের এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য আমরা অধ্যপক এস ইউসুফ আলিকে যথাযথভাবে রাষ্ট্রপ্রধান ও উপ-রাষ্ট্রপ্রধানের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য দায়িত্ব অর্পণ ও নিযুক্ত করিলাম।”

একটি স্বাধীন জাতির ঘোষণাপত্রের মর্যাদা রক্ষায় বাংলাদেশের মুক্তি যোদ্ধারা সংকল্প নিয়েছেন। অস্ত্রবলে পাকিস্তানীরা অনেক বেশি শক্তিশালী। ভিয়েতনামে আমেরিকানরা তাই ছিল। ভিয়েতনাম যখন প্রথম যুদ্ধ সুরু করে তখন তাদের হাতে কোনো অস্ত্রই ছিল না। তাদের পক্ষে ছিল জনগণ এবং মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জনের দুর্জয় সংকল্প। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে জাপানীদের বিরুদ্ধে

ভিয়েতনামীরা প্রথম সংগ্রাম সুরু করে চল্লিশের দশকে। সত্তরের দশকেও সেই লড়াই চলছে।

বাংলাদেশের সংগ্রামও যে সে রকম হবে না তা নিশ্চয়তা কি? স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর প্রধান কর্ণেল এম, ওসমানি বলেছিলেন, হয় তো বর্তমান জেনারেশন এই মুক্তিযুদ্ধে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু পরবর্তী জেনারেশন স্বাধীন নাগরিকের মতো বাঁচতে পারবে।

গেরিলাযুদ্ধের জন্যই প্রস্তুত হয়ে আছে বাংলাদেশ। পাকিস্তানীরা অবশ্য কতদিন এইভাবে হাজার মাইল দূর থেকে অস্ত্রশস্ত্র সৈন্য ও রসদ সরবরাহ করে দখলদারী যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবে তা আলোচনা সাপেক্ষ। কারণ, তাঁর সমস্ত সামরিক শক্তিই বিদেশীদের সাহায্যপুষ্ট। সেই সাহায্য বন্ধ হলেই পাকিস্তানীদের সমর বিক্রমের আয়ু শেষ।

অন্যদিকে মুক্তি বাহিনীর শক্তি ও সম্পদ বাংলাদেশ থেকেই আহৃত। একজন পাকিস্তানী সৈন্যের পেছনে যত খরচ একজন মুক্তি বাহিনীর সৈনিকের জন্য স্বাধীন বাংলা সরকারের ব্যয় তার চেয়ে অনেক কম। শত্রুরা সব সময় শঙ্কিতভাবে চলাফেরা করবে। কারণ, জনগণ তার বিপক্ষে। অথচ একজন মুক্তিফৌজ তাঁর নিজের দেশে চলবে নির্ভয়ে। জলের ভেতরে যেমন মাছ, জনগণের মধ্যেও গেরিলার অবস্থান তেমনি স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল।

হয়তো এমন হবে ক্যান্টনমেণ্ট বেষ্টিত শহরগুলো পাকিস্তানী বাহিনীর দখলে থাকবে। মুক্ত অঞ্চলে তারা আক্রমণ চালাবে নিয়মিত। কিন্তু বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল যেখানে অধিকাংশ বাঙালীর বাস সেখানে—এই বাহিনীর প্রবেশাধিকার থাকবে না। জনসাধারণ বুঝে গেছে যে, বিদ্রোহ করা সম্ভব এবং যুদ্ধ করাও সম্ভব। এই প্রাথমিক ভীতি কেটে যাবার পরই সুরু হবে সত্যিকারের যুদ্ধ। বিভিন্ন রনাঙ্গনে প্রথম দিকে যে স্বতঃস্ফূর্ত এবং প্রায় নেতৃহীন সংগ্রাম হয়েছে তা ধীরে ধীরে সংহত হবে এবং একটি ঐক্যবদ্ধ কমাণ্ডের

আওতায় আসবে। প্রথম দিকে যে অস্ত্রের অভাব ছিল তাও কেটে যাবে যুদ্ধের স্থায়িত্ব বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে। জনসাধারণও তখন অস্ত্র-সংগ্রহের সূত্র ও কৌশল আবিস্কার করতে সক্ষম হবে যেমন হয়েছে ভিয়েতনামের মানুষ।

আত্মরক্ষার যুদ্ধ কাউকে শিখিয়ে দিতে হয় না। মানুষ তা আবিষ্কার করে প্রয়োজনের মুহূর্তে। বাংলাদেশের মানুষও তা নিশ্চিতই আবিষ্কার করবে।

॥ ১৪ ॥

Now is our last fight and we Bengalis are resolute to achieve the goal.

The People, Dacca.

এ হল একটি প্রজন্মের লড়াই।

পাকিস্তান হবার পর যারা জন্মেছে কিংবা তার সমসাময়িক কালে তারা দেখল নিজেদের রাষ্ট্রব্যবস্থার শোষকরূপ। পুরনো প্রজন্মের মানুষ দীর্ঘকাল এক ঘৃণা ও সংশয়ের রাজনীতির শিকার হয়ে ভাবতে শিখেছিল, হয়তো বা দুই জাতির জন্মগত বিরোধই সব সমস্যার মূলে।

দেখা গেল, বিরোধের কারণ আরও গভীরে।

বাংলাদেশের বর্তমান মুক্তিযুদ্ধের কারণ অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক দমন। এই অভ্যুত্থান সামগ্রিক এবং সর্বাত্মক। গুপ্তচর বা বিশ্বাসঘাতক যা সামান্য কিছু আছে তা সব যুদ্ধেই থাকে। এদের বিরুদ্ধে সতর্কতা প্রয়োজন।

পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে অনেক রাজনৈতিক দল ছিল সক্রিয়। নির্বাচনের সময়ে অনেক দলই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। কিন্তু অতি বামপন্থী দলগুলো শেষ পর্যন্ত নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ায়।

জাতীয় গণমুক্তির সংগ্রামে সকল গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাকামী দল একসঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করবে, এটা নিশ্চয়ই আশা করা যায়।

ন্যাশনাল আওয়ামি পার্টির নেতা মৌলনা ভাসানীর দল পূর্ববাংলায়

একটি বৃহৎ ও শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে কাজ করেছিল। মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর ভাসানী ও তাঁর দল আত্মগোপন করে। গেরিলাযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির নির্দেশও তিনি দিয়েছিলেন তাঁর দলের কর্মীদের।

পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু আত্মগোপনকারী দল হিসেবে তারা জনসংগঠনের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছিল। সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেসে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন বলে মস্কো থেকে জানান হয়েছিল। সেই প্রতিনিধির মারফৎ সংবাদ পেয়েই সম্ভবত সোভিয়েট প্রেসিডেন্ট পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের কাছে কড়াভাষায় একটি চিঠি দিয়ে পূর্ব বাংলায় গণহত্যা বন্ধের আবেদন জানিয়েছিলেন।

পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মস্কোপন্থী।

মৌলানাভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামি পার্টিকে পিকিং-পন্থী বলা হত। কিন্তু মার্কসবাদী লেনিনবাদী মহম্মদ তোহা শেষ পর্যন্ত ন্যাশনাল আওয়ামি পার্টি থেকে বেরিয়ে গিয়ে পৃথক দল গঠন করেছেন বলে জানা যায়।

অধ্যাপক মুজাফ্ফর আহমেদ হলেন মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির নেতা।

সাধারণ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা হবে কিনা এই প্রশ্নেই ন্যাশনাল আওয়ামি পার্টিতে ভাঙন দেখা দিয়েছিল। মস্কোপন্থীরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পশ্চিম পাকিস্তানে চারটি আসন পায়। পশ্চিম পাকিস্তানে মস্কোপন্থীদের সহায়ক ন্যাশনাল আওয়ামি পার্টির নেতা খান ওয়ালি খান। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের আইনসভায় তাঁর দল সংখ্যাগরিষ্ঠ।

মৌলানা ভাসানী নির্বাচনের আগেই স্বাধীন পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার ডাক দিয়েছিলেন।

এই বিভিন্ন দলে বিভক্ত বামপন্থী শক্তিকে তখন ঐক্যবদ্ধভাবে মুক্তিযুদ্ধে কাজ করতে হবে। মৌলানা ভাসানী ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে, তিনি মুক্তি সংগ্রামে শেখ মুজিবের পক্ষে। একটি সংবাদে জানা গিয়েছিল যে বৃদ্ধ মৌলানা সীমান্ত অতিক্রম করে আসামে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মঈনুল হক চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বাংলার জনগণের এই দুর্দশায় মর্মাহত বৃদ্ধ মৌলনা হক চৌধুরীকে অনুরোধ করেন, বাংলা দেশের জন্য ভারতবর্ষের সাহায্য যাতে আসে সে কথা দিল্লিতে পৌঁছে দিতে।

একমাত্র বকেয়া মুসলিম লীগ, সাম্প্রদায়িকতাবাদী নিজামে ইসলামী প্রভৃতি কয়েকটি দল ছাড়া অন্যান্য সকল দলই এই স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশীদার। যদিও পাকিস্তান সরকার বরাবর প্রচার করছে যে, এ হল মুষ্টিমেয় দুষ্কৃতকারীর কাজ। ১৯ এপ্রিল ঢাকা বেতার থেকে প্রচারিত এক ভাষণে বাংলাদেশে হানাদার বাহিনীর প্রতিনিধি সামরিক শাসক স্বীকার করেন যে, পাকিস্তানী বাহিনী নিরস্ত্র অসামরিক লোকদের ওপর অত্যাচার করেছে এবং পাইকারীভাবে অনেক হত্যাও করেছে? তবে তার কৈফিয়ৎ হিসোব বলা হয়েছে যে, 'রাষ্ট্রদ্রোহী' ও 'সমাজ বিরোধী'দের আশ্রয় দেবার অপরাধেই নিরীহদের ওপর সৈন্যরা অত্যাচার চালায়।

এই সুযোগে পাকিস্তানী সামরিক শাসক আওয়ামি লীগের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিরও চেষ্টা করে সচতুর কৌশলে।

তিনি বললেন, আওয়ামি লীগের সকলেই পাকিস্তানের শত্রু নয়। আসলে জঙ্গী সংখ্যালঘু গোষ্ঠিই আওয়ামি লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের কণ্ঠরোধ করে রেখেছে। পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর জন্য তারাই দায়ী।' অথচ ইয়াহিয়া খান এই আওয়ামি লীগকে নিষিদ্ধ করে একে দেশের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেন।

চরম বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমেই বাংলাদেশের ওপর এই যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়। কীভাবে এই বিশ্বাসঘাতক আক্রমণ

হয় ।তার বিবরণ দিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ ।

ইয়াহিয়াই প্রস্তাব দেন যে, পাকিস্তানের তুই অংশে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মার্শাল ল তুলে নেওয়া হবে। অন্তর্বর্তীকালে ইয়াহিয়াই থাকবেন প্রেসিডেন্ট এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বও থাকবে তাঁরই হা:ত।

পাকিস্তানের তুই অংশের ন্যাশনাল এসেম্বলির সদস্যদের পৃথক সভা হবে এবং পরে সংবিধানের চূড়ান্ত খসড়া তৈরির জন্য ডাকা হবে জাতীয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশন ।

শেখ মুজিবর এই প্রস্তাবে রাজী হন। শুধু অমীমাংসিত থাকে অন্তর্বর্তীকালে বাংলাদেশের সঙ্গে কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের সম্পর্ক কী হবে। আলোচনায় এও স্থির হয় যে ক্ষমতা বণ্টন করা হবে জাতীয় পরিষদে গৃহীত সংবিধানে যতটা দেওয়া হবে তারই কাছাকাছি। কারণ সংবিধান ছয় দফার ভিত্তিতে রচিত হবে, এটা ধরে নেওয়া হয়েছিল।

অর্থনৈতিক ক্ষমতা বণ্টন বিষয়ে পরামর্শ দেবার জন্য বিশেষ বিমানে নিয়ে আনা হয়েছিল ইয়াহিয়ার অর্থনৈতিক উপদেষ্টা এম, এম, আহমেদকে। আহমেদ সাহেব আওয়ামি লীগের নেতাদের সঙ্গে আলোচনার স্পষ্টভাষায় একথা জানান যে, রাজনৈতিক মীমাংসা হয়েগেলে ছয় দফার ভিত্তিতে,অন্তর্বর্তীকালে অর্থনৈতিক ক্ষমতা বণ্টনে কোনো বড় রকমের সমস্যা দেখা দেবে না।

কোনো স্তরেই আলোচনা ভাঙেনি। জাতীয় পরিষদে যোগ দিতে কোনো সময়েই আওয়ামি লীগ আপত্তি করেনি। কারণ, তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। পরিষদে যোগ দিলে তাদের কোনো ভয়ের কারণ নেই।

ভয় যাদের ছিল তারাই শেষ মুহূর্তে সরে দাঁড়াল।

আকস্মিকভাবে আলোচনা ভেঙে দিয়ে ইয়াহিয়া চলে গেলেন। বাংলাদেশে সুরু হল মধ্যযুগীয় বর্বর আক্রমণ।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এবং তার এই বক্তব্য সমর্থন করেছেন পশ্চিম পাকিস্তানের কাউন্সিল মুসলিম লীগের সভাপতি মিঞা মমতাজ দৌলতানা। করাচীর 'ডন' পত্রিকায় প্রকাশিত বিবৃতিতে তিনি বলেন, পাকিস্তানের দুই অংশের জন্য আলাদা আলাদা জাতীয় পরিষদের প্রস্তাবটি আলোচনাকালে ইয়াহিয়া খানই প্রথম তোলেন শেখ মুজিবরের কাছে।

অথচ ইয়াহিয়া তাঁর আক্রমণ আরম্ভের কারণ হিসেবে বিশ্ববাসীকে জানান যে, শেখ মুজিবর রহমানই এমন একটি প্রস্তাব দিয়ে পাকিস্তানকে টুকরো করে ক্ষমতা পাবার জন্য ষড়যন্ত্রমূলক টোপ দেন তাঁকে।

একথা আজ পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, পশ্চিম পাকিস্তানী স্বার্থই বাংলাদেশের মানুষকে এমন একটা ভয়াবহ যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়েছে। বাঙালীদের এতে কোনো হাত ছিলনা। কিন্তু এর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো ছাড়া তার অন্যকোনো উপায় নেই।

এই সংগ্রাম চলবে রণাঙ্গণে, চলবে কূটনীতির প্রাঙ্গণে, চলবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। যেমন ভিয়েতনামের যুদ্ধ চলছে মেকং নদীর উপকূলে এবং প্যারিসে আলোচনার টেবিলেও।

বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য এবং প্রথম কূটনৈতিক জয় হল কলকাতার পাকিস্তান ডেপুটি হাইকমিশন দখল। ১৮ এপ্রিল কলকাতার পাকিস্তানী ডেপুটি হাইকমিশনার এম, হোসেন আলি ইসলামাবাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে সরকারীভাবে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। তাঁর সঙ্গে যোগ দেন দুজন থার্ড সেক্রেটারি আনরুল করিম চৌধুরী ও কাজি নজরুল ইসলাম এবং তথ্যবিভাগের অফিসার মকসুদ আলি।

বাংলাদেশের পতাকা ওড়ে হাইকমিশন অফিসে। বিদেশে এটিই হল বাংলাদেশ সরকারের প্রথম কূটনৈতিক মিশন।

তার কিছুদিন আগে দিল্লিতে পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূতাবাসের দুজন

বাঙালী অফিসারও ইসলামাবাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করেন। কূটনৈতিক জগতে পাকিস্তান স্পষ্টই দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে। বাঙালী প্রতিনিধিদের ওপর আর ভরসা রাখতে না পেরে তাদের ইসলামাবাদে বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

এই বদলির অর্থ অত্যন্ত পরিষ্কার। বাঙালীদের জিম্মি হিসাবে রাখা। পশ্চিম পাকিস্তানে প্রায় লাখ তিনেক বাঙালীকে নিয়ে গিয়ে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল জাতীয় সংহতির পরীক্ষা হিসাবে। বাংলাদেশ আক্রান্ত হবার পর দরিদ্র বাঙালীদের ওপর দুর্বৃত্তদের হামলা সুরু হয়। তাদের অনেকে রাজস্থান সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে আত্মরক্ষার তাগিদে। সর্বত্রই চলে দলত্যাগ।

ফ্রান্স থেকে আসছিল একটি সাবমেরিণ করাচীতে। সেই সাবমেরিণের তেরোজন বাঙালী নাবিক রোমে নেমে যান। করাচী পর্যন্ত যাবার সাহস তাদের হয়নি। কারণ, বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠার পর বাঙালীরা আর নিজেদের পাকিস্তানী মনে করতে পারে না। পাকিস্তান তাদের দেশে পাঠিয়েছে এক হানাদার বাহিনী।

পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে প্রাক্তন ডেপুটি হাইকমিশনার এম, হোসেন আলি যে বিবৃতি দেন কলকাতায় তাতে এই হানাদারদের বর্বরতার চিত্র ফুটে ওঠে। বিবৃতির কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি।

জনাব আলির বিবৃতিতে বলা হয়ঃ "নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস, যে ভারতকে পাকিস্তানের শত্রু বলে গণ্য করা হয় সেই ভারতই এখন নিজ সরকার দ্বারা বিতাড়িত ও সন্ত্রস্ত হাজার হাজার পাকিস্তানীর একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়। ভারতীয়রাই তাঁদের আশ্রয়, খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করছেন।"...

"ইতিপূর্বে ঠাণ্ডামাথায় বেছে বেছে গণহত্যা চালানো হয়েছে। এখন সারা বাংলাদেশ জুড়ে এটি চলছে। সকল তথ্য ও সংবাদ থেকে

এটিই বোঝা যায় যে, পাকিস্তানী সেনাবাহিনী সারা বাংলাদেশের নিরস্ত্র ও নিরীহ জনগণের বিরুদ্ধে (বস্তুত পাকিস্তানের জনগণের অধিকাংশের বিরুদ্ধে) সর্বাত্মক যুদ্ধ চালাচ্ছে। তারা বিমান থেকে ব্যাপকভাবে বোমা বর্ষণ করছে। শহর ও গ্রামের ওপর কামান দাগছে। ট্যাঙ্ক, কামান, মর্টার এবং মেশিনগানের মতো আধুনিক লোকক্ষয়ী হাতিয়ারও তাদের ওপর প্রযুক্ত হচ্ছে। তারা আগুণে বোমা ফেলছে, এমন কি নাপাম বোমা ব্যবহারেরও খবর পাওয়া গিয়েছে। সারা পাকিস্তানের সরকার বলে নিজেদের দাবি করে যে সরকার সেই সরকারই রাতদুপুরে বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও জননেতাদের হত্যা করেছে।"

একটি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার অভিযান করেছে যে সরকার তার সঙ্গে কোনো বিবেকবান ব্যক্তিই কোনরূপ আপস করতে পারেন না। কারণ, এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, বাংলাদেশে কাউকেই রেহাই দেয়নি পাকিস্তানী সেনাবাহিনী। তাদের একমাত্র লক্ষ্য হল বাঙালী জাতির উচ্ছেদ?

এভাবে কি কোনো দেশকে দখলে রাখা যায়? ইতিহাস বলে, তা যায় না। কিন্তু পাকিস্তানী বাহিনী তো বাংলাদেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে আগ্রহী নয়। পুরোপুরি সামাজিক শোষণের অধীনে রেখে বাংলাদেশের উপর রাজনৈতিক দখল কায়েম করাই তাদের উদ্দেশ্য।

কোনো কোনো লেখক এমন অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, এই অসম যুদ্ধে বাঙালীরা জয় লাভ করতে পারবে না। ফলে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণহানি ঘটছে। সুতরাং বাঙালীদের উচিত ইসলামাবাদের কাছে নতি স্বীকার করে পরে একটা আপসের চেষ্টা করা। কেউ আবার বলছেন যে, কুড়ি বছর ধরে শোষিত হয়েছে বলেই এমনভাবে বিদ্রোহ করা উচিত হয়নি। একটা জাতির জীবনে কুড়ি বছর কিছুই নয়। শেখ মুজিবর ভুল করেছেন।

এ ধরণের মতবাদ আগেও শোনা গেছে। ভারত যখন বৃটিশের অধীন ছিল তখনও কোনোরকম সংগ্রামের কথা শুনলেই একদল লোক চীৎকার করতেন যে, এ হল অদূরদর্শী রাজনীতিকদের কাণ্ড। দেশকে সর্বনাশের দিকে নিয়ে যেতে চায়।

ভিয়েৎনামের দিকে তাকালে এই প্রশ্নের জবাব মিলবে। ভিয়েতনামীরা জাপানী দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। তখন ফরাসীরা এই আশ্বাস দিয়েছিল যে, যুদ্ধের পর তাদের স্বাধীনতার বিষয় বিবেচনা করা হবে। যুদ্ধ শেষ হল। জাপানীরা বিতাড়িত ও পর্যুদস্ত। কিন্তু দেখা গেল আবার ফরাসীরা তাদের সৈন্যসামন্ত ও তাঁবেদারদের নিয়ে ফিরে এল ভিয়েতনামে। কারণ, ইন্দোচীন হল তাদের সাম্রাজ্য। সাম্রাজ্য কি এত সহজে হাত ছাড়া করা যায়? হো চি মিন তখন বাধ্য হয়ে অস্ত্র ধরলেন। তা সত্ত্বেও তিনি সব সময়েই আলোচনার পথ খোলা রেখেছিলেন। কিন্তু ১৯৫৪ সালে দিয়েন বিয়েন ফু-র যুদ্ধে ফরাসীরা পর্যুদস্ত হবার আগে আলোচনায় রাজী হয়নি তারা।

বন্দুকের নল থেকেই উঠে আসে শান্তির জলপাইপাতা।

জেনারেল গিয়াপের আশ্চর্য বিজয় ভিয়েতনামে একটি জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ সুগম করল। জেনিভায় বসল ইন্দোচীন সম্মেলন। সেই সম্মেলনেই উত্তর ভিয়েতনাম রাষ্ট্র হিসেবে পেল স্বীকৃতি এবং স্থির হয়েছিল যে এক বৎসরের মধ্যে দক্ষিণ ভিয়েতনামে নির্বাচনের মাধ্যমে স্থির হবে যে দুই দেশ এক হবে কিনা। সেই শর্ত দক্ষিণ ভিয়েতনামের তাঁবেদার সরকার পালন করেনি বলেই চলছে এই দীর্ঘ সংগ্রাম।

পাকিস্তান সরকারও বাংলাদেশের জনগণের কাছে এবং গোটা পাকিস্তানেরই জনগণের কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন। আমরা এর আগে এ বিষয়ে আলোচনা করে দেখিয়েছি যে, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার

অজুহাত হিসাবেই এই যুদ্ধ। এর কোনো নজীর পাওয়া যায় না।

ইয়াহিয়া খান এতদূর এগিয়ে শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে গেলেন কেন? হয়তো ভবিষ্যতে এর নেপথ্য কাহিনী কোনোদিন জানা যাবে। ইয়োরোপের সংবাদপত্র সমূহে লেখা হয়েছে যে, জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে তাঁর সামরিক গুপ্তচরবিভাগ বিভ্রান্ত করেছিলেন। তাঁরা প্রেসিডেন্টকে বুঝিয়েছিলেন যে, আওয়ামী লীগের একটি উগ্রপন্থী সংখ্যালঘু অংশই শুধু স্বায়ত্তশাসন চায়। ওদের কাবু করতে বেশি সময় লাগবে না।

তাদের ধারণা ছিল যে, বাঙালীর ভাবপ্রবণতা থেকে উদ্ভূত উগ্র প্রাদেশিকতাই এই আন্দোলনের মূলে। তাতে ইন্ধন জুগিয়েছে ভারত যার সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের শত্রুতা। এই বাঙালীরা এমন দূরদৃষ্টিহীন যে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির নামে গদগদ, পশ্চিম বাংলার সঙ্গে গলাগলি করতে একটুও বাধে না। সুতরাং এদের ওপর সামরিক বাহিনীর আঘাতটা জুৎসই হলে আর তারা কথা বলবে না।

এই ধারণা থেকেই আক্রমণ, এবং আক্রমণকারীরা আশা করেছিল যে, প্রথম ক'দিনে নির্বিচারে হত্যা ও সন্ত্রাস চালাতে পারলে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

নাদির শাহ্ দিল্লী আক্রমণ করে ক্রমাগত দশদিন রক্তের নদী বইয়ে দিয়েছিলেন। ঢাকা শহরেও ২৫ শে মার্চ রাত্রি থেকে ৩০ মার্চ পর্যন্ত চলেছিল একটানা হত্যার তাণ্ডব। ইয়াহিয়া খান একবার বলেছিলেন তিনি নাকি নাদির শাহের বংশধর। তবে উপযুক্ত বংশধর তিনি হতে পারেননি। কারণ, নাদির শাহর মতো দিল্লী আক্রমণের কোনো আগ্রহ তাঁর নেই। দিল্লী নাহয় দূরে। ঢাকাতে তিনি যা দেখালেন তারপর কেউ আর অবিশ্বাস করবেন না যে, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নাদির শাহ্র বংশধর নন।

বাংলার এই জাগরণে বাংলা ভাষার ভূমিকার কথা আগে বলা হয়েছে। বাঙালী বুদ্ধিজীবী, শিল্পী ও সাহিত্যিকদেরও বিশেষ ভূমিকা রয়েছে বাংলা দেশের এই অভ্যুত্থানে।

পাকিস্তান সৃষ্টির সময় বাংলা দেশে মুসলিম লীগ নেতাদের অধিকাংশই ছিলেন নবাব জমিদার শ্রেণীর লোক। তারা নামমাত্রই বাঙালী। বাংলা ভাষার চেয়ে উর্দু ভাষার প্রতিই ছিল তাঁদের আগ্রহ। ঢাকার নবাব কিংবা সুরাওয়ার্দি পরিবার এবং সকলেই ছিলেন উর্দুভাষী। বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি ও তার ভাষা বিষয়ে তাদের কোনদিনই আগ্রহ ছিল না।

কিন্তু সাধারণ বাঙালী মুসলমান, কৃষক ও শ্রমিক বাঙালীর কাছে বাংলা ভাষা, বাঙালী জীবনযাত্রা ও আচরণের মূল্য ছিল অপরিসীম।

পূর্ব বাংলার একজন বিশিষ্ট লেখক বদরুদ্দিন উমর বাঙালীর সংস্কৃতির সংকট বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এই মূল্য সত্যটি তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন: "হিন্দু মধ্যবিত্তের সাথে মুসলমান মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংঘর্ষের প্রভাব বাংলা দেশের সাধারণ সাংস্কৃতিক জীবনে ছায়াপাত করে। এর ফলে মুসলমান মধ্যবিত্ত বাঙালী সংস্কৃতিকে হিন্দু-সংস্কৃতি বলে ধরে নিয়ে চেষ্টা করে তাকে বর্জন করতে। এবং এই প্রচেষ্টার মধ্যেই বাঙালী সংস্কৃতির সংকটের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু মধ্যবিত্তের আর্থিক এবং রাজনৈতিক জীবনের সংকট তাদের সাংস্কৃতিক জীবনে এই দুর্যোগ সৃষ্টি করলেও তার সাথে সাধারণ গ্রাম্য মুসলমানদের বিশেষ কোনো যোগাযোগ থাকেনি। গ্রাম বাংলার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বহুকাল পূর্ব থেকেই হিন্দু মুসলমানের সামাজিক ও ধর্মীয় ভাবধারার সমন্বয় তুলনায় অনেকখানি সার্থক হয়েছিল। বাংলার লোকসাহিত্যই তার অন্যতম প্রধান স্বাক্ষর।"

একথা ঠিক যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই সাম্প্রদায়িক চিন্তার

প্রসার ঘটে। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার প্রধান ধ্বজাধারীরাও আসে এই শ্রেণী থেকেই। কিন্তু বৃহৎ জনসমষ্টি, খেটে খাওয়া শ্রমিক ও কৃষক নিজেদের জীবন দিয়ে বুঝেছে যে, সাম্প্রদায়িকতা নয়, মিলন ও ঐক্যের মধ্যেই তাদের ভবিষ্যৎ। আজ প্রমাণিত হয়েছে যে, ধর্ম জাতীয়তার ভিত্তি নয়। তার ভিত্তি ভাষা, সংস্কৃতি ও ভৌগোলিক সন্নিহিতি।

মুসলিম লীগ নেতারা তবু পূর্ব বাংলাকে ধরে রেখেছিলেন কেন?

সেই একই কারণ যার তাগিদে বৃটেন ধরে রেখেছিল ভারতের উপনিবেশ এবং একই কারণ যার জন্য পর্তুগীজরা এখনও বর্বর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে অ্যাঙ্গোলায় এবং মোজাম্বিকে।

পূর্ব বাংলা হাতছাড়া হয়ে যাবার পর পশ্চিম পাকিস্তান বুঝতে পারবে তার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা কতটুকু! আমেরিকা যখনই বুঝতে পারবে যে পশ্চিম পাকিস্তানের নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ তখনি তাকে ঢালাও সমর্থন ও সাহায্যের মাত্রাও যাবে কমে। সামরিক জোটবদ্ধ থাকবার ফলে পাকিস্তান কোটি কোটি ডলার মূল্যের অস্ত্র পেয়ে নিজেকে শক্তিশালী মনে করেছে। এখন সে বুঝতে পারবে অস্ত্রের কত দাম?

একটা কৃত্রিম জাতীয়তাবাদের ধ্বজা তুলে বাংলাদেশকে পাকিস্তানীরা আলাদা করে রাখতে চেয়েছিল। বাঙালী মুসলমান তবুও হয়তো এই জাতীয়তাবাদের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিত। কিন্তু মানাতে দিল না উগ্র ধর্মান্ধতা, প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি এবং অর্থনৈতিক শোষণ।

আমরা তো ২৩ বছর পূর্ববাংলার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন। পূর্ব বাংলার মানুষের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের জায়গা এতদিন ছিল বিদেশ। লণ্ডনে বা ওয়াশিংটনে গেলে দুই বাংলার বাঙালী পরস্পরের মেলামেশার সুযোগ পেত। বাংলা বই পড়বার জন্য আগ্রহী দুই

বাংলার বাঙালী পরস্পরের কাছ থেকে বই চেয়ে নিত বিদেশে। কারণ, দুই বাংলার মধ্যে বইপত্র আদান-প্রদানের কোনো সুযোগ ছিল না। সাংস্কৃতিক যোগাযোগকে পাকিস্তানীরা ভয়ের ও সন্দেহের চোখে দেখত। ইংরেজী ভাষী আমেরিকা ও বৃটেনের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ কোনদিনই দুই দেশের স্বাধীনতা বা রাষ্ট্রিক স্বার্থের পরিপন্থী বলে গণ্য হয়েছে, একথা শোনা যায়নি। দুই বাংলার ক্ষেত্রে পাকিস্তান সরকার তাই মনে করতেন।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন চক্ষুশূল। কোন ইংরেজীভাষীকে যদি বলা হয় সেক্সপীয়র হলেন বৃটিশ সুতরাং মার্কিনী বা অস্ট্রেলিয়ান ইংরেজীভাষীদের কাছে তিনি বিদেশী এবং বর্জনীয়। তাহলে তাঁর প্রতিক্রিয়া যেমন হবে, পূর্ববাংলার বাঙালীদের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথকে সরিয়ে নেবার চক্রান্তের পরিণতিও হয়েছিল তাই।

নজরুল ইসলামকে নিয়েও পাকিস্তানী অপ-সংস্কৃতিওয়ালারা একই ধরণের অদূরদর্শিতা এবং ভ্রান্ত বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। নজরুলের অপরাধ তিনি মুসলিম হলেও হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির প্রবক্তা। পাকিস্তানের শাসকরা ঐক্যের ওপর নয় অনৈক্যের ওপরই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পাকিস্তানকে। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যদি ঐক্যই থাকবে তাহলে একই দেশে ওরা বাস করতে পারবেনা কেন? এই ধরণের প্রশ্ন যদি কেউ করে বসে কোনো অসতর্কমুহূর্তে এই ভয়ে পাকিস্তানী শাসকরা নজরুলের মানবতাবাদী কবিতাগুলোকে সন্তর্পণে জনগণের দৃষ্টির আড়ালে সরিয়ে রাখতে চাইলেন।

এমনি ভাবেই আঘাতের পর আঘাত দিলেন ওঁরা। এই কারণেই শুধুমাত্র শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নয়, সকল শ্রেণীর মানুষের মন থেকে পাকিস্তান মুছে গেছে বাংলাদেশে।

এক সময় এসেছিল যখন, বদরুদ্দীন উমরের ভাষায়, 'আমরা বাঙালী, না মুসলমান?' এই প্রশ্ন তীব্র আকারে দেখা দিয়েছিল

পূর্ববাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনে। পাকিস্তানী অপপ্রচার ও রক্তচক্ষুই সৃষ্টি করেছিল এই মানসিকতা।

বাংলাদেশের মানুষ, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এই প্রশ্নের একটিই উত্তর দিয়েছে—আমরা বাঙালী।

একে উগ্র জাতীয়তাবাদের স্ফুরণ বলে অস্পৃশ্যজ্ঞান করতে পারেন কেউ। আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাস রেখেও আমরা বলতে পারি বাংলাদেশের অভ্যুত্থান একটি স্বাধীনতাকামী জাতির সামগ্রিক অভ্যুত্থান।

এই অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব কাদের হাতে, কিংবা সেই নেতৃত্ব যথার্থভাবে এই সংগ্রামকে সার্থকতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে কিনা, এ প্রশ্ন আমরা তুলছি না।

আমরা দেখেছি প্রায় খালি হাতে একটি জাতি লড়াই করছে। একটি সশস্ত্র সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে। তাঁরা প্রাণ দিয়েয়ে কিন্তু আত্মসমর্পণ করেনি। যদি তাই হত তাহলে লক্ষ লক্ষ লোক নিহত হত না। প্রথম ক'দিনেই সেনাবাহিনী তাঁর অস্ত্রের জোরে ও ও রণনীতির প্রাধান্যে বাংলাদেশকে পদানত করতে পারত।

গণঅভ্যুত্থান ছাড়া এমন আশ্চর্য ঘটনা বাংলার মাটিতে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারতাম না।

নেতৃত্বের ত্রুটি যুদ্ধের গোড়ার দিকে আত্মপ্রকাশ করে। তাঁর একটি প্রধান কারণ, গণতান্ত্রিক গণআন্দোলনের জন্যই বাংলাদেশের মানুষকে প্রস্তুত করা হয়েছিল। সামরিক কায়দায় গেরিলাবাহিনী তৈরি করার পরিকল্পনা তাদের ছিল না। আওয়ামি লীগ অন্য যে কোন দেশের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের মতোই একটি দল। তার নেতৃত্বও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতেই। আওয়ামি লীগের কর্মসূচীতে সশস্ত্র সংগ্রামের কথা ছিল না। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা দখল এবং সংবিধানের মারফতে দেশের মানুষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনই ছিল তাদের লক্ষ্য।

ভিয়েতনামের তুলনা অবশ্য এসে যায়। ভিয়েতনামও পূর্ব বাংলার মতোই নদী নালা খাল-বিল ভর্তি একটি কৃষিপ্রধান দেশ। সেখানেও সাধারণ মানুষ হল কৃষক, গরীব ও বাঙালীদের মতোই ভাবপ্রবণ। এমন একটি জাতির ওপর যখন যুদ্ধ এসে পড়ল তখন প্রথমে নিশ্চয় নানা অসুবিধার মধ্যেই কাজ করতে হয়েছিল নেতৃবৃন্দকে দক্ষিণ ভিয়েতনামের ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট একটি গণতান্ত্রিক সর্বদলীয় প্রতিষ্ঠান। তার সভাপতি হলেন একজন অধ্যাপক। ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের অধীনে এবং তাদের নির্দেশ অনুযায়ী মুক্তি যোদ্ধারা শত্রুর সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। যারাই শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রস্তুত তাদেরই স্থান হয়েছে লিবারেশন ফ্রন্টে। জাতীয় মুক্তিফ্রন্টে সকলেরই সমান অধিকার।

একটি জাতির মুক্তিফ্রন্ট শুধু তার সেনাবাহিনী দিয়েই যুদ্ধ করে না। তার পক্ষে যুদ্ধ করে দেশের বহু মানুষ। যারা হয়তো শত্রু এলাকাতেই বসবাস করছে।

সায়গণ শহর তো মার্কিন সমর্থনপুষ্ট দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সরকারের রাজধানী। কিন্তু কে না জানে যে সায়গণ শহরেই মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থন বিপুল।

পূর্ববাংলায় ইয়াহিয়া বাহিনীর প্রাথমিক বর্বরতার ব্যর্থতার পর তারা চেষ্টা করবে বিশ্বাসঘাতকদের দিয়ে একটা অসামরিক প্রশাসন দাঁড় করাবার। দুর্বলচিত্ত, স্বার্থপর ও সুযোগসন্ধানী কিছু লোককে সবসময়েই পাওয়া যায়। কিন্তু পূর্ববাংলায় সে চেষ্টা খুব সফল হবেনা। কারণ, সদ্যসমাপ্ত নির্বাচন প্রমাণ করে দিয়েছে, কারা আসল জনপ্রতিনিধি।

আক্রমণকারীরা অন্তত ২৬ জন নির্বাচিত সদস্যকে হত্যা করেছে। আরও কিছু হয়তো বা বন্দী হয়ে আছেন তাদের হাতে।

স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠার পর বাংলাদেশের নির্বাচিত সদস্যরা

তাঁদের প্রতিই আনুগত্য জানিয়েছে। কারণ, এই সরকার বৃহত্তম জনসমষ্টির আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিভূ।

সরকারের স্বীকৃতির প্রশ্ন দিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসেবে রাষ্ট্রসংঘ বাংলাদেশের গণহত্যা বন্ধের ব্যাপারে আশ্চর্য নীরবতা দেখাবার পর বাংলাদেশ সরকারের এমন কোন আশা রাখা উচিত নয় যে, খুব তাড়াতাড়ি বিশ্বের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর স্বীকৃতি তারা পাবেন।

তবে ভারতের কথা আলাদা।

ভারত বাংলাদেশের নিকটতম প্রতিবেশী। বাংলাদেশে যুদ্ধ আরম্ভ হবার একমাসের মধ্যে প্রায় দশলক্ষ শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছে ভারতে। এদের দায়িত্ব ভারত সরকারকে গ্রহণ করতে হয়েছে।

ভারতবর্ষেই বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সম্ভাব্য স্যাংকচুয়ারি বা আশ্রয়। যেহেতু ভারতীয় পার্লামেণ্ট বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থন জানিয়েছে, সেহেতু বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা ভারতকে তাদের দুর্দিনের বন্ধু হিসেবে নিশ্চয়ই গণ্য করবে। বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেবার দাবি ভারতের জনগণের সমর্থনপুষ্ট। আমাদের ঘরের এতকাছে একই ভাষাভাষী এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন জাতির প্রতি এই অত্যাচার আমরা নীরবে সহ্য করতে পারি না। বাংলাদেশের প্রতি আমাদের দায়িত্ব সামাজিক ও নৈতিক।

বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের এখন কাজ হল, মুক্তিবাহিনীর পুনর্গঠন। শুধু মুখের কথায় একটি যুদ্ধ চলে না কিংবা শুধু মনের জোরেও নয়। তার জন্য প্রয়োজন সংগঠন, শৃংখলা, অভ্রান্ত নেতৃত্ব ও রণনিপুণতা।

আশার কথা এই যে, বাংলাদেশের এই দুঃসময়ে সমস্ত রাজনৈতিক বিরোধ বিস্মৃত হয়ে আওয়ামি লীগ ও বামপন্থী দলগুলো একসঙ্গে কাজ করছে। ন্যাশনাল আওয়ামি পার্টির নেতা

মৌলানা ভাসানি প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছেন যে, তিনি এই মুক্তিযুদ্ধে মুজিবরের পক্ষে। আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ মুক্তিফ্রন্ট গঠনই হবে বাংলাদেশে এই যুদ্ধ পরিচালনার পক্ষে সহায়ক। নিজেদের মধ্যে দুর্বলতা ত্রুটি বা পারস্পরিক অবিশ্বাস থাকলে সেই রন্ধ্রপথে ঢুকবে বিপর্যয়।

দুটি মুক্তিযুদ্ধের দৃষ্টান্ত রয়েছে চোখের সামনে—আলজিরিয়া ও ভিয়েতনাম।

দশবছর আলজিরিয়াকে যুদ্ধ করতে হয় ফরাসিদের বিরুদ্ধে। আলজিরিয়ার মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল একসঙ্গেই যোগ দিয়েছিল। রাজনৈতিক বিরোধ মূল লক্ষ্য থেকে তাদের বিচ্যুত করেনি।

ভিয়েতনাম তো স্বাধীনতা সংগ্রামের মহাকাব্য। এর কোনো তুলনা নেই। ভিয়েৎনামীদের আত্মত্যাগ যেমন অননুকরণীয় তাদের বীরত্ব, রণকৌশল এবং কষ্টসহিষ্ণুতাও তেমনি পৃথিবীর মানুষের সপ্রশংস অভিনন্দন লাভ করেছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তো তারই স্বগোত্র।

আরাম কেদারায় বসে এই যুদ্ধ চালানো যাবে না। অল্প কয়েকমাসে এই যুদ্ধের সমাধান হবে তা আশা করাও হবে ভুল। পশ্চিম পাকিস্তানীরা শেষ পর্যন্ত লড়াই করবে পূর্ব বাংলায় তাদের দখল বজায় রাখবার জন্য।

বৃহৎ শক্তিবর্গ নিস্পৃহ। আমেরিকা বা রাশিয়া নিশ্চয়ই এশিয়ার এই পূর্বপ্রান্তে একটি যুদ্ধে জড়াতে চাইবে না।

আমেরিকার সামনে সমস্যা আরও জটিল। মার্কিন সরকার পাকিস্তানকে সামরিক মিত্র মনে করে। অথচ বাংলাদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে তার পক্ষে একেবারে চুপ করে থাকাও সম্ভব হচ্ছে না। বিশেষ করে মাকিন জনমত স্পষ্টতই বাংলাদেশের পক্ষে।

নিউইয়র্ক টাইমস্ আমেরিকার অত্যন্ত প্রভাবশালী পত্রিকা।

পত্রিকাটি ২১ এপ্রিল তারিখের সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করেছে : মাকিন যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে অন্ধের মতো পূর্ব বাংলার জঙ্গী সরকারকে সমর্থন করে চলেছে তার ফলে ভারত উপমহাদেশে এদেশের স্বার্থ বিপন্ন হতে পারে।'

মার্কিন জনমত আতঙ্কিত এই কারণে যে, বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ না হলে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটা যুদ্ধ বাঁধতে পারে।

পাকিস্তান অবশ্য মরিয়া হয়ে চাইবে বাংলাদেশ থেকে বিশ্বের দৃষ্টি ফেরাবার জন্য ভারতের সঙ্গে একটি সংঘর্ষ বাঁধাতে। ভারতকে সেজন্য সতর্ক থাকতে হবে কোনো প্ররোচনাতেই যেন পাকিস্তান তাকে মুখোমুখি সংঘর্ষে টেনে আনতে না পারে। কারণ তা হলেই পাকিস্তান আত্মরক্ষার নামে বাংলাদেশে বিভ্রান্তি সৃষ্টি ও বিশ্বজনমতকে ভুল বোঝাবার সুযোগ পাবে।

কিন্তু ইতিহাসের ঋণ শোধ করতেই হবে। মাউণ্টব্যাটেনের রোয়েদাদে যে-দেশ বিভক্ত হয়ে দুটি রাষ্ট্র ও কৃত্রিম জাতির সৃষ্টি তার মূলে যে প্রকাণ্ড রাজনৈতিক চাতুরী ও বৃটিশের বিভেদপন্থার কারচুপি ছিল আজ বাংলাদেশের মুসলমান, হিন্দু ও খ্রীষ্টান নিজেদের রক্ত দিয়ে সেই অন্যায়ের প্রতিকার করছেন।

আজ ইতিহাসের পবিত্রতম পরীক্ষার দিন।

বাংলাদেশ জয়ী হবেই।

—×—

ঘটনাপঞ্জী

[২৫ মার্চ ১৯৫৯—এই দিন থেকেই সুরু হয় বাংলাদেশের ওপর আক্রমণ এবং বাঙালীর মুক্তিযুদ্ধ। প্রথম মাসের নিম্নলিখিত দিনপঞ্জী থেকে এই যুদ্ধের একটি চিত্র পাওয়া যাবে]

২৫ মার্চ :

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করতে রাজী হয়েছেন বলে ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষণা করা হয়। ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে বলা হয়েছে যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগের অন্য তিনটি প্রধান দাবীও মেনে নিয়েছেন—(১) পূর্ব পাকিস্তান থেকে সামরিক আইন প্রত্যাহার, (২) সৈন্যদের ব্যারাকে প্রত্যাবর্তন এবং (৩) এ মাসের গোড়ায় নিরস্ত্র অসামরিক বাঙালীদের উপর পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের গুলীবর্ষণের তদন্ত।

গত দু'দিনে পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য ও বিক্ষোভ কারীদের মধ্যে সংঘর্ষে ১১০ জন নিহত হয়েছেন।

সেনাবাহিনীর সর্বশেষ গুলীবর্ষণের প্রতিবাদে শেখ মুজিবর রহমান পূর্ব পাকিস্তানে শনিবার সাধারণ ধর্ম্মঘটের ডাক দেন।

২৬ মার্চ :

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে শেখ মুজিবর কর্তৃক বাংলা দেশকে সার্বভৌম, স্বাধীন ও লোকতন্ত্রী রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা।

প্রেসিডেণ্ট **ইয়াহিয়া** বাংলাদেশ ত্যাগের সময় সামরিক বাহিনীকে বাংলাদেশে **ক্ষমতা প্রয়োগের** নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

জাতির উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণে প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদোহিতা ও পাকজাতীয় পতাকার অবমাননার অভিযোগ আনেন।

বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু। ঢাকায় এবং পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ২৪ ঘণ্টার জন্য কার্ফু জারী এবং কার্ফু অমান্যকারীদের দেখামাত্র গুলি করার নির্দেশ।

পূর্ববাংলার আন্দোলন দমনে সামরিক প্রশাসন নতুন উদ্যমে সক্রিয় হওয়ার পর আজ বিকাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ নেতা মুজিবর রহমানের কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি।

২৭শে মার্চ :

পূর্ব বাংলার সামরিক আইন প্রশাসক লেফ্‌ট্ন্যাণ্ট জেনারেল টিক্কা খানকে সৈন্য পরিচালনাকালে গুলি করে হত্যা।

বাংলাদেশের আন্দোলন দমনে বিমান ও ট্যাঙ্ক ব্যবহার। মুক্তিফৌজ পরিচালনায় মুজিবর রহমান।

এ পর্যন্ত এক লক্ষ লোক নিহত হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। মুজিবরের আশ্বাস দু-একদিনের মধ্যে জয় অনিবার্য।

পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পণ। লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত সরকার সময়মত উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২৮ শে মার্চ :

বাংলাদেশে অস্থায়ী সরকার গঠন। এই নতুন সরকারকে স্বীকৃতিদানের জন্য বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের কাছে আবেদন প্রচার।

'টিক্কা খানের বারজন সহকারী নিহত। মুক্তিফৌজের ঢাকা শহর অভিমুখে অভিযান।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও কুষ্টিয়া জেলা মুক্তিফৌজের দখলে। যশোর দখলের চেষ্টা।

ঢাকায় প্রবল যুদ্ধ। ইয়াহিয়া বাহিনীর প্রবল গোলা ও বোমাবর্ষণ সত্বেও, মুক্তিযোদ্ধারা কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম দখল করে আছে।

কলকাতার পাক ডেপুটি হাইকমিশনের সঙ্গে ঢাকার সংযোগ বিছিন্ন।

২৯ শে মার্চ :

ঢাকা শহর মুক্তিযোদ্ধারা ছিনিয়ে নিয়েছেন। ওদের দমনে ছত্রীসৈন্য। তিনলক্ষ নিহত বলে অনুমান।

আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতা এপারে এসেছেন—সকলেরই আবেদন ভারত থেকে অস্ত্র সাহায্য।

পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য কর্তৃক আওয়ামী লীগের সদর দফতর হিসাবে ব্যবহৃত মুজিবের ঢাকার বাড়ীই ভস্মীভূত।

৩০ শে মার্চ :

চট্টগ্রাম দাউদাউ জ্বলছে। সব রণাঙ্গণে মুজিব বাহিনীর অগ্রগতি। পিণ্ডি চক্রের ফৌজ পিছু হটছে। বাংলাদেশের তিনদিকের স্থলভাগ অবরুদ্ধ হয়ে ইয়াহিয়া ফৌজের সামনের পথ উন্মুক্ত বঙ্গোপসাগর। পাকদখলদার ফৌজ কর্তৃক বাংলাদেশের অন্তত পঞ্চাশজন বুদ্ধিজীবিকে গুলী করে হত্যা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্রীরা নিখোঁজ, ছাত্ররা মুক্তিফৌজে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সমর্থনে সারা পশ্চিমবঙ্গে হরতাল পালন। রাশিয়া ও আমেরিকা বাংলাদেশে অস্ত্রসংবরণের চেষ্টা করছেন।

৩১ মার্চ :

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী প্রস্তাব করেন:—বিশ্বের সমস্ত মানুষ ও সরকারগুলোর কাছে অবিলম্বে এই গণহত্যা বন্ধ করার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে অনুরোধ জানানো হোক। ওপারের লড়াইয়ে এপারের সমর্থন, সারা পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল।

দুটি ডাকোটা বিমান ও একটি হেলিকপটার সহ কক্সবাজার বিমানঘাঁটি মুক্তিফৌজের দখলে।

যশোরে বোমা বর্ষণ।

'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।' বাংলাদেশে জাতীয়সঙ্গীতরূপে গ্রহণ।

১ এপ্রিল :

পাকিস্তান নৌবাহিনীর এক বড় অংশে বিদ্রোহ। নৌবাহিনীর এই বিদ্রোহের মুখে পশ্চিমপাকিস্তানে সকলকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ এবং সামরিক বাহিনীতে নতুন রিক্রুট ঘোষণা।

২ এপ্রিল :

ইয়াহিয়ার জঙ্গী শাসনের ঘাটি ঢাকা, কুমিল্লার কয়েকটি সীমিত এলাকায়মাত্র। স্থলবাহিনীর আশা কম, ফৌজী বিমান থেকে পাক ফৌজের গোলাবর্ষণের পরিমাণ বৃদ্ধি।

৩ এপ্রিল :

মুক্তিফৌজের দখলে রংপুর বিমানঘাটি। শহরটিকে অধিকার করার জন্য লড়াই চলছে। বহু পাকিস্তানী সৈন্যের আত্মসমর্পণ। চূড়ান্ত বিপর্যয়ের মধ্যে পাকবাহিনী।

যশোহর ছাউনীতে পাক ফৌজকে বন্দী রেখে, মুক্তি ফৌজের এলাকাটি দখল করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা।

বাংলাদেশের অবস্থায় কোসিগিন উদ্বিগ্ন, মার্কিন সরকারেরও উদ্বেগ।

৪ এপ্রিল :

ঢাকার পুলিশ সদর দপ্তর সম্পূর্ণভাবে মুক্তি ফৌজের অধিকারে। পশ্চিমপাকিস্তানী সৈন্যরা ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা বিমানঘাঁটি ও শহরের কোনো অংশে শক্ত ঘাঁটি করেছে।

আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করে পাকসামরিক বাহিনীর করাচী থেকে ঢাকায় সৈন্য আমদানী।

পাকবিমান কর্তৃক ভারতের আকাশসীমা লঙ্ঘন।

যশোহরের কর্তৃত্বের জন্য মরণপণ লড়াই।

ইন্দিরাগান্ধী বলেছেন-ভারতের পক্ষে আর নিশ্চুপ থাকা সম্ভব নয়। ঢাকা ভৌতিক সহরে পরিণত। প্রচণ্ড রকম হত্যাকাণ্ড চলছে।

৫ এপ্রিল :

মুক্তিফৌজ কর্তৃক শ্রীহট্টে-পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের খাদিমনগর শিবির দখল এবং সালুটীকর বিমান ঘাঁটিটিও অধিকার। প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর কুমিল্লা শহরটিও অধিকারে।

অধিকৃত পাকফৌজের মেসিনগান ও ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত গাড়ীগুলিতে চেপে মুক্তিফৌজের ঢাকাঅভিমুখে দৃপ্ত অভিযান।

লালমনির হাট বিমানবন্দর পাকফৌজের হাতছাড়া হয়েছে। যশোরে পাক দখলদারদের ব্যাপক ধ্বংসলীলা।

৬ এপ্রিল :

উত্তরাঞ্চলের দিনাজপুর, রংপুর ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্ট, এই জেলা

চারটি মুক্তিফৌজের দখলে। একটি পাকবিমানধ্বংস। যশোরে তীব্রসংঘর্ষ।

চুয়াডাঙ্গা থেকে রাজবাড়ী—স্বাধীন বাংলা রেলপথ চালু।

বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের দাবীতে—পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভার প্রস্তাব। ঢাকায় ৫০ হাজার লোক খুন হয়েছে বলে আশঙ্কা।

৭ এপ্রিল :

মুজিব বাহিনী কর্তৃক সমগ্র শ্রীহট্ট ও দিনাজপুর জেলা এবং সেনাছাউনি দখল। তুইস্থানে পাকসৈন্যের আত্মসমর্পন।

ভারতীয় তুজন সাংবাদিককে পাকিস্তানী সৈন্যরা ধরে নিয়ে গেছে। মুক্তিফৌজ-চালনা বন্দর অবরোধ করায় পাক সেনাদের পলায়ন পথ বন্ধ। সকল আমেরিকানদের ঢাকা শহর ত্যাগ।

৮ এপ্রিল :

রাজশাহী ক্যাণ্টনমেণ্ট, সৈয়দপুর মুক্তিফৌজের হাতে। কুষ্টিয়ার উপর আক্রমণের জন্য গোয়ালন্দ ঘাটে নতুন পাকসৈন্যের আক্রমণ।

গঙ্গাসাগরের রেলসেতু ধ্বংসকরার পর ময়নামতী ক্যাণ্টনমেণ্ট অঞ্চলে মুক্তিফৌজ সুবিধা করে নিয়েছে। যশোরের মালঞ্চ অঞ্চলে তুমুল লড়াই। ঢাকা থেকে আগত আমেরিকানরা জানান মুজিবের প্রেরণদাতা সন্দেহে বাংলাদেশে ব্যপক হিন্দু হত্যা করা হচ্ছে।

বৃটিশ নাগরিকরা স্বদেশে এসে জানান চট্টগ্রামে হাজার হাজার বাঙালীদের নির্মমভাবে হত্যা করা হচ্ছে।

মুজিবের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

৯ এপ্রিল :

মুক্তিফৌজের দখলে পাঁচটি পাক নৌবাহিনীর গানবোট। যুদ্ধশেষে নীলফামারী মুক্ত। বেসামরিক ব্যক্তিদের ওপর বেপরোয়া

গুলিবর্ষণ। ঝিকরগাছায় পাকবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিফৌজের প্রচণ্ড লড়াই।

বাংলাদেশে অত্যাচার চালাবার উদ্দেশ্যে পাকবাহিনী কর্তৃক মুসলীম লীগকে ব্যবহার করছে। বি-বি-সি-র ভাষ্যকারের মতে, পাকিস্তান বিভাগ অনিবার্য।

১০ এপ্রিল :

যশোর ও রাজশাহীতে প্রচণ্ড লড়াই। হারাগাছ ও তিস্তা সেতু এলাকা মুক্তিফৌজের হাতে। রুশ পত্রিকায় পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন সমর্থন। ঝিকরগাছা বাজার পাক-সৈন্যের কবলে।

১১ এপ্রিল :

উত্তর রণাঙ্গণে মুক্তিফৌজের সাফল্য। লালমণিরহাট বিমানঘাঁটি পাক কবলমুক্ত। স্বাধীন বাংলা সরকার গঠনের কাজ সম্পূর্ণ। তিনজন ভারতীয় সীমান্তরক্ষী পাক-সৈন্য কর্তৃক অপহৃত।

১২ এপ্রিল :

স্বাধীন বাংলা সরকার ঘোষণা। মুজিবর রাষ্ট্রপতি। তাজউদ্দিন আহমেদ প্রধানমন্ত্রী। উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। অন্যান্য মন্ত্রী—খোন্দকার মুস্তাক আহমেদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলি এবং এ, এইচ, কামারুজ্জমান। পশ্চিম পাকিস্তানেও দমননীতি। বালুচ গান্ধী গ্রেপ্তার। জঙ্গীশাহী কর্তৃক শ্রীহট্ট ও চাঁদপুর পুনর্দখল। কবিগুরুর শিলাইদহের বাড়ি ধ্বংস।

১৩ এপ্রিল :

'আমাদের স্বীকৃতি দিন'—নতুন সরকারের আবেদন। হানাদাররা প্রতিপদে প্রতিহত। জাতির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের বেতার ভাষণ।

১৪ এপ্রিল :

দিনাজপুর ও শ্রীহট্ট শহর পুনরায় মুক্ত। বাংলাদেশের মুক্ত অঞ্চল পরিদর্শনের জন্য প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন কর্তৃক বিশ্ববাসীকে আমন্ত্রণ। হানাদারদের রুখতে অস্ত্রপ্রার্থনা।

১৫ এপ্রিল :

পুর্ব বাংলায় মুক্তিফৌজের হাতে সতেরোটি পাক বিমান ভূপাতিত। ছাউনিগুলোতে চরম খাদ্যসংকট। তিতাসের সেতু থেকে হানাদার বিতাড়িত।

১৬ এপ্রিল :

উত্তর রণাঙ্গণে মুক্তিফৌজ কর্তৃক চারটি রেলসেতু ধ্বংস। সালুটিকর বিমানঘাটি মুক্তিফৌজ কর্তৃক অবরুদ্ধ। এ পর্যন্ত একলক্ষ শরণার্থীর ভারতে আগমণ।

১৭ এপ্রিল :

স্বাধীন জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ। মুজিবনগরে প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে বিদেশী সাংবাদিকগণ আমন্ত্রিত। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ। জেনারেল ওসমানি মুক্তিফৌজের প্রধান সেনাপতি মনোনীত।

১৮ এপ্রিল :

কলকাতার পাক দূতাবাসে বাংলাদেশের পতাকা। প্রাক্তন ডেপুটি হাইকমিশনার এম, হোসেন আলি কর্তৃক বাংলাদেশ সরকারের আনুগত্য গ্রহণ। কলকাতায় বাংলাদেশ মিশন গঠন।

১৯ এপ্রিল :

শ্রীহট্টে পাক সেনাশিবির মুক্তিফৌজের আক্রমণে নিশ্চিহ্ন।

কসবা শহর দখল। ময়মনসিংহ শহরের কাছে তীব্র লড়াই। লণ্ডনের বাঙালীদের বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা।

২০ এপ্রিল :

ঢাকা থেকে ভারতীয় কূটনীতিকদের সরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত। এস্ এস্ আইভরি নেপচুন জাহাজের ২৬· জন বাঙালী নাবিকের ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ। রাজশাহী শহর মুক্তিফৌজের হাতছাড়া। গেরিলাদের আক্রমণে বহু জায়গায় পাকবাহিনী পর্যুদস্ত। দুই লক্ষাধিক শরণার্থীর এপর্যন্ত ভারতে প্রবেশ।

২১ এপ্রিল :

বিদেশী ট্যাঙ্ক সজ্জিত পাক সাজোয়া বাহিনীর ঢাকা প্রবেশ। বাংলাদেশের প্রধাণমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যদের জঙ্গী আদালতে উপস্থিত হবার জন্য পশ্চিম পাকিস্তান সামরিক কর্তৃপক্ষের হুকুম। বাংলাদেশে গণহত্যার পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিক্রিয়া। চারটি শহরে ভুট্টোবিরোধী বিক্ষোভ।

২২ এপ্রিল :

শরণার্থীর সংখ্যা পাঁচলক্ষ। বিশ্বের বিবেকের কাছে মৌলানা ভাসানির আবেদন। মাও সে তুং, চু, এন, লাই ও নিক্সনের কাছে ভাসানির চিঠি-ইয়াহিয়াকে অস্ত্র না দেবার অনুরোধ। আগাউড়া ব্রাহ্মনবাড়িয়া রণাঙ্গণে জোর লড়াই।

২৩ এপ্রিল :

বৃটিশ শ্রমিক দলের এম, পি মিঃ ব্রুস ডগলাস—ম্যান কলকাতায় বলেন, বাংলাদেশে ইয়াহিয়া বাহিনীর বর্বরতা ভিয়েতনামে মার্কিন ফৌজের বর্বরতাকে হার মানিয়েছে।

ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামে তুমুল লড়াই। হিলি হানাদার মুক্ত। দশলক্ষ শরণার্থী এ পর্যন্ত এসেছে।

ইয়াহিয়ার কাছে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী কোসিগিণের পত্র। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ও অধ্যাপক হত্যার বিরুদ্ধে বিশ্বের বুদ্ধিজীবীদের ধিক্কার।

২৪ এপ্রিল :

কলকাতায় পাকিস্তানের নতুন ডেপুটি হাইকমিশনার মেহেদি মামুদ দূতাবাস খুলতে পারলেন না। ঢাকায় ভারতীয় মিশন বন্ধের জন্য পাকিস্তানের নির্দেশ।

২৬ এপ্রিল :

আখাউড়া-সিলেট শড়ক মুক্তিফৌজ কর্তৃক বিচ্ছিন্ন। পাকবাহিনীর বালুচ সেনাদের গুলিবর্ষণ ও গণহত্যায় অসম্মতি।